বিবর

- সমরেশ বসু

M/s. Jhenidah Traders.
KALI BARI ROAD.
KHULNA.

'...কিংবা, আচ্ছা ব্যাপারটা কি এইরকম নাকি, যে, এক তুখোড় চতুর একগুঁয়ে জেদী আর অব্যর্থ শিকারী, একটা বাঘকে মারবার জন্যে, একটা বাঘকে ফাঁদে ফেলে মারবার জন্যে, যেন একটা নধর পুষ্ট ছাগলকে, রাতের অন্ধকারের বনে, গাছের তলায় বেঁধে রেখে দিয়েছিল। আর বাঘটা তার শিকারের ডাক শুনে, গন্ধে গন্ধে, পা টিপে টিপে এল, বন চুঁড়ে চুঁড়ে। দেখল। দেখে, খেলতে আরম্ভ করল। বইয়েতে তো তাই লেখা থাকে, পাকা শিকারীদের অভিজ্ঞ বর্ণনায় সেইরকম অভিমতই ব্যক্ত হয়ে থাকে যে, একটু খেলা (বা র‍্যালা?) না হলে ঠিক শিকারের তৃপ্তি হয় না। অর্থাৎ পা টিপে টিপে একটু কাছে যাওয়া, আবার পেছিয়ে আসা, প্রদক্ষিণ করা, প্রদক্ষিণ করতে দূরত্বটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা, ওত্ পাতা এবং তারপরে এক লাফ। আর লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই...।'

আমার হাসি পেয়ে গেল। একটা চোখ বুজে, আমি আয়নার দিকে তাকালাম। যেন সেই শিকারীকেই খুঁজলাম, বাঘ শিকারীকে, এবং এক্ষেত্রে যে তার কোন অস্তিত্বই নাই, তাই ভেবে আমি নিজেকেই কয়েকবার চোখ টিপলাম। ভেংচানোর মত হেসে, একটা খিস্তি করলাম, সেই অস্তিত্বহীন কল্পিত শিকারীর উদ্দেশ্যে। উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থাতেই সিগারেটটা আমার ঠোঁটেই ছিল। আর ঠিক খাট বরাবরই ড্রেসিং টেবিলের উপর আয়নাটা রয়েছে। রয়েছে, মানে রাখাই হয়েছে এমনভাবে যেমন শুয়ে শুয়েও নিজেকে, নিজে এবং আর কেউ যদি থাকে তাকেও দেখা যায়। 'আর কেউ' বলতে কি বোঝায়? ন্যাকা! নাক টিপলে দুধ গলে, 'আর কেউ' বলতে কি বোঝায়, তুমি জান না। ডবল ডেকার বাসের ভিড়ে বা চৌরঙ্গীর সিনেমার লরীতে, তুমি এক পলকে, একটি চোখে-লাগা মেয়েকে, মনে মনে নগ্ন করে নিখুঁত করে দেখে নিতে পার, আর খাট বরাবর আয়নায়, তোমার কাছে, পাশে বা যে ভাবেই

হোক, 'আর কেউ' বলতে কি বোঝায় বা কী উদ্দেশ্য এবং কী ফন্দী ফিকির মনের ইচ্ছা হয়ে লুকিয়ে থাকে, তুমি তা জান না। অবলোকনের কী ঐশিয্যি রকমকে ডেকে ডেকে তোলে, যার জন্যে, 'এ' মার্কা বিদেশী ছবি দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আগে থেকে এ্যাডভান্স টিকেট কাটো কিংবা ব্লু ফিলম্ দেখতে যাও গোপনে, তোমাল্ তা দানা নেই।

'গচ্চর!' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে আমি নিজেকেই আদর করে বললাম। এবং আয়নার প্রতিবিম্বেই নীতার শাম্প্ করা রুক্ষ চুলের গোছার দিকে তাকালাম। যে-চুলের গোছা, একটু আগেই আমি বিলি কেটে কেটে, ঘাড় থেকে তুলে, ওর মাথার ওপর দিয়ে লুটিয়ে দিয়েছি। নীতাও উপুড় হয়ে রয়েছে। আমিই উপুড় করে দিয়েছি। ঠিক যেখানে ছিল, সেখানেই উপুড় করে দিয়েছি। ও আমার বুক ঘেঁষে কোল ঘেঁষে ছিল, এখনো তাই আছে। মুখটা আমার থেকে উল্টো দিকে ফেরানো। আয়নার দূরত্বটা এমন জায়গায়, ওর পাশ ফেরানো চোখ বোজা ফর্সা মুখখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওর সমস্ত দেহটাই দেখা যাচ্ছে। ওর মেদহীন সুগঠিত খোলা পিঠ, এত সুন্দর আর স্বাস্থ্যপূর্ণ, শিড়দাঁড়ার মাঝখানটা যেন দু পাশ থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসে একটি তীক্ষ্ণ গভীর রেখায় আঁকা পড়েছে। নিটোল কোমর ফর্সা পিঠ্ জামা নেই। পিঠটা যেন ক্রমাগত ত্রিভুজের রেখায় কোমরের দিকে নেমে গেছে। তারপরে লাল নীল ছাপকা ছাপকা (রং-এর শাড়িটা 'রং-এর এটা কী ফ্যাশান, আমি জানি না।) আমিই কোমর থেকে ঢেকে দিয়েছি। দেওয়া উচিত, এরকম একটা চেতনার থেকে যে দিয়েছিলাম, তা আমি স্মরণ করতে পারছি না। হতে পারে, নিতান্ত চোখে দেখার অভ্যাসের দরুণই দিয়েছিলাম। শায়াটা তো লুটনোই রয়েছে খাটের এক পাশে, ব্লাউজ ব্রেসিয়ার যেখানে দলা পাকানো।

নীতা আমার বাঁ পাশে। ওর ডান হাতটা মাথার পাশ দিয়ে ওপর দিকে এলানো, বাঁ হাতটা ওর বুকের কাছ ঘেঁষে কনুই মুড়ে রয়েছে। বাঁ হাতটা ওরকম না থাকলে ওর চব্বিশ পুষ্ট যৌবন (যৌবন বলতে আমি ওর সুউচ্চ সুগঠিত বুকের কথাই বলছি, আর এরকম কথা মনে হলেই আমার সক্ষিণের বয়সে, বেলেঘাটার মাসতুতো দাদার কাছে শোনা সেই গানের কলিটা নির্ঘাৎ মনে পড়বে, 'ও মালিনী তোর বাগানে জোড়া ডালিমে'...ইত্যাদি।' সম্ভবতঃ

পাশ থেকে আরো উগ্র স্পষ্ট হয়ে উঠত। ওর গায়ে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। ডান হাতে একটা রুলি, বাঁ হাতে ঘড়ি।

আয়নার প্রতিবিম্বেই ওর দিকে আমি চোখ ফিরে তাকালাম। আলস্য মাখানো ভঙ্গীতে, শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে, নীতাকেই যেন সাক্ষী মানলাম। কারণ, ঘণ্টা দেড়কে আগেই, কিংবা ঘণ্টা দুয়েক হবে বোধ হয়, আমরা দুজনেই আয়নাটার ছায়ায় দুজনে দুজনকে দেখছিলাম, আর বলাবলি করছিলাম। 'দেখেছ?'

'যাঃ অসভ্য!'

নীতা সলজ্জ হেসে বলছিল, চোখ বুজে থাকছিল, যাতে আয়নাটার দিকে কোনরকমে চোখ না পড়ে। মনে হয়েছিল, লজ্জাটা আসলে কামনার উদ্বেল হয়ে কুঁকড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতায় ও ওরকম করছিল। অথবা যথেষ্ট সপ্রতিভ সাবলীল হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের ওসব ব্যাপারে একটু লজ্জা-টজ্জা বেশী থাকে, বা কে জানে, হয়তো অবলোকনের থেকে, অনুভবের নেশায় গভীরভাবে ডুবেতেই ওরা বেশী ভালবাসে। জানি না বাবা অত সব। মোটের ওপর নীতা সলজ্জভাবে আয়নাটার দিকে চোখ না দেবার চেষ্টা করছিল। চেষ্টা করছিল, কারণ, দেখছিলাম, ওর চোখ জোড়াকে যেন আয়নাটা সখীর মত হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, 'এই! এই নীতা, ছাখ-ছাখ।' আর সেই ডাক শুনে ও চকিতে চকিতে এক একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে ফেলছিল এবং হাত দুটোকে শরীরের নানান অংশে রাখতে চাইছিল। ও তো বেশ্যা নয় যে, একটা বিক্ষুব্ধ ঘৃণায়, প্রায় চেতনাহীন শরীরটাকে আলোকিত ঘরে হাট করে খুলে ফেলে রেখে দিয়েছে, যেখানে অবলোকন বা অনুভূতি, এসবের কোন মূল্য বা তাৎপর্যই নেই। অবিশ্যি, এ সবই আমার ধারণা। যেমন সার্কাসের নেপথ্যে ম্যানেজারের গলা শোনা গেল, 'ওহে বীরেশ ক্লাউন, এই শেষ খেলাটায় তুমি একটা পাক মেরে এস গে।' 'আজ্ঞে স্যার, নাকটা ল্যাজটা খুলে ফেলেছি যে?' 'আবার লাগাও।' 'আচ্ছা স্যার।' তারপরে নাক আর ল্যাজ লাগাতে লাগাতে মনে মনে বলতে লাগল, 'শুয়োরের বাচ্চা, ম্যানেজারগিরি ফলাতে এসেছে, শালা দু মাসের মাইনে দেয়নি, ভাল করে খেতে পর্যন্ত...' এই বলে দাঁতে দাঁতে পিষতে পিষতে হু-কু হু-কু ক ডাক ছেড়ে হাসতে হাসতে মঞ্চে

যায় এবং খেলা দেখিয়ে ফিরে আসে আর কী খেলা দেখিয়ে এল, মুহূর্তেই ভুলে যায়, কেবল বিক্ষোভটাই ভিতরে জমা হয়ে থাকল, অনেকটা সেইরকমের আমি বলছি।

যাকগে ওসব কথা। আমার ধারণা দিয়ে কী হবে। মোটের ওপর বাজারের বেশ্যা এবং নীতা এক নয় বলে আমার বিশ্বাস, কারণ ওর জীবনেও নানান বাধ্যবাধকতা থাকলেও, ইচ্ছে মতো, পুরুষ বন্ধুর সংসর্গ করার উপায় আছে। এমন নয় কি যে, পুরুষের সংসর্গই হচ্ছে ওর জীবিকা। ভাল লাগার একটা ব্যাপার এখনো বোধ হয় আছে। অবিশ্যি এরকম মেয়েদেরই স্বৈরিণী বলে কিনা, আমি জানি না। স্বেচ্ছাচারিণী যাকে বলে। কারণ নীতা ওর ভাল লাগাটাকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগিয়ে থাকে। যেমন আমি। আমিও ওর ভাল লাগা স্বাধীনতার কাজে লেগে থাকি। আমি নিজেও তাই নয় কি? কে নয়, তা জানি না। এ ক্ষেত্রে ভাল লাগার স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে পারলে কেউ কি ছেড়ে দেয়? কে স্বেচ্ছাচারী নয়? আমার তো মনে হয়, গোটা পৃথিবীটা বন্দী-স্বেচ্ছাচারীতে ভারাক্রান্ত।

কিন্তু দূর হ, পৃথিবীটা রসাতলে যাক। নীতার ভাল লাগার কথা ভাবছিলাম। ভাল লাগাটা আছে বলেই আয়নাটা বা ছায়াটা বা আমি, কোন কিছুই বোধ হয় ওর কাছে নিতান্ত প্রাণহীন নিরেট ছিল না।

'নিজেদের না দেখবার জন্যেই যদি হবে তবে আয়নাটা ওখানেই রাখা হয়েছে কেন?'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'জানি না। ফাজিল!'

সব মেয়েদের মতই নীতা ঠোঁট ফুলিয়ে হাসির ধমকে বলেছিল। তার মানেই, পুরোপুরি জানত। তাই, এখন আয়নাটার দিকে তাকিয়ে ওসব কথা আমার মনে হওয়ায় নীতার দিকেই আমার চোখ পড়ল, ওকেই যেন সাক্ষী মানলাম। কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে, বাঁ হাতটা ওর পিঠের ওপর রাখলাম।

বেশ দেখাচ্ছে এখন আমাকে, না? অল ওপন টেরেলিনের সার্টটার সব বোতামগুলোই খোলা। হাতা গুটানো। অলিভ গ্রীনের মুহরি নালী প্যান্টটা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাপটি খেয়ে এঁটে আছে। আর অলিভ

গ্রীনেরই মোজা। পয়েন্টেড টো ইটালিয়ান কালো জুতোসুদ্ধ পা দুটো আমার উঠে আছে। যে-চীনা মেকার জুতো জোড়া তৈরি করে দিয়েছিল সে বলেছিল, 'তোমার পকেটে আর ছুরি রাখতে হবে না।' তার মানে ডগা এতই ছুঁচলো ও তীক্ষ্ণ যে ছুরির কাজ চলে যায়। চীনা আরো বলেছিল, 'ইপ ইউ শত্ এনিবোদি অন দি বেলি, তো বেলি পাত যায়েগা।' বলে চোখ ঢেকে, সোনার দাঁত দেখিয়ে খুব রগড়ে হাসি হেসেছিল। আয়নার জুতোর তলার ছায়া পড়েছে। খুব একটা ধুলো ময়লা লেগে আছে কি জুতোর তলায়? আছে, তবে তেমন নয়। নীতা খুলতে বলেছিল জুতো জোড়া। ডানলোপিলোর গদীর ওপর এমন ধবধবে ফর্সা চাদর পাতা। খাটটাও তো সুন্দরই। ন্যাচরেল কলার নিচু বিলেতি ডিজাইনের খাট। মোজাইকের মেঝেতে তার একটা হালকা প্রতিবিম্ব পড়েছে। সর্বোপরি নীতা, যার সঙ্গে একই খাটে জমিড় খেয়ে পড়েছিলাম, সেও রূপসী বটে, যুবতী তো হাজারবার, এবং পোষাক পরিচ্ছদও যথেষ্ট ফ্যাসানদুরস্ত।

ও বলেছিল 'জুতো খোল।'

আমি বলেছিলাম, 'আবার জুতো খোল? থাকগে।'

নীতা বলেছিল, 'বিছানাটা ময়লা হবে না?'

'কতটা আর হবে।'

নীতা আর কিছু বলবার আগেই আমি গদীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। নীতা একটু থমকে গিয়েছিল, ভুরু কুঁচকেছিল। বিরক্তির লক্ষণ যাকে বলে। আমি অবিশ্যি একটু ঝোঁকের মাথায় ছিলাম। নীতাও, তবে আমি একটু বেশী ছিলাম, তাই ওর থমকানো বা ভুরু কোঁচকানো ঝোঁকের ঠ্যালায় গায়েব করেছিলাম। বিকেলে কথা ছিল, প্রতিযোগিতামূলক একটা চাকরির ব্যাপারে একজনের জন্যে, পিছনের দরজার উমেদারিতে যাব রুবি দত্ত-এর কাছে। রুবি দত্ত-এর থেকে রুবী দেবীটাই বেশি উচ্চারিত হয় বর্তমান কলকাতায়। দেবী তো বটেই, কেউ কেউ তো কালী কেলকেত্তাওয়ালীও বলে। অর্থাৎ কলকাতেশ্বরী-ইয়াবেঙ্গেশ্বরী বললেই বা ক্ষতি কী! আমার অবিশ্যি ঠাটেশ্বরী বলতে ইচ্ছে করে, বলিও মনে মনে। সেই রুবি দত্ত যদি সামনে দাঁড়ায়, তবে অনেক পিছনের দরজার কুলুপই নিঃশব্দে খুলে যায়। ওই মেয়েলোকটিতে

কী যাদু আছে জানি না, তবে অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি ওর আঁচলে বাঁধা। অনেকে বলে, 'মাগী জাঁহাবাজ।' জাঁহাবাজ স্ত্রীলোক হলেই যে কলকাতার ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের আঁচলে বাঁধা যায়, তা আমি মানি না। বিদ্বেষপরায়ণ লোকেরা একটা যা হোক বিশেষণ ব্যবহার করতে ভালবাসে। কানে শুনতে একটু সুতসই লাগলেই হল। তার কোন মানে-টানে দরকার নেই, নাকি? তা হলে, ডেসডেমোনিয়াও জাঁহাবাজ, তার রূপটা জাঁহাবেজে রূপ, কেন না, সে অতবড় একজন সেনপতিকে আঁচলে বেঁধেছিল। অবশ্যি রুবি দত্ত-এর সঙ্গে আমি ডেসডেমোনিয়ার তুলনা করছি না। তার আবার নিষ্ঠা পবিত্রতা সতীত্ব ইত্যাদি ছিল। আর রুবি দত্ত বিবাহিতা, হাবুল দত্ত অর্থাৎ যত বদখত, ব্যবসার ঘুরে বেড়ানো, মদে ডুবে থাকা এবং তেঁটে বদমাস বলে যার নাম আছে কলকাতায়, সেই লোকেন দত্ত-এর স্ত্রী সে। দৈহিক পবিত্রতা বা সতীত্বের মত কোন বোকামি বা বুজরুকির আগল তার নেই। এই তিরিশ বত্রিশ বছর বয়সেও রূপ যৌবন যথেষ্টই আছে, পেটে বিদ্যেও মন্দ নেই, সোসাইটি, কালচার ইত্যাদি সম্পর্কেও [illegible], সন্দেহ নেই। যদিচ, মাত্র এসব মূলধনেই ক্ষমতাবানদের আয়ত্ত করা যায় না। ও রকম অনেক আছে, অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কলকাতায়। যারা রুবি দত্ত হতে চায়। কিন্তু হতে পারে না। আমার পাশে, এই নীতাও হয়তো তাই চাইত। কিন্তু হতে পারতো না। তা হলে রুবি দত্ত-এর নিশ্চয়ই একটা কোন প্রতিভা আছে। প্রতিভা! কে জানে, ক্ষমতাবান লোকদের আয়ত্ত করার জন্যে, স্ত্রীলোকদের কোন প্রতিভার দরকার হয় কি না। না হলে, অন্যেরাও রুবি দত্ত হয়ে উঠতে পারে না কেন? আঁচলে বেশ ভারী চাবির গোছা তো সবাই বাঁধতে চায়।

এ ক্ষেত্রে প্রতিভাকে 'খাপ খেয়ে যাওয়া।' বলে কি না কে জানে। এই যেমন সেদিন শুনেছিলাম, মস্ত আইনজীবী হারাণ নেয়োগী নাকি (বোঝ, বিরাট আইনজীবীর নাম হারাণ নিয়োগী! আমার তো মনে হয়, একমাত্র কারখানার কেরাণী ঝাড়ুবালা পতিরই এ নাম হতে পারে।) 'বছরখানেক ধরে একটা মেয়েকে নিয়েই পড়ে আছে। মেয়ে মানে, এক্ষেত্রে উপপত্নীই বুঝতে হবে। মধ্যবয়স অতিক্রান্ত, বিবাহিত এইচ এন-এর (হারাণ নিয়োগী) বন্ধু এবং পরিচিত মহলে, এ ব্যাপারে সবাই থ' মেরে গেছে। পক্ষকালে বা মাসে মাসে যে-লোকটা মেয়ে বদলায়, নতুন নতুন চায়, সে বছর ধরে একটা মেয়েকে নিয়ে নাকি কাটিয়ে দিচ্ছে। বছরকাবারির জন্যে বিস্ময়, আর অন্য সময়ে লোকেদের জ্বালা। শুনলে, জ্বালা আমারও হয়। কার না হয়, তা জানি না। আর জ্বালা মানেই তো, বদলী স্বাদের জন্যে সকলের জিভই লকলক করছে। তৃষ্ণা বুকেই শুকিয়ে যায়, কারুর অক্ষমতায়, কারুর ভয়ে। এখন সবাই একটু থতিয়ে গেছে, কারণ এটা প্রায় একটা অঘটন। তাও যদি মেয়েটা অতীতের সব মেয়েদের থেকে দেখতে একবারে আনারকলি হত, একটা কথা ছিল; তাও নয়। এখন নাকি সকলের মনে হচ্ছে, এই মেয়েটা এইচ এন-এর কাছে বরাবরের জন্যেই বোধ হয় টিকে গেল। এখন মেয়েটা এইচ এন-এর চারপাশের মহলে শক্ত হয়ে উঠেছে। কারণ আস্তে আস্তে মেয়েটা কিছু ক্ষমতার অধিকার পাচ্ছে। এইচ এন-এর তহবিল থেকে শুরু করে, তার বুদ্ধিশুদ্ধি, সবকিছুর ওপরেই মেয়েটার দখলীস্বত্ব নিশ্চয়ই কিছুটা স্বাভাবিক। তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিনী যদি সহসা না জোটে, তা হলে দখল কায়েমী হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কেউ কেউ গম্ভীরভাবে ঘাড় দুলিয়ে বলতে আরম্ভ করেছে, 'জীবনসায়াহ্নে এসে এইচ এন তা হলে ভালবাসার সন্ধান পেল।' উল্লুক! তা ছাড়া এদের আমি আর কিছু মনে করতে পারি না। একে কাব্যি করাও বলে না, কব্‌তে করা বলে। জীবনসায়াহ্ন, ভালবাসা! পীরিতের হালুয়া! বিল্বমঙ্গল আর চিন্তামনি, পুরুরবা আর উর্বসী (উর্বশী) নয়? তবে আর এতদিন ধরে লোকে কেনই বা বলে আসলে, অমুকের রূপসী বিদুষী বউ থাকতেও একটা কালকুট খেঁদিকে নিয়ে পড়ে আছে। সেকেলে লোক হলে বলত, একে বলে পারভারশন। সেকস্‌ এ্যাডজাস্টমেন্ট বললে বুঝি গালাগাল দেওয়া হয় না? বা সেকস্‌ এ্যাটাচ্‌মেন্ট? নাকি এটা আবার তেমন বিজ্ঞানসম্মত নয়। এখন তো আবার সবই সায়ান্স, সবাই সায়ান্টিফিক। যাকগে, মোট কথা আমি বুঝেছি বাপু, এইচ এন-এর ক্ষুধাকে ওই মেয়েটাই পারে জাগাতে, পারে তৃপ্ত করতে। অতএব আইসক্রীম, জমে যাওয়া যাকে বলে আর কি। এখন ভালবাসাই বল আর ছিপ্‌নোটিজম, যা খুশি বল।

এই পারাটাকে কি মেয়েটার প্রতিভা বলতে হবে নাকি? রুবি দত্তও সেই রকমের প্রতিভার মালিকানী কি না—কিন্তু যাকগে, মোট কথা রুবি দত্ত, বড়

সব চাবির গোছাওয়ালী, আমাকে একটু নেকনজরে দেখে থাকে। কেন দেখে থাকে, এবং সেটাও আবার আমার কোন প্রতিভা কিনা, কে জানে। প্রতিভা! প্রতিভার ছড়াছড়ি। তবে হ্যাঁ, কবি দত্ত আমাকে, কবিদি বলে ডাকবার হক দিয়েছে, এবং 'তোমার যদি আমাকে কোন দরকার-টরকার হয়, জানিও' কিংবা 'সময় পেলে খোঁজ-খবর একটু নিও' এমন অধিকার দিয়েছে। কবি দত্ত? সময় পেলে! দরকার-টরকার!

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, 'আয়নার আমিকেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর হাসির দমকে আমার শরীরটা ডানলোপিলোর গদীসহ নাচতে লাগল। নীতার শরীরটাও, যে-ভাবে পড়েছিল সে-ভাবেই আমার সঙ্গে যেন তাল দিল। এবং হাসিটা থামলে, আমার চোখের সামনে কবি দত্ত-এর চেহারাটা ভাসতে লাগল। কী করে বোঝাব, ক—ত দরকার, ক—ত অসীম সময় তোমার জন্যে দিতে পারি কবিদি। কী একটা যে আছে না চোখের মধ্যে, আর শরীরে, আর ভঙ্গিতে, আমার যেন বাদলা পোকার মত পাখা ক'াপতে থাকে। হলই বা বয়সে কিছু বড়। কিন্তু কবে আসবে সেইদিন, 'আমারে চোখ ইস্‌সারায় (ইশারায়,) ডাক দিলে হায়'...। আচ্ছা, সেরকম একটা যন্ত্র যদি সত্যি আবিষ্কৃত হত, ছোট্ট একটা যন্ত্র, পকেটে বা ক্ষুদ্র ভ্যানিটি ব্যাগেই যেটাকে নিয়ে চলাফেরা করা যেত, এবং তুমি যখন যার মনের কথা পড়তে চাইছ তাই ফুটে উঠছে সেই যন্ত্রে। সে যা ভাবছে, তোমার যন্ত্রে তাই ফুটে উঠছে, তা হলে কেমন হত? ধর স্বামীর কাছে একটি আছে, স্ত্রীর কাছে একটি, প্রেমিকের কাছে একটি, আর প্রেমিকার কাছে আর একটি, গোয়েন্দা এবং অপরাধীর কাছে দুটি, তা হলে পৃথিবীর চেহারাটা কেমন হত? অনেক বন্ধুবান্ধবীদের দেখেছি, এরকম একটা যন্ত্রের আলোচনার সময় হাসতে হাসতেই তারা শিউরে উঠেছে। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে। বলে উঠেছে, 'না না, অমন যন্ত্রের দরকার নেই বাবা। সব রসাতলে চলে যাবে, খুনখারাপি হয়ে যাবে।' তার মানে, কারুরই নিজেকে বিশ্বাস নেই। কেউই কারুর কাছে ধরা পড়তে চায় না। স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধবী, আর দারোগাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। সকলের মধ্যেই না-বলার অনেক কিছু আছে, এমন কিছু, যা দুজনের কেউ কাউকে কখনোই বলতে পারবে না। পারবেনা তো বটেই, সারা জীবন ধরে শুধু পরস্পরের কাছে কত ভালভাবে গোপন করে রাখা যায়, কত সুন্দর ভাবে, নিটোল মুন্সীয়ানার সঙ্গে, দুজনের কাছে দুজনকে জানতে না দেওয়া যায়, তারই চেষ্টা করবে। তাই তো দেখছি আখ্‌চার। ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, এই প্রমুহূর্তের গোপনীয়তার জন্যই কত ঠাট বাট, কত কথা, কত বিচিত্র আচরণ।

কিন্তু সত্যি কি এরকম একটা যন্ত্রের দরকার আছে? যন্ত্রটা ছাড়াই কি সবাই সবাইকে চেনে না? জানে না? চিনে আর জেনেও 'এ অন্যায়, এ পাপ' এসব মনে বলেও পরস্পর পরস্পরকে মেনে নেয়নি? যাকে বলে এ্যাডজাস্টমেন্ট। তুমোও যা, আমুও তাই। পরস্পরের পাপের সঙ্গে একটা আঙ্কিক কাটাকাটি খেলা খেলে, ইজুকাল টু সমঝওতা করে চলেছে না?

তা হলে কবি দত্ত-এর কাছে বা আমার কাছে, ওরকম একখানি যন্ত্র থাকলেই বা কী লাভ হত। আমরা কি কেউ কাউকে চিনি না? কবি দত্ত কি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। আমি কি এক এক সময় কবি দত্ত-এর নেক-নজরওয়ালী, তিরছি আঁখের সঙ্গে, একটু আবর মেশানো হেসে বলা, 'কি হিরো, চেহারাটি তো দেখছি একেবারে পেশাদার লেডী-কিলার করে তুলেছ' শুনিনি। যন্ত্র ছাড়াই, আমার সম্ভ্রম মেশানো, হুকুম-বরদার এক পায়ে খাড়া, করুণাপ্রার্থী' অথচ সচকিত ভাবভঙ্গি এবং তাতে কবি দত্ত-এর খুশী ও তৃপ্তি ও আমার সবকিছুতেই সহাস্য উপভোগ, পরস্পর লক্ষ্য করিনি।

করেছি, এবং লেগেও আছি। এক্ষেত্রে আমাকে লেগে থাকতে হবে, কারণ কবি দত্ত অনেক উঁচুতে আছে, অনেক ভক্ত আছে তার। আমাকে লড়তে হচ্ছে, লড়ে নিতে হবে। এই তো আজও নীতা বলছিল, কবি দত্ত-এর থেকে অনেক বেশী সুন্দরী; বয়সেও অনেক ছোট নীতা, ঠোঁট ফুলিয়ে, যেন অভিমান করে বলেছিল, 'এখন তোমার কবি দত্ত-এর কাছে যাওয়া আসা, আমাকে কি আর ভাল লাগবে?'

কথাটা এমন একটা সময়ে বলছিল, যখন আমি আপ্লুত খুশিতে, সুখের জোয়ারে, মাতালের মত ওকে আদর করতে করতে প্রায় গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলছিলাম, 'মাইরি বলছি নীতা, তোমাকে—তোমাকে আমি কখনো ভুলতে পারি না, তোমাকে যদি সব সময়ের জন্যে পেতাম, একলার জন্যে...।' তখনই

ও কথাটা বলেছিল। ওর চেতনা তখনো আমার জোয়ারের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি, বুঝতে পারছিলাম, তাই ও সচেতনভাবেই আমাকে খোঁটা দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'মাথা খারাপ, কবি দত্ত কত বড়!'

'বড় তো কী।'

'এখন ওসব বাজে কথা ছাড়।'

আমি ওকে আদর করে, চুপ করিয়ে দিতে চাইছিলাম। আর ওকেও অনেক পাল্টা কথা আমার বলতে ইচ্ছে করছিল। যদিও ওসব বলাবলির কোন মানে হয় না। কেন না, আমি কবি দত্ত-এর কাছে যাওয়া আসা করি, আর নীতা বুঝি ধোয়া তুলসী পাতা। এই ঘরে নীতার ভাষায় এ্যাপার্টমেন্ট, এই খাটে, এই বিছানায় এমন করে শুয়ে একলা আমিই বুঝি ওই আয়নায় এমন করে নিজেকে দেখছি, নীতাকে দেখছি। আর কেউ দেখেনি। ওসব বুজরুকি আমার জানা আছে। আগে আগে আমার এইরকম ধারণা ছিল, নীতা আমার, একলা আমার, আমাদের প্রেম হয়েছে। পেয়েন!

প্রথম যেদিন ধারণাটা ভাঙল, আর জানলাম, আমি একলা নই, সেদিনে, ও বাবা। আমার কী রাগ! কী কষ্ট, অথচ তার দুদিন আগেই দক্ষিণ বাঙলার এক গ্রামে বেড়াতে গিয়ে একটা ফুটফুটে ষোল সতের বছরের মেয়েকে...সে মেয়েটাও বলিহারি, পাড়াগাঁয়ের নীরিহ ডাগরচোখা মেয়েটা, আমার চোখের ছাউনি দেখেই গলে গিয়েছিল, হেসেছিল, আর প্রায় নির্ভয়েই...কী বলব—মেয়েটাকে আদর-টাদর করার পর আমি নিজেই তো বলে ফেলেছিলাম, 'যাঃ শালা।'

তবু যখন প্রথম জানলাম, প্রথম সেই দিনটা যে, নীতা আমার একলার নয়, সেই দিনটি! 'এ মার্ডার হুইচ আই থট এ স্যাক্রিফাইস: আই স ক হাওকারচিফ।' কিন্তু তারপরে আমি অনেক দিন একলা একলা হেসেছি। তুমি সধুপুরুষ। আর নীতা অসচ্চরিত্রা, বিশ্বাসঘাতিনী! মাথার গাট্টা! তুমোও যা, আমুও তাই। সবই তো বোঝ যাবা!

উঃ! খেয়াল করিনি, কখন সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আগুনের তাপ লাগছে ঠোঁটে। পুড়েই গেল বুঝি ঠোঁটটা। ললার সঙ্গে আটকে যাওয়া আগুনের টুকরোটা তাড়াতাড়ি কোনরকমে তুলে নিয়ে ডান দিকে হেলে পড়লাম।

বাঁ হাতে নীতার খোলা পিঠের ওপর হাত দিয়ে, শরীরের ভার রেখে-একটু দূরের টি-পয়-এর ওপরে, ছাইদানিতে গুঁজে দিলাম। ঠোঁটটা চেটে অনুভব করতে চাইলাম, সত্যি পুড়ে গিয়ে ফোস্কা পড়েছে কি না। আয়নার প্রতিবিম্বে ঠোঁট উলটে দেখতে চাইলাম। ফোস্কা বোধ হয় পড়েনি, তবে গরম লাগছে খুব, জ্বালাও করছে। আর এটা অনুভব করতে গিয়ে বাঁ হাতটা মনে হল, বরফের ওপর পড়ে আছে। ঠাণ্ডা এবং শক্ত। প্রায় ভুলেই বসে আছি, নীতা ডেড, মানে মরে পড়ে আছে। এতক্ষণ কিন্তু এতটা ঠাণ্ডা লাগেনি। এতটা ঠাণ্ডাও ছিল না। এখন যেমন মনে হচ্ছে, ঠাণ্ডা আর শক্ত। ওর সুগঠিত পিঠের সেই কোমলতা এখন আর অনুভূত হচ্ছে না।

আমি ডান হাত দিয়ে আমার গালে মুখে বুলিয়ে দিলাম। কত তফাৎ অগ্রহায়ণ মাস, শীত তো আছেই। তবু আমার হাত-মুখ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হলেও একটা গরমের ভাব আছে। আর নীতার শরীরের ঠাণ্ডাটা, একেই বোধহয় 'মৃত্যুর শীতলতা' বলে। আর আমারটা—এটা কি 'প্রাণের উষ্ণতা'! হবেও বা। তবে নীতারটা যে নিশ্চিত 'মৃত্যু শীতল' তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রথম, মরা মানুষের গায়ে আমি আর কখনো হাত দেইনি। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো ধর্ম। তা জানি, কিন্তু সত্যি বলতে কি, ভাবলেই আমার যেন কেমন গা ঘিন, ঘিনিয়ে উঠত। অনেকটা সাপের গায়ে হাত দেবার মত। ভয়ের সঙ্গে যেমন একটা গা শিউরনো মিশে থাকে, সেই রকম।

অথচ নীতার বেলায়, আমার ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে না। বোধ হয় ওর শরীরটা বেশী চেনা বলে, না কী? কিংবা ওর গাটা বেশ সুন্দর, বরাবরই খুব ভাল লেগে এসেছে, এবং এখনো ওর সারা গায়ে সুন্দর গন্ধ লেগে আছে। সেই জন্যেই, না কি এই দেহের সঙ্গে অনেকগুলো ক্ষণিক সুখের পবিচয় নিবিড় হয়ে আছে বলে গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠা বা শবের প্রতি একটা আলৌকিক ভয় আমাকে শিউরিয়ে তোলেনি। একটা কিছু হবে মোটের ওপর, যাতে কাছ থেকে সরে যাবার মত আমার অবস্থা হয়নি।

আমি আমার থাবাটা ওর পিঠের ওপর থেকে তুললাম। কোন দাগ পড়েনি, তবে চাপ খেয়ে আঙুলের ছাপের হালকা গর্ত মত দেখাচ্ছে। অন্য সময় হলে যখন ওর শরীরে কোথাও এরকম চাপ দিয়েছি, ওর ফর্সা গায়ে লাল ছাপ পড়ে

যেত। এখন কোন রং ফুটল না। মরে গেলে বোধহয় ফোটে না। আমি আমার ঘড়ির ব্যাণ্ডটা দিয়ে আলতো করে ওর পিঠে একটা চাপ দিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ ঠিক, ছাপটা একটু যেন বেতো গায়ের মত চেপেই বসে যাচ্ছে। ওর হাতটা টেনে তুলতে গেলাম, যে হাতটা ওর বুককে আড়াল করে, কনুই বেঁকে বিছানায় পড়ে আছে। আলগা করেই টানতে গেলাম, হঠাৎ উঠল না। যেন নীতা শক্ত করে রেখে দিয়েছে, তুলতে দিতে চায় না। আমি উঁকি মেরে ওর পাশ ফেরানো মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লাম, মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গেলাম। না, এমন সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই যে, ও মরেনি। মুখের একটা পাশই আমি দেখতে পাচ্ছি। চোখটা তো প্রায় খোলাই, যেন বিছানার কোঁচকানো দোমড়ানো চাদরটার দিকে চোখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে। ক্লান্ত ভাবে এলিয়ে, অনেক সময় ও যেমন করত, পাশ ফিরে এলিয়ে শুয়ে, চোখ আধবোজা করে একদিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকত, আর মাঝে মাঝে ঠোঁট নেড়ে অনেকটা প্রলাপের মত বকত, 'আচ্ছা, জীবনের কি মানে বলতে পার?' 'সত্যি আমার কিছু ভাল লাগে না।' 'এক এক সময় মনে হয়, সুইসাইড করি।' ইত্যাদি নানান রকম কথা। যে-কথাগুলো মোটেই খাঁটি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, আলস্যে আরামে এলিয়ে পড়ে যেন অনেকটা স্বপ্নের বিলাসে ও নিচু গলায় বলত। 'হ্যাঁ, এই বেশ রক্তের এক আশ্চর্য নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, এখনই যত দুঃখের কথা বলতে ইচ্ছে করছে' ভাবটা এইরকম। খাবার পর আরামের ঢেকুর তোলার মত, শব্দটা যতই কটু হোক। আদতে, ওসব প্রলাপ বকবার মেয়েই ছিল না ও। একে বলে কুন্নারা। ঢাকা জেলার মাকে, আদরের বকুনি বকতে শুনেছি তার সোহাগ-কাড়ানো সন্তানকে, 'কুন্নারা করিস্ না।' অনেকটা 'ঢঙ'-এর প্রতিশব্দের মত। কোথা থেকে শব্দটার উৎপত্তি কে জানে। নীতাও নিশ্বাস ফেলে ফেলে নিচু মন্থর গলায় যখন ওরকম বলত, আমার এই শব্দটাই মনে হত, কুন্নারা।

যাই হোক, এখন নীতা সেইভাবেই পড়ে আছে। অন্যসময় এইভাবে পড়ে থাকা কালে আমি যদি মুখ নামিয়ে নিয়ে যেতাম, তাহলে ও ভাবত আমি ওকে চুমো খাবার চেষ্টা করছি। ও কিন্তু তখন কিছুই বলত না, নিশ্চল নির্বিকার হয়ে পড়ে থাকত। আমি চুমো খেলেও অমনিভাবে পড়েই থাকত, পালটা দান দূরের কথা, ও ঠিক এভাবেই পড়ে থাকত, এখন যেমন রয়েছে। এইরকম মরার

মত। তবে তখনকার সেই ঠোঁট থাকত উত্তপ্ত নরম আর ভেজা ভেজা। আর নিশ্বাস পড়ত, লালচে নাকের পাটা একটু কেঁপে কেঁপে উঠত। ঠোঁট দুটি অবিশ্যি এরকম থাকত, লিপষ্টিকের রং শুষে নেওয়া, (এখন ওর ঠোঁটের সব রং তো আমার পেটে।) অথচ হালকা একটু দাগ থাকা, যে কারণে স্বাভাবিক লালাভাটা ফ্যাকাসে মনে হয় এবং এইরকম ফাঁক, যে ফাঁক দিয়ে কয়েকটি ওপরের সারির দাঁত দেখা যায়। যেমন দেখা যাচ্ছে এখন। কিন্তু—না, ঠিক সেইরকম নেই তো, এখন যেন একটু বেশী রকম ফাঁক হয়ে আছে। ওপরের সারির দাঁতের ফাঁক দিয়ে মুখের ভিতরের অস্পষ্ট অন্ধকারে আমি ওর জিভটা দেখতে পাচ্ছি।

আমি ওর গালে হাত দিলাম। ঠাণ্ডা। একটু টিপে দেখলাম, না, ততোধিক নরম নেই আর, বেঁচে থাকলে যে রকম হয়। একটু যেন শক্ত শক্ত, নরম জায়গার ফোঁড়ার থর, উঠলে যে রকম হয়, অনেকটা সেই রকমের। ঠোঁটে হাত দিলাম। ঠাণ্ডা। টিপলাম এবং আলস্যে আদরে যেরকম করি অন্য সময়, সেরকমভাবেই, আলতো করে নখ বিঁধিয়ে একটু চিমটি কাটলাম। না, ঠিক সেরকমটা আর নেই, সেরকম গরম, নরম। শক্ত লাগছে। আচ্ছা, দাঁতের ফাঁক দিয়ে, ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে একটু জিভটা ছুঁয়ে দেখব? জিভটা যেন ভিতরে এলিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু যদি ঠিক সেই সময়েই ওর মুখটা বন্ধ হয়ে যায়? মরা অবস্থাতেই নাকি অনেক সময় শবের কোন কোন অঙ্গ নড়ে ওঠে। আমিও মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম, আর তখুনি হয়তো ঠক্ করে দাঁতে দাঁত পড়ে গেল, চিরজন্মের মতই গেল, আঙুলটিও কুচ্ করে কেটে ভিতরে রয়ে গেল। ওরে বাবা! আঙুলটাই বরবাদ।

আমি আমার প্রতিবিম্বের দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, আমার চোখ দুটো গোল হয়ে উঠেছে। চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে, আর তার ছায়ার নিচে আমার ছানাবড়া হওয়া চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, না হেসে পারলাম না। এবং নিজেকে আমি আর একবার চোখ টিপে আদর করলাম, সালো! (শালা) তারপরেই নিজের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে মনে হল, আচ্ছা, আমি দেখতে খুব খারাপ নই, না? সিনেমা-ষ্টার হবার মতই প্রায়। কথাও তো হয়েছিল দু-একবার। বছর পাঁচেক আগে, এক ফিল্ম ডিরেক্টরের কাছে

বহু যাতায়াত করেছি। লোকটা আশা দিয়েছিল। তখন কি জানতাম, এরকম আশা ওরা আমার মত অনেক আওাগোওাকে দিয়ে থাকে। মাঝখান থেকে আমি কিছুদিন একেবারে যাকে বলে মুভিষ্টার বনে গেছলাম। উল্লুক! (তা ছাড়া আর নিজেকে কী বলা যায়!) এখন তো তবু একরকম, তখন চুলের ভাবই ফিরিয়ে ফেলেছিলাম। মুখে হরদম কালারড্ স্নো। কথাবার্তার ভাবভঙ্গি বিলকুল চেঞ্জ, সব সময়ে অভিনয় করছি। যে কোন ছবি দেখে আসছি, তারই অনুকরণ করছি। আমার ভেতরটা তো তখন আশায় আর বিশ্বাসে একেবারে জবজবে হয়ে আছে। 'চেহারাটা তো আপনার ভালই। এরকম ছিপছিপেই দরকার। হাইটও ভাল, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। গলার স্বরও মাইক ফিটিং।... ঠিক আছে, আপনাকে রোজ রোজ আসতে হবে না। সময় হলে আমরাই আপনাকে খবর দেব।'

খবর দেবে! আয়নায় নিজেকেই আমি ঠোঁট বাঁকিয়ে ভেংচালাম। মামার বাড়ির আব্দার! তবু অনেকদিন খবর না পেয়ে, আবার গেছলাম। ভদ্রলোক ঘরে লুকিয়ে থেকে লোক দিয়ে বলিয়ে দিলেন, 'উনি আসেননি।' সত্যি, তখন কে যে, বেচারী, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। আমি না ডিরেকটর। যখন বললাম, আমি অপেক্ষা করতে চাই, দেখলাম, অন্যান্যদের কী ভীষণ অস্বস্তি। প্রায় একটা আতঙ্ক তাদের চোখে। সবাই এক সঙ্গে আমাকে বোঝাতে আরম্ভ করল, উনি সেদিন আসবেন কি না, তারই ঠিক নেই। মিছিমিছি অপেক্ষা করে কী লাভ। আমি তো পরে আবার যে কোনদিনই আসতে পারি। অবিশ্যি তখনো বোধহয় আমার মনে একটু আশা ছিল, তাই ফেরব্বাজের মত অপেক্ষা করার জেদ করিনি। সত্যি বলতে কি, আমার ভেতরটা তখন হাসছিল। ফিচ্লোমির হাসি যাকে বলে। মানুষ স্বাধীনতাকে কী ভীষণ ভয় পায়। বিশেষ করে, ভদ্রলোক হতে গেলে তো কথাই নেই। আমরা যাদের ভদ্রলোক বলি, এই আমিই যেমন। আমিই যখন আমার চাকরিস্থলে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে, ভদ্রলোক সেজে থাকি, তখন সব স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে হেসে কথা বলি, অন্তরের ভাষাটা যে কী কদর্য, নিজের কানেই শোনা যায় না প্রায়। আমরা হয় মিথ্যাচার করি, নয়তো যাচ্ছেতাই অভদ্র হয়ে উঠি। অবিশ্যি এই অভদ্র হয়ে ওঠার মধ্যেও ভদ্রলোকি যুক্তি এবং দাবী-দাওয়া-

গুলো খুব নিখুঁতভাবেই বজায় রাখি। অর্থাৎ আমি ভদ্রলোক হিসেবেই এরকম জঘন্য ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ এরকম উগ্র আচরণ ছাড়া তোমার মত লোককে টিট্ করা যায় না। তার মানে, স্বাধীন হওয়ার অক্ষমতাকে ঢাপা দেবার সবরকম ফন্দি-ফিকিরই আমি গত করে রেখেছি। অনেক ভেবে দেখেছি, যখন মিথ্যে কথা বলি, আর যখন উগ্র আচরণ করি, ও দুটোই সমান। আমি যে একটি কুলুপ-আঁটা মাল বিশেষ, অর্থাৎ আমার সহজ পরাধীনতা থেকে স্বাধীন হবার যোগ্যতা যে আমার নেই, নেই নয়, সবরকম স্বাধীনতাকেই আমি ভয় পাই, যেমন এই নীতার সংসর্গ না করার সব স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও, ওর এক ডাকেই আমি চলে এসেছি, যার মানে, আমার প্রতিটি রক্তকণাও পরাধীনতার মদ খেয়ে নেশা করে বসে আছে, সম্ভবত নীতারও তাই, আমি আসলে এই পরাধীনতার মধ্যেই তবু যা হোক একটু খেয়ে পরে বেঁচে-বর্তে থাকার আশ্রয় পেয়েছি। সে হিসেবে, স্বাধীনতাকে সবাই আগুনের মত ভয় করে দেখেছি, যেন পড়ে মরবার ভয়ে, খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এড়িয়ে চলে।

যাই হোক, ফিচ্লে হাসিটা যতটা সম্ভব ভদ্র রেখে, আমি ফিরে এসেছিলাম, এবং ওখানে আর যাইনি। সেই সময়ের ওদের আপদ বিদায়ের স্বস্তির নিঃশ্বাসটা আমি স্পষ্টই অনুভব করেছিলাম। তবু তারপরেও আরো দু-এক জায়গায় আশা নিয়ে গিয়েছি। আমার মত ছেলেরা কে না মুভিস্টার হতে চায়? একটু চোখ তুলে তাকালেই তো বোঝা যায়, চোখ তুলে একটু সকলের দিকে তাকিয়ে দেখ, নিজের দিকেও অবিশ্যি। সত্যি বলতে কি, আরব্যো-পন্যাসের নায়ক হবার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কী আছে। খ্যাতি, অর্থ, ভোগ। ভোগ শব্দটাকে ভেঙে ফেললে, ভেতরে আছে মেয়ে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যে-কোন বড় মানুষের পাশে তুমি দাঁড়াতে পার। খবরের কাগজ বা সিনেমার কাগজের ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়, যে-কোন দেশ-বিদেশের বিষয়ে কোন সৌহার্দ্যপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে যে সুখী পরিবেশটি ফুটে ওঠে না, সিনেমা স্টারদের সঙ্গে সেটাই লদ্লদিয়ে ওঠে। ব্যাপারটাই এমন লদ্লদে যে, সবাইকেই বেশ গল্গলে মনে হয়। স্টারদের নিয়ে ফটো তুলতে কে না চায়? আর টাকা? তার তো লেখাজোখা নেই। আলিবাবার চিচিংফাঁকের

মোহর। তারপর মাথা যখন বেঠিক, তখন তো একটা জায়গাতেই ছুটতে জানি, এই যে একটা জায়গায়, এখন যেখানে আছি। আমি নীতার শাম্পু করা চুলে হাত দিলাম। তখন তো আমি সোনার মাকড়সা আর কত পোকা আসবি, আর আমার কালো টাকার জালে, আমার গ্ল্যামারের, যাকে বলে, 'মরীচিকায়।'

হাসি পেয়ে গেল আমার। ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয় কি? আমি তো বাবা তাই বুঝি। এরকম জীবনের প্রতি টান কার না থাকে। তারপরে বুঝলাম, কোটি যুতের নেই, চেহারা যা-ই হোক। তবে মনের আসল জায়গাটা মূলে হাভাত হয়নি। পর্দাতেই যেতে পারিনি, পর্দার বাইরে থেকেও পর্দার ধাঁচের চিন্তা-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাবভঙ্গিগুলো আমাকে ছেড়ে যায়নি।

যাক গে, এবার একটা সিগারেট—কিন্তু, এ কি, নীতার চুলগুলোও কি শক্ত হয়ে উঠেছে নাকি? সেরকম নরম পেঁজা তুলো তুলো ভাব আর নেই। না কি আমারই হাতের স্পর্শটা এরকম ঠেকছে। অথবা মরা মানুষের চুল হয়তো ঐরকমই হয়। একটু যেন শক্ত শক্ত, কর্কশ।

আমি ওর ঘাড়ের কাছ থেকে হাত চালিয়ে, চুলগুলোকে বিলি কেটে, মাথার পেছন দিকটা চেপে ধরলাম। ছোট্ট মাথাটা। খুলিটাও ঠাণ্ডা, অথচ শাম্পুর হাল্কা গন্ধটা ঠিক আছে। জানি না, মরা মানুষের কোন গন্ধ আছে কি না। পচে যাওয়া শবের কথা বলছি না। পচলে তো সব কিছুরই দুর্গন্ধ হয়। নীতা এখনো পচেনি। হয়তো সারা রাত্রের মধ্যে যাবে। তবে বলা যায় না, শীতের সময় তো। ঠাণ্ডায় সব কিছুই জমে থাকে। কোল্ড স্টোরেজে যেমন মাছ মাংস তরকারি ফল ইত্যাদি থাকে। কিন্তু সদ্যমৃতের গা থেকে কি কোন গন্ধ বেরয়?

নীতার খোলা পিঠের ওপর আমি নাকটা গুঁজে দিলাম। ঠাণ্ডা, আর একটা শক্ত মনে হচ্ছে। একটা হাল্কা মিষ্টি গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে ওর গা থেকে। হয়তো বিকেলে, সেই দুধের মত শাদা, লিকুইড ক্রীম ও সারা গায়ে মেখেছিল। জানি না, আজ কে মাখিয়ে দিয়েছিল। আমাকে দু-একবার মাখতে দিয়েছে, পিঠেই অবিশ্যি, যদিচ আমার স্বাভাবিক প্রবণতা বা ঝোঁকটা অন্যদিকেই থাকতো! অন্যদিকে! মাঝে মাঝে আমার মনটাও সত্যি ভাল কথা ভাবে। অথচ 'অন্য দিকটা' যখন ভাবছি, তখন নীতার 'সামনের' দিকটাই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ওর সামনের দিকটাও সুন্দর। ওর বুক, যদিও একটু

ঢল-খেয়েছে, কী যেন বলে তাকে, 'ঈষৎ-ঈষৎ নমু' তবু গড়নটা বেশ সুন্দর, বড় আর সুগোল, হয়তো এই কারণেই তবু চোখে পড়বার মত, যাকে বলে উদ্ধত, তাই মনে হত। বুক জোড়ার ওপরে, কণ্ঠার কাছ পর্যন্ত একটা চওড়া ভাবের জন্যে, আর পেটে চর্বি বা মেদ, অর্থাৎ ভুঁড়ি না থাকার, গোটা সামনের দিকটা, এক কথায় দারুন। পিক্‌চার যাকে বলে। পিক্‌চার। তার মানে কী। খুবসুরত্। উর্বশী? গুলি মারো। কিন্তু একটা কথা, শরীরের পবিত্রতা কাকে বলে? এর মানে তো আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। পেটের অসুখ নেই, ডিস্‌পেপসিয়া বা ডিসেন্ট্রি, লিভার খারাপ নয়, পিলে নেই, দাঁতে পাইরোরিয়া নেই, কান পচা নয়, নাকে ঘা নেই, পায়ে হাজা নেই। অর্থাৎ যেগুলো প্রায়ই থাকে, ক্রনিকের মত, (সাংঘাতিক বড় বড় অসুখ না।) তাকেই কি শরীরের পবিত্রতা বলে। কী জানি, ওর মধ্যেই সতীত্ব-টতীত্ব ইত্যাদি ব্যাপারও আবার আছে কি না। বোধহয়, আসল মানে ওটাই। কিন্তু শরীর তো অনেক দেখেছি। বাড়িতে কখনো-সখনো অসর্কত মুহূর্তে নিজের বোনকে দেখেছি, অবিশ্যি ওর কথা ভেবেও লাভ নেই, তেইশ বছরের বয়সের মধ্যে ও অনেক প্রেম (পীরিত!) করল। নির্ভেজাল আনকোরা 'সদ্যিকণের নবীনা দেহ' যাকে বলে, তাও দেখেছি। যার সংসর্গ করিনি, কিংবা যার করেছি। অনেকেরই দেখেছি, তার মধ্যে বেশ্যাও আছে, যদিও ভদ্রলোকই বেশী, সতী অসতীর ছাপ বলে তো কখনো কিছু বুঝতে পারিনি। অথচ কথাগুলো বরাবর চালু আছে।

ওই জন্যে হীরেনের গল্পটা আবার খুব মনে পড়ে। উল্লুকটা আর্টিস্ট, (আদর করেই বলছি।) কসবার ইতিকে একবার আবিষ্কার করল। ইতিকে দেখেই ও ভান গখের মত বলতে আরম্ভ করল, 'ঈশ্বরের পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভজাত।' যেন কেউ অস্বীকার করছে, যীশু কোন মেয়ের গর্ভে জন্মেছেন। বুদ্ধদেব বা হজরত, কে নয়। আমরাও। তার মানে, হীরেন সেই প্রথম আবিষ্কার করল, মেয়েরা মহৎ। বেশ, আমরা পেটে ধরতে পারি না বলে যদি অমহৎ হয়ে যাই, না হয় গেলাম। মেয়েরাই সাক্ষী। (আয়নার চোখ টিপলাম।) আসলে, ইতি মেয়েটির মুখে চোখে ও আবিষ্কার করল 'একটি করুণ নিষ্পাপ পবিত্রতা।' হ্যাঁ, কথাটা একদিক থেকে সত্যিই ছিল। হীরেনের আঁকা ইতির পোরট্রেট, অনেকদিন দেখেছি, ইতিকেও দেখেছি বহুদিন। মনে আছে সেই মুখটি, একটু

লম্বা ছাঁদের মুখ, মাঝখানে সিঁথি, দু পাশে চুল এলানো। জানি না, নীরক্ত ছিল কি না ইতি, প্রথম আলাপের সময়, আমার যেন একটু ফ্যাকাসেই লাগত। চোখ দুটি সত্যি বড় বড় আর সুন্দর, চাউনিটা সত্যি সুন্দর ছিল, হয়তো তাকেই চোখের গভীরতা বলে। অনেকটা যেন, ওর চোখের ভিতরে জল লুকিয়ে থাকত। কখন টপ করে গড়িয়ে পড়বে, এমনি একটা ভাব। নাকটা টিকলো, ঠোঁট দুটি পাতলা বলা যাবে না, তবে মন্দিরের গায়ে পাথরের মূর্তির মত অনেকটা। পাথরের মূর্তিগুলোর ঠোঁটকে নিশ্চয়ই পাতলা বলা যায় না, ভারতীয় মূর্তির ঠোঁটের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। (কেন জানি না, সে সব ঠোঁটের ছাঁদ, চুম্বনের পক্ষে বেশ প্রশস্ত ও সুখজনক বলেই আমার মনে হয়েছে)। ইতির ঠোঁটের ভঙ্গিটা অনেকটা সেই রকমের। আমার ধারণা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মেয়েরই ঠোঁট ওইরকম, তবে সব মুখের সঙ্গে, ঠোঁটের সেই ভঙ্গিটা ঠিক ফোটে না। তা ছাড়া, ইতি আমার, আমার ধারণা, ঠোঁটের আশেপাশের পেশীগুলোকে এমন খোঁজ-খাজ দিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিল যে, ঠোঁটের ব্যাপারে ও বেশ সচেতন ছিল। সচেতন তো নিশ্চয়ই ছিল। অবিশ্যি রোগা রোগা, বড়, করুণ চোখে, একটা যেন ক্লান্তি ওর উপছে পড়েছিল, ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা। সব মিলিয়ে, আমার মনে হয়েছিল, রোগে ভোগার পর প্রথম আরোগ্যের আভাস লাগার মত। কথা বলত আস্তে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে সময় লাগত, চলত, ধীরে সুস্থে। আমিও, সত্যি বলতে কি, হীরেনের ওই কথাটাই মেনে নিয়েছিলাম, 'একটি করুণ নিষ্পাপ পবিত্রতা।'

প্রায় খান চারেক পোরট্রেট আঁকা হয়ে গেল মাস খানেকের মধ্যেই। কিন্তু ইতির লম্বা মুখখানি ইতিমধ্যেই আস্তে আস্তে একটু গোল মত হয়ে উঠছিল। অর্থাৎ মুখে মাংস লাগতে আরম্ভ করেছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই দেখেছিলাম, ইতির মুখটা বদলে যাচ্ছিল। আমরা যাদের সুখী বলি, সেইরকম মুখ হয়ে উঠছিল। রক্তের ছোপ লাগছিল, সেই বড় বড় 'করুণ' চোখ দুটিতে, গভীরতা হয়তো ছিল, তবে ঝিলিক হানতে আরম্ভ করেছিল। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, রোগা গতরখানিও একটু ফেঁপেছিল। আমার তো তখন বেশ ভালই লাগত। হীরেনেরও নিশ্চয় লাগত, কারণ গাধাটা তো আবিষ্কারের নেশায় বুঁধ হয়েছিল। বিয়ের জলের চেয়ে প্রেমের জলও যে কম গাঢ় না, তা বুঝতে পারছিলাম।

এবং ইতির সেই প্রেম-গড়ের-মাঠ মূর্তি দেখেও, আমার কিছু পাপী অপবিত্র করুণ মনে হয়নি।

তারপর হঠাৎ একদিন হীরেন এসে প্রথম কথাই বললে, 'বেঁধে গেছে।'

ওকে দেখে মনে হল, ওঝার হাতে ভূত পড়লে ওরকম দেখায় বোধহয়। বললাম, 'তাতে কি, ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিস তো খোলাই আছে।'

'কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়, কিছুদিন দেরী আছে।'

ঈশ্বরের পুত্রকে যারা জন্ম দেয়, তাদের সঙ্গে যে হীরেন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, অতটা ভাবা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের মেজাজ আমার না। বললাম, 'তবে ইভাকুয়েট।'

'ইভাকুয়েট মানে—?

'খসানো।'

'হুম, মানে ওই হল আর কি। যাই হোক, একটু ভয় ভয় লাগছে।'

ভ্যানগখ্! ঈশ্বরের পুত্র! শালুক ছিনেছে গোপাল ঠাকুর। মরো গে এবার। আসলে ওর টাকার দরকার হয়েছিল। কথা দিয়েছিলাম দেব, যোগাড়ও করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দেওয়া হয়নি। ঠিক সে সময়েই একটা মেয়ে জুটে গেল, যাকে বলে আনেক্সপেক্টেড্লি, যদিও খরচ সাপেক্ষ, তবু দুটো দিন আর সব টাকা ব্যয় করে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফেললাম। হীরেন অবিশ্যি আমার জন্যে বসেছিল না, উপায়ও ছিল না। জলের দরে অনেকগুলো ভাল ছবি বিক্রী করে, কোনরকমে টাকাটা সংগ্রহ করে, কার্যোদ্ধার করেছিল। ভেবে রেখেছিলাম, ওকে বলব, কষ্ট করেও মাইরি টাকাটা জোগাড় করতে পারিনি। আর ভেবে দেখেছিলাম, টাকাটা যদি সত্যি ওকে দিতে হত, তবে রাগে আর ঘৃণায় কোন্ দিন ওর ওছায় লাথি কষিয়ে বসতাম। অন্তত মনে মনে তো বটেই।

কিন্তু টাকা জোগাড় করতে না পারার ওজরটা হীরেনকে সোনাতেই পারিনি। কারণ, ওর কোন পাত্তাই ছিল না। ভেবেছিলাম, রাগ করেছে। আমার ওপরে রাগ, তা ভালই বাবা, তবু কিছু মিথ্যে কথা বলার হাত থেকে বাঁচা গিয়েছিল। তারপরেই একদিন, প্রায় মাসখানের মধ্যেই দেখা হয়ে গিয়েছিল ইতির সঙ্গে। আশ্চর্য, (সে বাবা!) একেবারেই ঠিক সেই মূর্তি, প্রথম

দেখা সেই চেহারা, হীরেনের প্রথম আঁকা পোরট্রেট্। গালের মাংস গিয়েছে ঝরে, মুখ লম্বা হয়ে উঠেছে আবার। শরীরটা তেমনি রোগা রোগা, ছিপছিপে, মাঝখানে সিঁথি, দু পাশে চুল এলানো, বড় চোখ দুটোতে সেই গভীরতা না কি কে জানে। আর তেমনি চোখের ভিতরে যেন জল জমে আছে, টপ্ করে গড়িয়ে পড়বে, ঠিক সেই, 'করুণ নিষ্পাপ পবিত্রতা'-এর ছবি। 'ঈশ্বরের পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভজাত।' কে নয়? এমন তো কখনো শুনিনি পুরুষের গর্ভে কোন পুত্র জন্মেছে। এক সেই, আমাদের মাইথলজিতে আছে, কী যেন রাজার নাম? বেশ মজার মজার ঘটনা আছে পুরাণের কাহিনীগুলোতে। শুধু মজার মজার কেন, এমন সব মানুষের আর ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, আমি বিশ্বাস না করে পারি না। ধার্মিক, যোদ্ধা, প্রেমিক, কামুক সকলেই বেশ সোজা। প্যাঁচপয়জারও কম নেই। খালি যে পড়তেই ভাল লাগে, তা নয়, ইচ্ছে হয় নিজেও ওইরকম ডাইরেক্ট হয়ে উঠি। তা হলেই হয়েছে, অমনি পাছার লাথি। লোকেরা মহাভারত মহাভারত করে, কোথায় যে তার সঙ্গে আমাদের মিল আছে, আমি বুঝতে পারি না। কে বিশ্বাস করবে, ওসব হচ্ছে এ দেশের পূর্বপুরুষদের ব্যাপার। ঘচ্চরের পূর্বপুরুষকে কি ঘোড়া বলা যাবে? তবে এটা ঠিক, নিজের কল্পনাকেও অনেক দূর ছুটিয়ে দেওয়া যায়। মাঝে মাঝে আমার পড়তে বেশ লাগে।...হ্যাঁ, ওই রাজাটার নাম মনে পড়েছে, জঙ্গাম্বন। ওর একশো ছেলে ছিল অগ্নির বরে। ইন্দ্র গেল রেগে, তাকে কেন পুজো দেওয়া হয়নি, অতএব রাজাকে মায়াজাল বিস্তার করে, তাকে এক সরোবরে নাইয়ে দিলে। অমনি সে হয়ে গেল এক রূপসী মেয়ে। মেয়ে হলেই একটা পুরুষ চাই, বনের মধ্যে এক ঋষির কাছে তাই গেল সে। আবার একশোটা ছেলে হল, আর মেয়ে হয়ে যাওয়া রাজা, সেই একটা ছেলেকেও রাজ্য ভোগ করতে দিয়ে এল। ইন্দ্র দেখল, যাঃ বাবা ক্ষতি করতে গিয়ে লোকটা দুশো ছেলে পেয়ে গেল। তখন সে দুশো ছেলেকে লড়িয়ে দিলে, রাজার ছেলেদের আর ঋষির ছেলেদের, তাতে সবগুলোই মরে গেল। ঠিক যেন অফিসের ঘটনা, কোন্ কর্তার মন রাখবে, ঠিক কর। যেদিকেই যাবে, মরবে! তার চেয়ে, যে চেয়ারেই যাবে, 'স্যার আপনি যা বলেছেন, দ্যাট ইজ রাইট' এই বলে চালিয়ে যাও না। যেতেও হল তাই, রাজা বেচারী কান্নাকাটি জুড়ে দিলে, তখন সেম্ র‍্যাঙ্ক্-এর কর্তা

ইন্দ্র এসে বলল, 'সাজাটা আমিই দিয়েছি, ক্ষমা চাইছ যখন, এবার তোমার ছেলেদের বাঁচিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এক শো ছেলেকে দেব, (প্রমোশনটা আটকাব না, অবশ্যে পুরোটা নয়)। এখন কোন্ ছেলেদের চাই?' রাজা বললে, 'পেট থেকে যেগুলোকে বের করেছি, সেগুলোর ওপরই মায়া বেশী, ওদের আমি মা কি না।' ইন্দ্র বললে, 'তথাস্তু, এবার বল, আর কী চাই?' রাজা বললে, 'দয়া করে আমাকে মেয়েমানুষই রাখুন, কারণ পুরুষ হয়ে মেয়েদের সংসর্গ করে যে সুখ পেয়েছি, মেয়ে হয়ে পুরুষের করে দেখলাম, ও ব্যাপারে মেয়েদের সুখ অনেক বেশী।' সোজা কথা বাবা, এর পরে যার ক্রয়েড ঘাঁটতে ইচ্ছে করে ঘাটো গিয়ে। গল্পটা গাঁজা কি না জানি না, কথা যে সত্যি, সেটা আমি অনেকবার টের পেয়েছি। সে তো ওদের মুখ দেখলে বোঝা যায়, নীতা যেমন সুখের আলস্যে এলিয়ে, স্বপ্নের ঘোরে বক বক করত, সত্যি জীবনটার কোন মানে খুঁজে পাই না।' 'এক এক সময় মনে হয়, সুইসাইড করি।' আসলে সুখ কেন শেষ হয়, এসব হয়তো তারই বিলাপ, কিংবা সুখের রেশেরই প্রলাপ। তা ছাড়া, গাঁজাই বা কিসের, পুরুষের মেয়ে হওয়ার ঘটনা তো এখন মহাভারত থেকে খবরের কাগজে এসে উঠেছে। তবে, সেখানে কোন ইন্দ্রের কারসাজি টের পাওয়া যায় না, এই যা।

যাক এসব কথা, আমি মেয়েমানুষ হতে চাই না, ভেবে কী লাভ। ওসব হীরনের মাথায় ঢুকলেই ভাল হয়। ইতিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ও কোথায়?'

ইতির হাসিটা সেই প্রথম দেখার মতই, যাকে বলে করুণ। বলেছিল, 'অনেকদিন দেখা নেই।'

'সে কি! একটা গোলমাল টোলমালের কথা শুনেছিলাম।'

যথেষ্ট সহৃদয় হাসি হেসেই কথাটা বলেছিলাম। ছেপে যাবার কোন দরকার মনে করিনি। তাতে ইতি যা খুশি তাই ভাবতে পারত, কিছু যেত আসত না। বন্ধুভাবে নিলে ভাল, না হলে নিরুপায়। চোখ নামিয়ে, একটু হেসেছিল ইতি, লজ্জায় কি না, কে জানে। খুব আস্তে আস্তে বলেছিল, 'মিটে গেছে।'

তবে কী হীরেন কেটে পড়েছে নাকি, প্রায় সেরকম ভেবেই, অবাক হয়ে ইতি মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু যেরকম সাংঘাতিক সত্যান্বেষী মানে মহত্ত্বসন্ধানী, প্রায় ভয়ংকরমুখো, অপরাধী-ধরা কুকুরের মতই মহত্ত্ব সন্ধান করে বেড়ায়, ও যে কেটে পড়বে, তা আমি ভাবতে পারি না।

কথা হচ্ছিল, রেস্তোঁরা পাড়ায়, রেস্তোরাঁ-সিনেমা-বার-ক্যাবারে ; যা বল, সবই। ইতি, একটু যেন দ্বিধা, একটু যেন লজ্জিত (বা করুণ, কে জানে) হেসে বসেছিল, 'খুব বাজে আছেন নাকি?'

হুম, আমি আবার রোগা রোগা করুণ নিষ্পাপ ইত্যাদিতে তেমন উৎসাহ বোধ করি না। তবে মেয়েমানুষ, তাই কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকছিলাম। আসল কথা বলবার আগে, ইতি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হীরেনের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় কি না। তাপরে যা জানা গিয়েছিল, নার্সিং-হোমে কিউরেট করতে গিয়ে ; ডাক্তারের কাছে হীরেন জানতে পেরেছিল, ওর অত ভয় পাবার কিছু নেই, এর আগেও ইতির কিউরেট কেস্ হয়েছে। (তাতে হীরেনের কী। ইতি মাথার দিব্যি দিতে পারে, তাকে যেন হীরেন ছেড়ে না যায়, হীরেনের মাথা তাতে ইতির বোঝার ভারী হবার কিছু নেই।) আমি অবিশ্যি জানতে চাইনি, সত্যি এর আগেও ওকে ফাঁদ কাটবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল কি না। ও নিজেও কথাটা হাঁ না কিছুই বলেনি আমাকে, তবে মহত্ত্ব-সন্ধানী শিল্পীটির পাতলুন যে তাতে ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, সে কথাই ইতি বলেছিল, এবং বলবার সময় সেই 'করুণ নিষ্পাপ' হাসিটা হেসেছিল। শুধু তাই নয়, হীরেনটা এত বড় গর্দভ, মহত্ত্ব সন্ধানের মতই, ডাক্তারের কাছে নাকি (ইতির এ্যানেস্থেসিয়া প্রয়োগে অজ্ঞান কালে) খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, আগের ইভাকুয়েশনের সম্ভাব্য সময়টা ঠিক সে-সময়েই গিয়েছিল, যখন ইতির সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ডাক্তারদের পক্ষে সেটা বলা খুব কঠিন ব্যাপার কিছু না, কিন্তু মহত্ত্বের তদন্তকারী, এ বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়ে মাথাটি খারাপ করে বসেছিল, প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া যাকে বলে। তারপরে দিন সাতেক বাদে, উদ্‌ভ্রান্তের মত উন্মুকটা ইতিকে ডেকে, আর একটা পোরট্রেট এঁকেছিল, যে পোরট্রেটটা অবিকল প্রথমটার মতই দেখতে হয়েছিল। এবং ইতিকে বলেছিল, এর দ্বারা ওর কাছে এই প্রমাণ হল যে, ইতির প্রথম পরিচয়ের সময় যে মূর্তিটা

ও দেখেছিল, সেটাও আসলে নার্সিং হোম থেকে ভেতরের ভেজাল নাশ করার পরেই। আর 'ভেতরের ভেজাল' মানেই পাপ, অর্থাৎ বলতে গেলে, এই দাঁড়াল, 'করুণ নিষ্পাপ পবিত্রতা' বলে যাকে জেনেছিল ও, সেটা হয়ে উঠল 'পাপের সারল্যতা।' গাড়ল! উনি এ যুগের একটি তেইশ চব্বিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবেন, তার এক-আধবার কিউরেট হলেই মহাভারত অশুদ্ধ। তুই নিজে যে কী স্কুল ষ্ট্রীটের অনেক 'ক্রীশ্চিয়ানার' মধ্যে আগে দগদগে 'লাঞ্ছিত আত্মা' আবিষ্কার করেছিস, তার কী। তাদের নিয়ে ঘর করবার প্রশ্ন ছিল না, তাই। আর ইতিকে নিয়ে যেহেতু ঘর করবার স্বপ্ন ছিল, সেই হেতু খাঁটি সতীর সন্ধান। তাই তুমি হয়ে উঠলে, মহত্ত্ব আর পবিত্রতার ইন্‌ভেস্টিগেটর।

এই সব কথার পর, ইতির গা ঘেঁষে বসে কফি খেতে খেতে, আমি বলেছিলাম 'আমি কিন্তু আর্টিস্ট নই।'

'জানি।'

কথাটা আমার বলার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আর্টিস্টদের সঙ্গেই কেবল মেশার বাতিক না থাকলে, ইতির সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব হতে পারে। তাই বলেছিলাম, 'ওই সব মহত্ত্ব বা পবিত্রতার খোঁজ খবর করা আমার পোষায় না।'

ইতি হেসে উঠেছিল। হাসির শব্দটার মধ্যে কোন প্রশ্রয় দেবার মত ভাল-গাগিটি ছিল কি না বুঝতে পারিনি, কিন্তু মুখের ছবিটা ওর তেমনিই দেখতে ছিল। বলেছিল, 'এখন কোন কাজ আছে নাকি?'

ছিল, বাবার জন্যে এক ডাক্তারের ল্যাবরেটরিতে যাবার কথা ছিল, কী সব রিপোর্ট-রিপোর্ট নিয়ে আসার জন্যে। রিপোর্ট তো বেঁচে থাকা পর্যন্তই থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টা দেরী হলেই বা ক্ষতি কী ছিল। বলেছিলাম, 'কাজের চেয়েও, একটা কোন বাজে ছবি দেখতে গিয়ে ফাঁকা হলে বসতে পারলে হত।'

ইতি আবার হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'তা হলে আর এখানে সময় নষ্ট করে কী লাভ।'

আমরা ফাঁকা হলেই গিয়ে বসেছিলাম। তারপরে এ পর্যন্ত ইতির সঙ্গে অনেকবারই ফাঁকা বা বড়বরে বসেছি। হীরেনের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। শিকারী কুকুরের মতই ও এখনো ওই ধরনের মহত্ত্বের সন্ধান করে। ইতির

সঙ্গে যে আমার ভাব হয়েছে, ফস্টি-নস্টি যাকে বলে, সে খবরটা ও জানে, এবং এমনভাবে সেটা ব্যক্ত করে, (ওদের আবার কী একটা পরিশীলিত আধুনিক মন নাকি আছে, যে মন দিয়ে এইসব তুচ্ছতার থেকে উর্ধ্বে চলে যায়।) সে জন্যে ওর মনে কোন ক্ষোভ নেই। কারণ মানুষ তার সত্তাকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করবে, তার জন্যে কেউ পশু হয়ে উঠতে পারে না। 'বিশ্ব প্রাণের মধ্যে যে বেদনা লুকিয়ে আছে'—বুঝেছি, মধ্য রাত্রের শুঁড়িখানাতেই তার উপশম লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমার মুখের রক্ত কি হীরেনের গায়ে একটুও লাগেনি? লেগেছে নিশ্চয়, ওর ক্ষ্যাপা পায়ের লাথি নিশ্চয় অনেকবার আমার মুখে পড়েছে।

যাক এসব, যে কারণে ভাবছিলাম, সেটা হল, নিষ্পাপ পবিত্রতা ইত্যাদির সঙ্গে, চেহারা শরীরের লক্ষণ, এসব টেনে না আনাই ভাল। তা হলে আর ওসব প্রবাদের ছড়া লোকে বলেছিল কেন, 'ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচে।' আসলে শরীর বা মনের পবিত্রতা, কথাটা অর্থহীন মানুষের মনের ভেতরে ওই শব্দগুলো একেবারে অকেজো। নীতার পিঠে নাক ডুবিয়ে গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতেই এসব মনে হল। আজ বিকেলে বোধহয় ওর সেই পার্টটাইম ছুকরি ঝিটা পিঠে ক্রীম মাখিয়ে দিচ্ছিল। কী নাম যেন মেয়েটার, অলকাই তো বোধহয়। ঠিক মনে করতে পারছি না, মোটের ওপর নামটা মোটেই বিয়ের মত নয়। অশোকা অনীতা যা হোক একটা কিছু হবে, সে নামটা হয়তো ওকে ধার করে নিতে হয়েছে। সে যেমন তার দিদিমণিকে চেনে, দিদিমণিও তাকে তেমনিই চেনে। তাই ঝি আর মনিবানীর থেকে, দুজনের মধ্যে বেশ একটা সখী সখী ভাব আছে। অলকা (কিংবা অশোকা অনীতা) দক্ষিণ বাংলার কালো মেয়ে একটি, চেহারাটা মন্দ নয়, বয়সও ওর কত্রীর মতই প্রায়, এবং শরীরের দিক থেকে আরো মজবুত। সে-ই হয়তো আজ ক্রীম লেপে, পরে পাউডার বুলিয়ে দিয়েছিল। তার জন্যে মেয়েটার হাতকে আমার হিংসে করার কিছু নেই, বরং কে জানে, ওই মেয়েটাই কোনদিন পিঠ পেতে দাঁড়ালে, আমিই হয়তো ক্রীম মাখিয়ে দিতাম। নীতার মুখেই শুনেছি, সেই মেয়েটারও অনেক প্রেমিক আছে এবং তারা কেউ চাকর নয়, ভদ্রলোকেরাই তার সাক্ষাত্। ভদ্রলোক! (আমি ছাড়া কে নয়!) মেয়েটার হয়তো সেটাই সান্ত্বনা, ভদ্রলোকদের সঙ্গে তার আশনাই চলে।

নীতার বুকের পাশ ঘেঁষে হাত দিয়ে টেনে ওকে আবার চিত করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু শক্ত লাগল। তুলতে গিয়ে মনে হল ও যেন একটা পাথরের মূর্তি। অথচ একটা শব্দ যেন শুনতে পেলাম। আটকানো নিশ্বাস হঠাৎ একটু গলা দিয়ে বেরিয়ে গেলে যেমন শব্দ হয়, অনেকটা সেইরকম। আমি ভুরু কুঁচকে, নীতার কাত করা মুখের দিকে তাকালাম। না, বেঁচে থাকার কোন চিহ্ন নেই, কোন অভিব্যক্তিই নেই, যার থেকে মনে করা যেতে পারে ওর গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল। আমি আয়নায়, আমার দিকে তাকালাম, ভুরু নাচিয়ে, মনে মনেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার? ঠিক শুনেছি তো?' না কি খাটের শব্দ? কিন্তু সে বিষয়ে খাটটা যথেষ্ট ভদ্র বলেই জানি, ধাপাধাপি করলেও কোনরকম সাড়াশব্দ করে না।

শরীর দুলিয়ে গদীটাকে দোলালাম কয়েকবার, ডবল গদীর ওপরে, আমার এবং নীতার, দুজনের শরীরটাই কয়েকবার, দোল খেল, অথচ শব্দ হল না। কোন শব্দই নেই, তবে শব্দটা কি আমি শুনিনি। সত্যি বলতে কি, আমার একটু অস্বস্তিই হতে লাগল, মানে, বড় বড় কথা বলে তো লাভ নেই, প্রেতাত্মা-টেতাত্মার ব্যাপারটা ঠিক কী, আমার জানা নেই। হয়তো রাস্তায় থাকলে, ব্যাপারটাকে এক কথায় ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিতাম। এমন কি এ ঘরেও, যদি নীতা জীবিত থাকত। এখন যেন একটু, কী রকম, কী জানি বলা যায় না, একটা কিছু যদি দেখতে হয়। মরেছে! এখন যদি এই উপুড় হয়ে থাকা মূর্তিটা অবিকল এমনি উঠে দাঁড়ায়, ঠিক যে ভাবে কোমরটা বেঁকে রয়েছে, একটা হাত মাথার পাশ দিয়ে ওপরের দিকে, আর একটা হাত কনুই মুড়ে, চোখটা যে রকম রয়েছে, সেই রকমই আধবোজার মত, আর মুখটা যে রকম রয়েছে, ঠিক সেই রকম, একটা ভাব অভিব্যক্তিহীন মূর্তির মত উঠে দাঁড়ায় তাহলে তো বড় বেকায়দা। বিশ্রী, ওরকম দেখা যায় নাকি।

কথাটা ভাবতে ভাবতে আমি বাঁ হাত দিয়ে নীতাকে চেপে ধরলাম, বলতে গেলে, প্রাণপণ জোরেই চেপে ধরলাম, যেন বাইচান্স, উঠে পড়লে ধরে রাখতে পারি। ঘরের চার পাশে একবার তাকালাম, ওয়ারড্রব, বইয়ের আলমারি, দুটো

সিঙ্গল সোফা, টেবিলের ওপরে একটা ফ্যাশান ম্যাগাজিন, রেডিওগ্রাম, যার মাথার ওপরে মেলাই পুতুল এবং ড্রেসিং টেবিল আর আয়না। আয়নায় নিজেকে দেখে, অস্বস্তিটাকে মুখ কুঁচকে দূর করতে চাইলাম, নিজেকে খানিকটা সান্ত্বনা অথচ বকুনি দেবার সুরেই বলে উঠলাম, 'যাঃ মাইরি!' মনে মনে বললাম, কিছুই শুনতে পাইনি আমি। হয়তো শব্দটা আমার নিজের গলা থেকেই হয়েছে, হাতের জোর দিয়ে যখন ওকে তুলতে গিয়েছিলাম, তখনই শব্দটা বেরিয়ে থাকবে।

মুখ ফিরিয়ে বাথরুমের দরজাটার দিকে তাকালাম, বন্ধই আছে। পাশের ছোট ঘরটায় কমজোরের আলো জ্বলছে, মাটা পর্দাটার পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে যে কেউ নেই, অর্থাৎ কোন ওই সব বাজে জিনিস, ছায়া-টায়া, বা কোন শব্দ, তাতে সন্দেহ নেই। বইয়ে লেখা আর লোকে বলে বলেই কি ওসব সত্যি আছে নাকি। এ ঘরের আলো তো বেশ জোরই। একটু-আধটু ছোট-খাটো অন্ধকার আছে, ওয়ারড্রব বা ষ্টীল আলমারিটার পাশে। তবু সেখানে সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ ঘরের এই জোরালো আলোটা নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল নীতা, যে কারণে আয়নাটার জন্যে ও একটু সঙ্কোচ করেছিল। আলো না থাকলে, আয়নাটাও সঙ্গে সঙ্গে উধাও। কিন্তু আমি নেভাতে দিইনি। আমার আবার, অন্ধকারে ভূতের মত কিছু দেখলাম বা শুনলাম না, এবং সুজনার না, সেরকম ভাল লাগে না। অবিশ্যি, মাথার থেকেই, কে আছে না আছে, তবু চোখে দেখার ব্যাপারটা আলাদা। যে কারণে অনেক কিছু দেখতে যাই আগরা।

যাই হোক, শব্দটা যে হয়নি, শুনিনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং নীতা ওভাবে উঠে দাঁড়ালেই বা কেন। দাঁড়াতে পারলে কেন? শুনেছি, মৃতেরা অনেক সময় নড়ে চড়ে ওঠে, হয়তো বেঁকে থাকা হাতটা খট করে সোজা হয়ে গেল, কিন্তু সেটা বেঁচে থাকা নয়। আর আচমকা মরলে বোধহয় অনেক সময় গলার নালীর কাছে শব্দ আটকে থাকে, কিংবা বুকের কাছে। চাপ খেয়ে সেটা হেচ্কি ওঠার মত বেজে উঠতে পারে। গলা-কাটা ছাল-ছাড়ানো মুরগীর বেলায় আমি তা দেখেছি। গলা-কাটা ছাল-ছাড়ানো মুরগীর পেট টিপে দেখেছি, বক্ বক্ শব্দ হয়, ঠিক যেমন করে মুরগী ডাকে। একবার পিকনিকে

গিয়ে, তাই দেখে তো আমার এক বন্ধুপত্নী ভিরমি গিয়েছিল আর কী। ওই রকম একটা মাংসপিণ্ডের ভেতর থেকে যদি জ্যান্ত ডাক শোনা যায়, তা হলে হঠাৎ একটু চমকে যেতে হতে পারে। তবে আমার সেই বন্ধুপত্নী যেমনটি করেছিল, 'ও মা! ও কী!' বলেই সেখান থেকে দৌড়, সেটা একটু বেশী বাড়াবাড়িই হয়েছিল। মাংসও খাবে না বলেছিল, তারপরে খেয়েছিল ঠিকই। এক একজন আছে, সব কিছুতেই ভয় বোধহয় ওর মধ্যেই তাদের সুখ। 'ও মা গো, না না না' সম্ভবত 'আ হা গো, হাঁ হাঁ হাঁ' এই শব্দেই বাজে।

কিন্তু যাই হোক, মরা মুরগীর এই শব্দটার কথা আমার জানা আছে, এবং হয়তো নীতার বুকের পাশে, পাঁজরায় আমার হাতের চাপ পড়েই একটা শব্দ বেরিয়ে থাকবে, যদি সত্যি বেরিয়ে থাকে এবং আমি শুনতে থাকি। তা হলেও, একটা অস্বস্তি যখন হচ্ছেই, কয়েকবার 'রাম রাম' বললে কেমন হয়। কিংবা, 'ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি...।' (আমার দিকে তাকিয়ে হাসলাম) শা—।

অবিশ্যি একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, নীতার ভূত যদি উদয় হয়, তা হলে আমার ভয় করবে না। কেন, তা আমি বলতে পারি না, বোধহয় যে কারণে ওর শবের পাশে থেকে, আমার গা ঘিনঘিনিয়ে উঠছে না, সেই কারণেই। সঙ্গে কাউকে না নিয়ে এলেই হল, কেন না, ভূতের জগতের কথা তো বলা যায় না, কাছেই গড়ের মাঠ হয়তো নাইনটিনথ, সেঞ্চুরির কোন সাহেব ডাকাতের ভূতকে সঙ্গে নিয়ে এল! তা ছাড়া নীতা যদি একলাই আসে, জানি না ভূতের চেহারা কেমন হয়, হয়তো ছায়া হয়ে আসবে, বা একেবারে সরাসরি মূর্তি ধরেই আসবে, তাতে আমার ভয় লাগবে না। তবে একথা ঠিক, এখন যদি ও এসে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আমাকে হঠাৎ ওরকম গলা টিপে ধরলে কেন, আমাকে মেরে ফেললে কেন', তা হলে আমি সত্যি কোন জবাব দিতে পারব না।

সত্যি, আমি এখন ভালভাবে সব কথা ভেবেই উঠতে পারছি না, কী করে সেই ওর গলাটা টিপে ধরলাম। ও কী সব বলছিল, আমিও কী সব বলছিলাম, কথাগুলো...। না, এ ভাবে ভাবলে, সারারাত্রেও আমি ঠিক মনে করতে পারব না, ঠিক কোন কথাটার সময় আমি ওর গলাটা—আচ্ছা, তখন তো, তখনো

ও চিত হয়েই শুয়েছিল, আমার বাঁ হাতটা ওরই গায়ের ওপর এলানো, ওর মুখটা আমার দিকে একটু ফেরানো, এবং দুজনেরই একটা আলস্য, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। এমনভাবে তাকিয়েছিলাম, যেন তখন কোন কারণেই আমি চোখ ফেরাতে পারতাম না। ঠিক মত বলতে গেলে ওর সুন্দর মুখে, তাৎক্ষণিক যে সুখের সুখজনিত আলস্যের ও অনুভূতির রেশ মাখানো ছিল, সেই মুখের দিক থেকে চোখের পলক ফেলতে পর্যন্ত পারছিলাম না, যেন পলক ফেলতেই ওকে হারিয়ে ফেলব (পেটে তেমন খুব মাল ছিল না যে, খোয়াব দেখব।) এবং ওর মুখটা দু হাতে ধরে একটা চুমো খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল, অথচ একটা কী রকম ঘৃণার আর রাগে, আর বোধহয় ঈর্ষায় হঠাৎ থু থু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এই ইচ্ছাগুলো যে আজই নতুন করে হচ্ছিল, তা নয়, আরো অনেকদিন হয়েছে। এর কারণ যে ঠিক কী, তা আমি কোনদিনই বুঝতে পারিনি। যে কারণে নীতার কাছে প্রায় রোজই আসবার ইচ্ছে থাকলেও (ইচ্ছে থাকলেও যদিচ রোজই আসা সম্ভব ছিল না, কারণ ওর আরো বন্ধুবান্ধব আছে এবং রোজ আসবার চেষ্টা করলে ঝগড়া তো নিশ্চয়ই হত, এমন কি বেশী জোরজবরদস্তি করলে, ওর পক্ষে পুলিসের শরণাপন্ন হওয়াও অসম্ভব ছিল না। আর এই যে প্রায়ই, প্রায়ই মানে মাসের হিসেবে তিন চার দিন হতে পারে, আমি আসি, তার জন্যে আগে খবর দিই, বা নীতা খবর দেয়) মন থেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। জানি না, এটাও সেকস্ এ্যাটাচ্‌মেন্ট-এর মত ব্যাপার কিনা, এবং সেকস্ এ্যাটাচ্‌মেন্টের সঙ্গে ওরকম রাগ বা ঘৃণার কোন সম্পর্ক আছে কি না, তবে একথা তো ঠিকই যে, নীতার কাছে খুবই আসতে ইচ্ছে করে। যে কারণে দেখেছি, অন্য মেয়ের সংসর্গের সময়েও, নীতার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছে, হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছে, আর তাতে বিরক্ত বোধ করেছি এবং বিকৃত আচার আচরণ করেছি।

এটা একটা কী ধরনের ব্যাপার, আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না। মদের নেশার মত একটা আসক্তি কি না এটা, কে জানে। যেমন আসক্তির ঝোঁকে প্রচণ্ড টানলাম, এবং তারপরে গলার আঙুল দিয়ে, হড়হড়িয়ে থু থু করে তাই ফেলে দিলাম।

অর্থাৎ নীতার কাছে আসবার জন্যে যতটা উদ্‌গ্রীব হই, সত্যি বলতে কি, প্রায় ততটাই অনাসক্তি বোধ করি। এ আবার কী রকম কথা। এরকম কি হতে পারে নাকি, যেন যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন। অনাসক্তিটা আসলে কী ঘৃণা? রাগ? আর রাগই যদি করব, তা হলে ওর কাছে আসবার জন্যেই বা মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকব কেন। আচ্ছা, যেমন ধরা যাক, এরকম অনেকদিন হয়েছে, নীতাকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে চুমো খাচ্ছি, খেতে খেতে চোখ বুজে এসেছে, আবার তাকিয়েছি, এবং ওর আবেশ মাখানো মুখটা দেখতে দেখতে, হঠাৎ একেবারে হঠাৎই মনে হয়েছে, ওইভাবেই ওর নাকের ছিদ্র দুটো সুদ্ধ চেপে ধরে, শ্বাসবন্ধ করে মেরে ফেলি। অবিশ্যি, আজ কার্যত প্রায় তাই ঘটে গিয়েছে, তবে আদর করতে করতে নয়। যদিও তার একটু আগেই, এমন কি মুখ দিয়ে ওর পায়ের নখটা পর্যন্ত ছুঁয়েছি। এর মানে কি, আমি ঠিক কী যে চাই, বা চাইছিলাম বা চেয়ে এসেছি এতকাল ধরে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। মারতে তো অনেকবারই চেয়েছি, মারিনি বা মারতে পারিনি, এবং আজ ওকে মারব বলেও আসিনি, বা কোনদিন রাগে পেলে ওকে খুন করব, এসব কথা আমি কখনো চিন্তা করিনি। একমাত্র—একমাত্র তখনই আমার, কোন কোন সময়ে মনে হয়েছে, ওকে যেন আমি সহ্য করতে পারছি না, অসহ্য একটা ঘৃণা বমির মত উঠে আসতে চাইছে, রাগ ফুঁসে উঠতে চাইছে, যখন ওকে খুবই নিবিড় করে পাই। ব্যাপারটা কেমন যেন মামদোবাজী মামদোবাজী লাগছে, তবু সত্যি বলতে কি, এ ছাড়া, বিষয়টাকে আমি কোন-রকমভাবেই আর ব্যাখ্যা করতে পারি না।

অবিশ্যি আজ যখন ওইরকম একটা ভোজবাজীর মত (ভোজবাজী ছাড়া একে আর আমি কী বলব, তা জানি না।) মনের অবস্থা, অ্যাঁ-ও নয়, ওঁ-ও নয়, মানে এটাও আছে, ওটাও আছে, খুব আদর করে ওর ঠোঁট দুটোকে মুখ ভরে শুষে নিতে ইচ্ছে করছিল, অথচ ঘৃণার আর রাগে তৎক্ষণাৎ থু থু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, ঠিক তখনই আমরা দুজনেই কথা বলে উঠেছিলাম। কথাগুলো প্রথম থেকে ঠিক কীভাবে শুরু হয়েছিল...। না, এভাবে মনে করতে গেলে, মনে করতে পারব না। অথচ পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভেবে

নিতে চাই, কারণ আমাকে এবার প্রস্তুত হতে হবে, যা করেছি, তার হাত থেকে বেরিয়ে যাব কেমন করে।

আচ্ছা, বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে, আমি রবি দত্তর কাছে যাব বলেই সিদ্ধান্ত করেছিলাম। আমার এক বন্ধুর চাকরির জন্যে, পিছনের দরজাটা খোলা যায় কি না, তারই চেষ্টায় রবি দত্তকে ধরাই একমাত্র পথ বলে আমি জানতাম। কারণ পিছনের চাবির কিছু গোছা রবি দত্তর আঁচলে আছে।

কিন্তু রবি দত্তর কাছে যাওয়া হয়নি। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে আমাকে বললে, এমন ভাল ছেলের মত কোথায় যাওয়া হচ্ছে চাঁদের। ভাল ছেলের মত! বন্ধুটি যে কোম্পানীতে চাকরী করে সেই কোম্পানীর গাড়িতেই যাচ্ছিল। একটা ভাল পোষ্টেই সে চাকরী করে। আমি ব্যস্ত হয়ে একটা ট্যাক্সী খুঁজছিলাম, তাই তখন বোধহয় আমাকে ভাল ছেলের মত দেখাচ্ছিল। অন্যান্য দিন, অফিস থেকে বেরিয়ে, কোথাও না কোথাও আড্ডা মারতে বসে যাই। বন্ধুটি গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, 'উঠে আয়।'

আমার তখন আশা, ওর সঙ্গে গেলে, কোম্পানীর গাড়িতেই হয়তো রবি দত্তর বাড়ী পৌঁছে যেতে পারব। আমি বলেছিলামও সে কথা, যে, দেখা হয়ে ভালই হয়েছে, ওর সঙ্গেই আমি চলে যেতে পারব। বন্ধুটি ঘাড়ের ওপর চাপড় মেরে, চোখ টিপে বলেছিল, 'অফিস থেকে বেরিয়েই যেভাবে ছুটেছিস, তোর রবিদি কি ইয়ে করে বসে আছে নাকি?'

আমি বলেছিলাম, 'না না', অন্য একটা দরকার, মানে একজনের—।'

বন্ধুটি আমার কথাই শেষ করতে দেয়নি। হেসে উঠেছিল, বলেছিল 'ওরে শালা ভাদুরে, (ভাদুরে কুত্তা, ভাদ্র মাসে যারা—যাকগে) যাবি যাবি, তোকে আটকাব না। যাবার আগে একটু মুখে দিয়ে যাও আমার শাহেন শা। দু পাত্তর চড়িয়ে গেলে জমবে ভাল।'

বন্ধুটি কোন কথাই শোনেনি, একটা বার-এ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি আমি যে কখনো এক-আধ ঢোক গিলে রবি দত্তর সামনে যাইনি, তা নয়। কিংবা রবি দত্তদের ডেরায় বসেও দু-একবার পান করেছি। যদিও, যেন বেশী খেতে পারি না বা সর্বসমক্ষে যেন খেতে একটু দ্বিধা বোধ করি, এরকম ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। (আয়নায় একবার চোখ টিপলাম, কত রঙই জানিস।) উদ্দেশ্য

আর কিছুই নয়, রবি দত্ত একটু সাধাসিধি করবে, অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে, প্রশ্রয় দিয়ে হাসবে এবং আমার সম্পর্কে একটা পেশাদার মাতালের কথা যেন না ভাবে।

বন্ধুটি হুইস্কি গিলতে গিলতে, ওর অফিসের ষ্টেনোর গল্পই বেশী বলেছিল। মেয়ে স্টেনো, এবং আজও তার সঙ্গেই দেখা করতে চলেছিল। তাই আগে থেকেই 'দু পাত্তর' চড়িয়ে নিচ্ছিল। তার অসুবিধে হচ্ছে, বউটা নাকি বড্ড গোলমাল করছে, সে নাকি ছায়ার মত ওকে অনুসরণ করবে, বলা যায় না, হয়তো অফিস থেকে বেরিয়ে ও কোথায় যায়, কোন অদৃশ্য থেকে বউ সবই লক্ষ্য করছে, অতএব আপাতত কোন বার-এ ঢুকে পড়াই ভাল। প্রায় পাঁচটার সময় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পেগ তিনেক খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, আর বন্ধু ঘড়ি দেখে, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠেছিল, বেয়ারাকে ডেকে তৎক্ষণাৎ বিল মিটিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এক্সকিউজ মী, পরে দেখা হবে, চললাম।'

'শালা।'

আমি মনে মনে বলেছিলাম। আমি ভাদুরে, আর উনি—কিন্তু রবি দত্তর কাছে যাবার কথাটা তখনো ভুলিনি, এবং যাবার জন্যেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম, এবার একটা ট্যাক্সি। ইতিমধ্যে কখন অন্ধকার পুরোপুরি নেমে গিয়েছে, চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে, যদিও জঘন্য ধোঁয়ার ত্রাসে শহরটা যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি আমি যখন অফিস থেকে বেরিয়েছিলাম, তখনই অন্ধকার নামবে নামবে করছিল। এখন বেলা ছোট, পাঁচটাতেই সূর্য অস্ত চলে যায়। আলো জ্বললে কী হবে, ধোঁয়া নরক করে তুলেছে। এ তো আর উত্তর কলকাতা নয়, মধ্য কলকাতার সব থেকে শ্রেষ্ঠ জায়গারই কাছাকাছি, তবু এত ধোঁয়া এখানে কোথা থেকে এল! আমার যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল, সবই অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল! আমি ট্যাক্সির মাথার আলো লক্ষ্য করছিলাম, জলন্ত আলো দেখতে পেলেই চিৎকার করব। জঘন্য! অন্নাণের কুকুরের বাচ্চার মত কতগুলো ছেলে, খালি ট্যাক্সির পেছনে ছুটছে, যাত্রীদের ধরে নিচ্ছে, আর পয়সা নিচ্ছে। কলকাতা! আজ যেন মাসের কত তারিখ! মনে করতে পারছিলাম না। অথচ আমিও তো চাকরি করি, আমার তারিখের কথা মনে

থাকা উচিত ছিল। তারিখটা মনে করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, এবং নিজেকেই গালাগাল দিয়েছিলাম। তারিখটা মনে করতে না পারলে, কী করে বুঝব যে, সহজে ট্যাক্সি পাব। মাসের দু তিন তারিখ হলে হয়তো আমার ঘরের বেয়ারাটাই আজ ট্যাক্সি চেপে বাড়ি যাবে। আর অন্যান্যদের তো কথাই নেই। মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত, তোমার বাবার ক্ষমতা নেই, সন্ধ্যা-বেলায় বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলাতেই তুমি ট্যাক্সি পাবে। তাও আবার এসপ্লানেড চৌরঙ্গি এলাকায়। শুধু তাই নয়, ছ'টার সিনেমা ভেঙেছে, ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যার শো শুরু হতে চলল। তখন ট্যাক্সি পাওয়া লটারির বাজী জেতার মতই তার ওপরে, ওই উচ্চিংড়েগুলো, এক-আধটা ভারী বড় বড় বাসের তলায় চেপ্টে যেতে পারে না? অবিশ্যি আমাকেও শেষ পর্যন্ত হয়তো ওদেরই সাহায্য নিতে হবে, নয়তো এ জায়গা থেকে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। কারণ, ট্যাক্সিওয়ালাগুলোকেও দেখেছি, এই উচ্চিংড়েগুলোর ওপর একটা কেমন সমর্থন আছে, সমবেদনা যাকে বলে। এরা ট্যাক্সি ধরে দিলে, এদের পয়সা না দেওয়া পর্যন্ত গাড়ি স্টার্ট দিতে চায় না। সব দয়ালু, সবাই সবাইকে একটু দয়া দেখাবার জন্যে যেন মুখিয়ে আছে। আর এই পোকাগুলো 'সাব্, মেমসাবদের, দিকেই আগে ট্যাক্সি এগিয়ে দেবে। সে বিষয়ে আমার অবিশ্যি দুর্বলতা ছিল না, কেননা, আমি পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত 'সাব্।' কিন্তু ওফ্! আশ্চর্য, তারিখটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, সাত না আট না দশ। তবে মাসের প্রথম দিকই হবে, ভিড় দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সিনেমা অফিস এবং টাকা সবকিছুরই ভিড়, এবং (কে যাচ্ছে মেয়েটা, তাকাল যেন দু'বার?) ক্রমেই তা বাড়ছে, রাত্রি আটটা অবধি এই অবস্থাই চলতে থাকবে? অবিশ্যি কবি দত্তর ওখানে যে আর যাওয়া হবে না, আমি তখনই বুঝতে পারছিলাম, আর যার চাকরির জন্যে হঠাৎ কবি দত্তর কাছে যাব ভেবেছিলাম, তার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কোথায় সে, একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে দিয়ে তখন সাহায্য করতে পারছিল না! আমার কী দায় কেঁদে গিয়েছে, নিকুচি করেছে। সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারছিলাম, আবার বার-এর দিকেই আমাকে টানছিল। যে বন্ধুটি টেনে নিয়ে গিয়েছিল, (ও বোধহয় ফাল্গুন মাসের নিকাম কুত্তা।) তার ওপরেও রাগ হচ্ছিল। গোপন আশ্রয়ের গর্তে এতক্ষণ বোধয় স্টেনোকে লপ্‌টে নিয়ে বসে গিয়েছিল। আসলে, একটু ড্রিংক

M/s. JHERKARI ROAD. KHULNA.

করার দরকার ছিল, আর একটা নিতান্ত একলা করবে? তাই পথে যে কোন একজন পরিচিতকে পেলেই হত। সেই 'যে-কোন-একজন' আমিই চোখে পড়ে গিয়েছিলাম। নিকুচি করেছে। বলিহারি লোকগুলোকে, এক-একটা খালি ট্যাক্সির ওপরে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, যে কোন আততায়ীর ওপর পড়ছিল। দরকার হলে প্রত্যেকটা লোকই প্রত্যেকের সঙ্গে হাতাহাতি করতে পর্যন্ত রাজী ছিল। আর ঠিক তখনই সময় বুঝে, আমার তলার ব্লাডার টনটন করছিল। কাছে-পিঠে কোথাও কোন ইউরিনাল ছিল না, বার-এ গেলেও (ছন! মেয়েটার নির্ঘাৎ পাছার প্যাড আছে, নইলে অত নেত্য কেন।) হাঁটতে হত। ব্যাপারটা বার-এ সেরে আসতে পারতাম, কিন্তু তখন একেবারেই খেয়াল ছিল না। তখনো পরোপকারে (পরোপকার? না কবি দত্তর সান্নিধ্য, এবং তার কাছে নিজেকে প্রমাণ করা যে, তুমি বন্ধুবান্ধবের জন্যে কিছু করে থাক। যা সত্যি নয়, সব সময়েই তা বলতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, নিজেরই এক-এক সময় সন্দেহ হয়, মিথ্যেটাই সত্যি।) ঝোঁকটা ছিল, মাথায় ছিল ট্যাক্সি। ট্যাক্সি, টনটনানি, আর কলকাতা, সন্ধ্যার কলকাতা বমির থেকেও খারাপ। ইচ্ছে করছিল, বোতাম খুলে দাঁড়িয়ে যাই, কিন্তু মুশকিল, কাছে-পিঠে সেরকম দেওয়াল ছিল না একটাও, যদিও ঘোঁয়ার অস্পষ্ট, তবু চারপাশেই গা ঘেঁষে লোকের ভিড়।

শেষ পর্যন্ত যখন বার-এর দিকেই যাব বলে পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম, সে সময়েই একটা ট্যাক্সি সামনে দাঁড়িয়ে গেল। উচ্চিংড়েগুলো আর কয়েকজন অপেক্ষমান যাত্রী এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে। ড্রাইভারটা চিৎকার করে উঠেছিল, 'আরে ভাড়া হ্যায়।' ট্যাক্সির ভেতর থেকে নীতা আমাকে ডেকেছিল, 'উঠে এস।'

আঃ, সেই মুহূর্তে, একটা ট্যাক্সির কোটর (নীতার জন্য নয়, বা কবি দত্তর কাছে যাবার জন্য নয়, ভিড় এবং অপেক্ষমান জনতার মাঝখান থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নেওয়া।) যে কী সুখের আশ্রয়, অগাধ, স্বস্তি, বলে বোঝাবার নয়। গাড়িটা চলতে আরম্ভ করেছিল, তৎক্ষণাৎ সান্ধ্যকালীন হুইস্কি আমার পেট থেকে জানান দিয়েছিল, আমেজের রেশটা তখনো আছে। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তিনটি বড় পেগ্ আমার পেটে ঢুকে রয়েছে।

PUTO PCHITRA

ধরেই নিয়েছিলাম, নীতা কোথাও নিজের দরকারে চলেছে, পথের মাঝে দেখতে পেয়ে একটা লিফ্‌ট, (যদি নিজের পথে পড়ে) দেবার ইচ্ছে হয়তো হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় চলেছ?'

বলেছিলাম, 'আপাতত একটা ইউরিনাল বা ল্যাভেটরি, নয়তো কোন অন্ধকার খুঁজিতে ছেড়ে দিলেই হবে।'

নীতা হেসে উঠেছিল, এবং কে জানে, ও হয়তো কোন অভিসারে চলেছিল, আর সেই পথেই আমাকে লিফ্‌ট দিচ্ছে, ভাবতে ভাবতেই মেজাজটা বিগড়ে যাচ্ছিল। প্রায় গায়ে গায়েই বসেছিলাম, কনুইটা ওর বুকের কাছেই ঠেকেছিল, অথচ কোন আকর্ষণ বোধ করছি না, এটা বোঝার জন্যে, একটু সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলাম, আর বাইরের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলাম, ঠিক কোন্‌ জায়গাতে নামলে আমার সুবিধে হবে। সন্ধ্যা বা রাত্রের আড্ডাগুলো সবই তো কোন না কোন বার-এ জমে, এবং বন্ধুদের কোন্‌ দল কোন্‌ বার-এ বসে, মোটামুটি একটা ছক করাই আছে। গাড়ি থামিয়েই, সোজা বেটাতে ঢুকে পড়া যাবে, সেরকম একটা জায়গাতে নেমে পড়ার মনস্থ করেছিলাম।

নীতা আবার বলেছিল, 'অফিসের জীপ কোথায়?'

'দেরী হবে বলে ছেড়ে দিয়েছি, মিঃ চ্যাটার্জিকে সেই দমদমে নামিয়ে আসতে হবে তো আগে।'

'এটা কিন্তু অন্যায়, উনি সেকেণ্ড গ্রেড-এর অফিসার, আর তুমি থার্ড গ্রেড-এর বলে, কাছেই তোমাকে আগে না নামিয়ে, সেই দমদমে আগে যেতে হবে, এর কোন মানে হয় না।'

মানে হয় না, নীতা বলছিল। এটা অন্যায়, নীতা বলছিল। কে? না নীতা। কাকে? না আমাকে। সত্যি, মরে যেতে ইচ্ছে করে কথা শুনলে। (মাইরি।) আমি যে তখন একটা ট্যাক্সিসহ নীতার দেখা পেয়ে গিয়েছিলাম, আর তখনই আমার নিচে টনটন করছিল, এবং নীতার গায়ে হাত রাখার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও, যেন আমি অন্য বিষয়েই বেশী ব্যস্ত বা ভাবিত ছিলাম; যেটুকু স্পর্শ লাগছিল, সেটুকুও নিতান্ত গাড়ির দোলানিতেই, এই অনুমানটাকেই বজায় রাখতে চাইছিলাম; নীতা কোথায় চলেছে এই জানবার কৌতূহল হওয়া

সত্ত্বেও, (কোথায় আর, শেষ পর্যন্ত কোন পুরুষের সংসর্গের লোভে) না জিজ্ঞেস করার নিস্পৃহভাব দেখাচ্ছিল, বা রাস্তায় কেন এত ভিড়, কোনটারই কিছু মানে আছে নাকি। মিঃ চ্যাটার্জি, (একটি বুড়ে ষাঁড়, বকনা দেখলেই খ্যাপে, অথচ শরীর অচল।) আমার ওপরেই, সুপিরিয়র, দপ্তরের নিয়মানুসারে, একটা জীপেই যখন দু'জন অফিসারকে যাতায়াত করতে হবে, তখন উনি বজবজে থাকলেও, আমাকে আগে তাই নামতে হবে। এই নিয়মটা অফিস থেকে ফেরবার বেলায়, আসবার সময় অবিশ্যি, মিঃ চ্যাটার্জির ইচ্ছানুসারে, (প্রায় আমার শ্যালকের ইচ্ছানুসারে, খচর।) ড্রাইভার আমে আমাকেই তুলতে যায়, সেখান থেকে দমদম, তারপরে অফিস। যার অর্থ হল, উনি বাড়িতে থাকার সময়টা বেশী পান। এসব হচ্ছে নিয়মকানুনের ব্যাপার। সেকেণ্ড গ্রেডের আর একজন অফিসার, চ্যাটার্জিরই সমবয়সী, প্রায়ই খিস্তি করে বলেন, 'চাটুজ্যেটা ছুঁড়ি সামলাতে সামলাতেই গেল।' একথা অবিশ্যি সবাই জানে, চ্যাটার্জি বাইশ বছর বয়সের প্রথম বিয়ের পর থেকে, প্রতি দশ বছরে একটি করে বউ খেয়েছেন। একটি খেয়েছেন বত্রিশ, এবং বত্রিশেই আবার বিয়ে করেছেন, তারপরে বিয়াল্লিসে আর একটি খেয়ে, এবং বিয়াল্লিশে যাকে গিলেছেন, তখন সেটি নাকি ছিল আঠারো উনিশের। এখন চ্যাটার্জির একান্ন, সেটির বোধহয় সাতাশ আটাশ, (তা বেশ মাখো মাখো-ই হবে বোধহয়। কিন্তু ওদিকে প্রথম পক্ষের বড় ছেলেটিকে নাকি সামলানো দায় হয়ে উঠেছে, সে কোথায় একটা চাকরী-বাকরী করে, তবে বাঁটা অফিস পালিয়ে নাকি বাড়ি যায়, এমনি সব অফিসার্স চেম্বারের গুলতোনি। কেরানীদের টেবিলেই কি আর বাদ যায়? অফিসের জেনারেল ইউরিনালের ছবি এবং চ্যাটার্জি সম্পর্কে মন্তব্য লেখা দেখলেই তো বোঝা যায়। আচ্ছা অফিসারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর এইসব আঁকাজোকা লেখার যোগাযোগটা কীরকম, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। 'অধস্তনদের অসহায় বিক্ষোভ' এইরকম বলতে হবে নাকি? অবিশ্যি আমি যদি অধস্তন হতাম তা হলে চ্যাটার্জির সম্পর্কে এই কীর্তিগুলো নিজেই নির্ঘাত করতাম। এখনো ইচ্ছে করে, কিন্তু ওই যে থার্ড গ্রেড! আমি জেনারেল ইউরিনালের লোক নয়, যদিচ আমি

অবসর বুঝে ওগুলো দেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে মজা ভোগ করি। অবিশ্যি আমার নামেও আছে, যেমন, 'লোচ্চা' বা নামের পরে 'শালা ঘণ্টাকুমার।' কুমার বলার মধ্যে আমার চেহারা পোষাক ইত্যাদির ওপরে কটাক্ষ করে আজ-কালকার সিনেমার হেরোদের সঙ্গে মিলিয়ে বিদ্রূপ করতে চেয়েছ কি না জানি না, কিংবা ঘণ্টা, একমাত্র নেহাত খিস্তির অর্থেই ঘণ্টাকুমার, তা আমি বুঝতে পারি না। আর একটা জিনিস আমাকে করতে চেয়েছে, যাতে আমাকেই সমকামিতার শিকার করতে চেয়েছে, ব্যাপারটা আমাকে কল্পনায় অনুভব করার চেষ্টা করতে হয়েছে এবং তারপর না হেসে উঠে পারিনি? যে লিখেছে, সে একটা চলতি গালাগাল হিসেবেই নিশ্চয় লিখেছে, কারণ আমার ধারণা সেই বয়সটা পেরিয়ে এসেছি, সে বয়সে সত্যি সত্যি আমাকে আমার এক কলেজের লেকচারার দাদারই শিকার হতে হয়েছিল। তা ছাড়া পুরুষদের এরকম জুটি তো আখচারই দেখা যায়, এলিটস্‌দের মধ্যেও নাকি অনেকের এই বাতিক আছে, যাদের অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, বোধহয় স্বভাবটাই ওইরকম কিংবা কে জানে এরাও আবার সবাই দা-ভিঞ্চির মত প্রতিভা হয়ে ওঠার জন্যে এরকম করে কি না।

—জেনারেল ইউরিনালের দেয়ালে প্রায়ই চুনের পোছড়া দিয়ে এগুলো মুছে দেওয়া হয়, এমনকি স্প্রাইং করে ধরবারও চেষ্টা হয়েছে, ধরা যায়নি। তবে কথাগুলোর মধ্যে অনেক সত্যি আছে, আমার ধারণা, যতই ভাল্‌গার লাগুক, কারণ অধস্তনদের রক আমার অচেনা নয়। আমি ওই রক থেকেই চা সিগারেট আর সস্তা কফি হাউস পেরিয়ে, অন্য রকে এসেছি, বার-হোটেল ক্যাবারে-এর রকে, শুঁড়িখানা আর নাচঘর যাকে বলে আর কি। আমি পেরিয়ে এসেছি, ওরা পারেনি, কারণ এ ব্যাপারে আমি ওদের চেয়ে ঘুঘু, কী করে আসতে হয়, সে সব পথঘাট আমার বাবাই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে, (পুত্রের উন্নতিকল্পে বাবা হয়ে একটু যদি অন্যায়-টন্যায় করতে হয়, কী করা যাবে, সেটাকে পাপ মনে করলে চলবে না। হ, নিজেরই পোলা ত।) বাবার মারফতই লোক-চেনাচিনি এবং কাকে কোথায় ধরতে হবে, সে সব সুলুক সন্ধান পেয়েছি। ওরা পারেনি, ওদের বাবারাও পারেনি, আর সেইজন্যেই (অফিসারের অন্যান্য আচরণ ছাড়াও) আমার জুতোর শক্ত গোড়ালির ঠক ঠক শব্দ উঠলেই, বুঝতে পারি, প্রথম যে

কথাটা উচ্চারিত হয়, 'লোচ্চাটা এল।' (ভাবলেই কী রকম একটা বেশ মেজাজ এসে যায়।) তবু দেওয়ালের কথাগুলোর মধ্যে সত্য আছে এবং চ্যাটার্জির বিষয়ে ও তার তৃতীয় পক্ষের ও ছেলের বিষয়ে যা লেখা হয়, তার মধ্যেও সত্য আছে। সেই লোক যদি আমাকে আগে ভবানীপুরে নামিয়ে দমদম যান, তাহলে তার দম কোতল হয়ে যাবেই। অফিসের কাজের মধ্যে যার সব সময় দুশ্চিন্তা, এবং 'কল্পনার মানসপটে' নিজের বাড়ীর যে ছবিটা তিনি দেখতে পান, (স্ত্রী এবং অফিস-পালানো ছেলে) ছুটির পরে তিনি যে বাঘের মত ছুটে যাবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক, যদিচ জানা কথা, তখন নিশ্চয় বাড়ির চেহারা আলাদা। আমি এতবার গিয়েছি চ্যাটার্জির বাড়িতে, কারণ কর্তৃপক্ষের নিয়মানুযায়ী একই জীপ আমাদের দুজনের জিম্মায়, এবং এতবার ভেবেছি তৃতীয় পক্ষটিকে দেখবার, কিন্তু কখনো দেখা পাওয়া যায়নি। মিঃ চ্যাটার্জির মুখে তো কখনোই তার স্ত্রীর কথা শুনিনি। অতএব, 'মারে' সব কিছুরই কোথাও আছে, পৃথিবীর সব মানুষই তা জানে, তবে তখন নীতা যেভাবে বলছিল, 'এর কোন মানে হয় না,' সেটা অনেকটা আমাদের অধিকাংশ কথার মতই অবিশ্বাস্য, যার সঙ্গে ভেতরের কোন মিলই নেই। নীতা যেভাবে বলছিল, সেটাও, যেন আমার বান্ধবী, তার এভাবেই বলা উচিত এরকম একটা অভ্যস্ত মন থেকেই বলেছিল। অনেকটা ঘুসমেজাজের সোহাগী সুরে বলা, কারণ আমার প্রতি অবিচারের ওর কোন মাথাব্যথা ছিল না।

অবিশ্যি ছুটির পরে অধিকাংশ দিনই আমি চ্যাটার্জির সঙ্গী হই না, কারণ দমদম বা ভবানীপুর তখনও আমার গন্তব্য থাকে না; আজ তো আরোই ছিল না, কারণ জীপ নিয়ে ফিরে রুবি দত্তর ওখানে যাব, সেটা সম্ভব ছিল না, এবং আমি যে রুবি দত্তর ওখানে যাব ভেবেছিলাম, সে-কথাও নীতাকে বলিনি। তখন সমূহ একটা টনটনানি দমানো আর একই সঙ্গে, নীতার চিন্তাই আমার মাথায় ঘুলোচ্ছিল, ও কোথায় যাবে, কোন তল্লাটে, কার কাছে, কোথা থেকে এল, এবং কাছাকাছি ছোটখাটো ছোঁয়াছুয়ি, অথচ আমার গন্তব্য লক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল, কোথায় নেমে যাব, যে কারণে সেই দেখা হওয়াটা মহাপাপ বলে বোধ হচ্ছিল, বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে উঠছিল, আর তবু নীতাকে টের পেতে দিতে

চাইছিলাম না যে ওর কথাই ভাবছি। কোন আশা হয়তো ছিল না, না হয় অন্য কোন মেয়ের সন্ধানেই যাব, যদি খুব ইচ্ছে করে। নীতার জন্যে অত রুপোট এখন সইবে না।

কিন্তু দোহাই, গাড়িটা যেন বেশী ঝাঁকানি না খায়, খেলেই টনটনানিটা বেড়ে উঠছিল মনে হচ্ছিল, একটা বিশ্রী কাণ্ডই ঘটে যাবে। এমনিতেই একটু কিডনির ট্রাবল আছে, তার ওপরে মিউকাসের দৌরাত্ম্য বারো মাস, আর এ দৌরাত্ম্যটা এমন জঘন্য একটু বাড়াবাড়ি হলে, এমনিতেই মনে হয়, সব সময়ে যেন ব্লাডারের টনটনানি লেগেই আছে, অথচ পরিষ্কার হতে চায় না। তার ওপরে যদি বেশীক্ষণ চাপতে হয়, সেটা আরো দুর্বিসহ।

একটা বার-এর সামনেই, আমি বলে উঠেছিলাম, 'তোমার লিফটের জন্যে ধন্যবাদ, আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও।'

নীতা বলেছিল, 'কেন, আর পারছ না?'

বলে ও হেসেছিল। রকম ব্যাপারে সবাই হেসে থাকে, নীতা হেসেছিল, অন্যের ব্যাপার হলে আমিও হাসতাম। ও ধরনের যে কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারে মানুষকে অস্থির হতে দেখলে, সত্যি কেন যেন হাসি সামলানো দায় হয়ে ওঠে, অথচ সমস্ত ব্যাপারটা যে অত্যন্ত মর্মন্তুদ, সেটা যাকে দেখে হাসি পায়, তখন সে-ই একমাত্র অনুভব করতে পারে। এই হাসির অত্যাচারে, দাঁতে দাঁত পিষলেও আশ্চর্য এই, তখন রেগে কিছু বলা যায় না। বলেছিলাম, 'না, সত্যি। তা ছাড়া আমাকে তো নামতেই হবে।'

'এখানে নামবে তো আড্ডা দিতে।'

'হ্যাঁ। তবে বলা যায় না একটা কাজও রয়েছে, করে উঠতে পারব কি না জানি না।'

'ভবী ভোলবার নয়।' কথাটা আমি নিজেকেই মনে মনে বলেছিলাম। আসলে নীতার কাছে প্রমাণ করতে চাইছিলাম, (নীতা কি আর একটু চেপে বলেছিল নাকি আমার গায়ের কাছে, স্পর্শটা যেন, আমার পাতলা সার্জের স্বাধীন ইচ্ছার ওপরে জেগে ওঠে, কে বলতে পারে। আমিও হতে পারতাম, অসম্ভব নয়।) আমার পক্ষেও এরকম হওয়াটা বিচিত্র ছিল না। রাত্রি দশটার পর হঠাৎ যে কী স্থির করে বসতাম, তা আমি সন্ধ্যায় কিছুই জানতাম না।

নীতার সঙ্গে দেখা না হয়ে, গেলে, এড়ে-লাগা খোকনের মাই খাবার ঝোঁকের মত যে কাকে টেলিফোনে ডাকতাম বা কার দরজায় গিয়ে হাজির হতাম, কিছুই জানতাম না, হয়তো নীতাকেও রিঙ করতাম, 'হ্যালো, আছ নাকি? কী করছ, গেলে একটু কফি খাওয়াবে? (কফি-খেতে চাও বটে!) জবাব যাই আসুক, ওরকম ক্ষেত্রে জবাব অবিশ্যি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'শরীর খারাপ' বা 'শুয়ে পড়েছি, প্লীজ রগে করো না' হবারই সম্ভাবনা, তার ওপরে, 'এত রাত্রে আর বাইরে থেকো না, বাড়ি চলে যাও লক্ষ্মীটি, (মনে হয় গদান ধরে একটা লাথি কষাই পেছনে।) এমনি সব উৎকণ্ঠিত ভালবাসার কথাও শুনতে পাওয়া আশ্চর্য নয়, কারণ যদি সত্যি হুকমকিয়ে গিয়ে উঠতাম, তা হলে হয়তো দেখা যেত, 'এ্যাঞ্জেল লাকসারির' ম্যানেজার কাম ডাইরেক্টর নীরেশ দাশ, (নমশূদ্র, বলে কায়স্থ, একটি শুয়োরের বাচ্চা, কারণ, মধ্যযুগীয় মিথ্যে কথা বলে।) ওদের টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে, নীতার দাঁত দেখানো হাসির ছবিটার প্রশংসা করতে গিয়ে, একটু-সু, একটু-সু, অন্য রকমের কথা বলছে, আর জোয়ান কালো ঘোড়ার মত (অনেক টাকার মালিক বটে।) নীরেশের দিকে তাকিয়ে নীতা মিঠে মিঠে হাসছে। কিংবা কাশী ব্যানার্জি—গায়ক, দল্‌জিৎ—সেই পাঞ্জাবী ছোকরা, এমন কী হীরেন—মহত্ত্বসন্ধানী শিল্পী কোন গুণীকে যে সেই সুন্দরী যুবতী সমঝদারের অ্যাপার্টমেন্টে দেখতে পেতাম, কে জানে।

মোটের ওপর, আমরা কেউ-ই কিছু জানি না, কখন কী ধরব, কোন্‌টা ধরব, এবং ছাড়ব, কেবল নিজের কাজ মিটিয়ে, অর্থাৎ নিজে সেটা আসলে, চাই সেটা মিটবে জানলে, সেটাই ধরব। তবে, কেন জানি না, একটা কথা বলতে হবে বোধহয়, (কিংবা সেকস্‌ অ্যাটাচমেন্ট!) মেয়েমানুষের ব্যাপারে, নীতার দরজা খোলা থাকলে, তখন আর অন্য কোন মেয়ের কাছে আমার বড়-একটা যেতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্যি কোনদিনই যে যাইনি, তা বলা যাবে না, যেমন অনেক টাকা খুব পাব সেই দিন সেই সময়ে, (হ্যাঁ, আমার চাকরিটাতে ঘুষের মালকড়ি কিছু আছে, নইলে আর থার্ড গ্রেড অফিসারের এত ফুটানি কিসের।) বা নতুন টোপ-ফেলা মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, কিংবা অফিসের বড়কর্তা (হাঙরের মত নির্দয় আর লোভী শয়তান।) কোন কাজ চাপিয়ে দিলে, মাঝে মধ্যে যেটা দিয়ে থাকে, সেরকম ক্ষেত্রে, যোগাযোগ

কয়েকবার নষ্ট হয়েছে। অনাথায়, নীতার খোলা দরজা ফেলে আমি বড়-একটা যাই না, যার কারণটা ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারি না। জানি না, প্রেমে পড়ার প্রথম 'রক্তাবেগ' ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যেহেতু ওকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল বলেই কি না, এবং মোহভঙ্গের, একেবারে চিরদিনের জন্যেই মোহভঙ্গজনিত, 'যন্ত্রণাকাতর হতাশ' দিনগুলো কেটেছিল বলে, যখন আমি হতাশ প্রেমিকের মত, 'বাথায় কথা যায় ডুবে যায়'-এর মত একেবারে ভাঙা হৃদয় অকর্মণ্য (এক ধরনের নির্জীব ঘেয়ো কুকুরের মত যাদের মনে হয় আমার।) হয়ে পড়েছিলাম।

যাই হোক, ট্যাক্সিটা যখন নীতার অ্যাপার্টমেন্ট-এর, অর্থাৎ এই বড় বাড়িটা, যার মধ্যে নীতার এই কোটর (অ্যাপার্টমেন্ট) রয়েছে, তার লন-এ এসে ঢুকল, তখন আবার আমার টনটনানিটা বেড়ে উঠেছিল। সম্ভবত এই কারণে যে, আমি তখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম, নীতার ঘরেই আমি যাচ্ছি। দোতালায় উঠে, কেবল নীতার 'ল্যাচ্ কী' খোলবার যা একটু সময় লেগেছিল, আমি ঠেলে ঢুকে পড়েছিলাম, এবং মোজাকের মেঝেতে অসাবধানে জুতো পেছলাতে পেছলাতে, অন্ধকারেই বাথরুমে ঢোকা দরজাটার ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বাথরুমের সুইচটা আমার জানা ছিল, সেটা যদি বা টিপে দিতে ভুলিনি, তবু বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করার কোন তাগিদই অনুভব করিনি। নীতা শোবার ঘরের আলো জ্বেলে বাথরুমের দরজার কাছে এসে বলেছিল, 'অসভ্য, দরজা বন্ধ করা যায় না।' তখন যে আমার শরীর জুড়ে কী ব্যাপারটা ঘটছিল, তা নীতাকে বোঝানো সম্ভব ছিল না। না, খুব যে একটা স্বস্তির ব্যাপার, তা কিন্তু ঠিক নয়। বরং ক্রনিক অ্যামিব্যাসিস্-এর প্রকোপে, আমাকে দরজা বন্ধ করে একেবারে নয় হতে হবে কি না, শরীরের অভ্যন্তরে আসলে তখন সেই লড়াইটাই চলছিল। কারণ, আমি চাইছিলাম, তা যেন আমাকে করতে না হয়। তার জন্যে দাঁতে দাঁতে পিষে, 'দেহাই মাইরি' ইত্যাদি সব মনে মনে বলেছিলাম, এবং প্রায় গোঙানোর মত স্বরে নীতাকে বলেছিলাম, 'থাক্ না ক্ষতি কী।'

'না।'

নীতা ধমক দিয়ে বলে হাওয়া ঠাসা সরিয়ে দরজাটা জোরে টেনে দিয়েছিল।

যেন ওটা অসভ্যতা, সেই রকম একটা ভাব নিয়ে ও দরজাটা টেনে দিয়েছিল, আসলে দুর্গন্ধ ইত্যাদির জন্যে ওর হয়তো ঘেন্নাই হচ্ছিল, যদিও বাথরুম এবং সারা অ্যাপার্টমেন্ট জুড়েই যথেষ্ট সুগন্ধ ছিল। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াইতে জিতে ফ্ল্যাশ টেনে বাইরে এসেছিলাম। নীতা তখন পাশের ঘরে, (কেন, আমাকে লজ্জা? মরে যাই।) হয়তো একটু ইজি হওয়ার জন্যেই চুলের আটসা, বা বুকের কষণ একটু ঢিলেঢালা করছিল, আমিও কোটটা খুলে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম সোফার ওপর। টাইটার ফাঁস টেনে বড় করে, তুলে নিয়েছিলাম মাথার ওপর দিয়ে, কোটের ওপর ফেলে দিয়ে, পাশের ঘরে গিয়েছিলাম নীতার কাছে, যেখানে ও ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিলে, আমি নিচু হয়ে, শব্দ করে ওর গালে একটা চুমো খেয়েছিলাম এবং ও আমার খুশির কারণটা বুঝতে পেরে, ভুরু টেনে বলেছিল, 'কী কাজ আছে যেন বলছিলে?'

...

'এই কাজ' বলে টেনে ধরে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়েছিলাম এবং নীতা উম্ শব্দে আপত্তি করে, আঁচল দিয়ে আলতো করে চেপে চেপে ঠোঁট মুছেছিল, কারণ তখনো লিপস্টিকে রংটা একেবারে মুছে ফেলতে চায়নি যে, জোরে ঘষে দেবে, আর আমার দিকে ফিরে বলেছিল, 'ফাজিল, কেন, যাও কোথাও বসে বসে গেলো গে।'

কোট থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট ও নিবিড় বোধ হচ্ছিল। আমি নিজেকে নিয়েই, অর্থাৎ নিজের নানান ব্যাপারে চিন্তিত ব্যস্ত, চিন্তা-ভাবনার তলাটে নীতা-টীতা কেউ নেই? অথচ সত্যি বলতে কি, তখন একমাত্র নীতাই আমার মগজে, এমনকি মগজ জুড়ে নীতা এতটাই ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বসেছিল যে, ঠনটনানির তীব্র অনুভূতিটা পর্যন্ত অনেকখানি দমে যাচ্ছিল। শরীরটার কাণ্ডকারখানা সব বোঝা দায়। এই মনে হচ্ছিল, অসম্ভব, যে কোন উপায়ে একটা রিলিজের দরকার, আবার পরমুহূর্তেই নীতা, শরীরের প্রত্যেকটি অংশেই কেবল নীতা।

নীতা বলেছিল, 'কী কাজ?'

নেকী। কথাটা আমি মনে মনে না বলে পারিনি, কারণ ওর গলায় একটা অবিশ্বাসের, শুধু অবিশ্বাসের নয়, অবিশ্বাস আর মজা করার সুর ছিল যেন। যে কারণে গাড়িটা দাঁড় করাবার কোন কথাই ও বলেনি, ড্রাইভারটা যেন গন্তব্য

জেনেই, পিঁপড়ের মত ছুটেছিল। পিঁপড়ের মতই, কারণ সন্ধ্যাবেলার ভিড়ে কোন গাড়িই জোরে ছুটতে পারে না, প্রতি পদে পদে বাধা, তাতে তোমার টাকা পাবার সময় বা প্রেমিকার দেখা পাবার সময় উতরে গেলেও উপায় নেই। এই পুলিশের হাত, এই লাল আলো, যাবতীয় বাধা তোমাকে আটকে রাখবেই। কুৎসিত! আমি নীতার দিকে ফিরে তাকিয়েছিলাম, মুখটা দেখবার জন্যে, কী ছিল ওর মুখে, হাসি না বিদ্রূপ! আমাকে এত বেশী চেনে ও, যেন আমি ওর একটা কুকুর, যেমন প্রভু তার কুকুরের চোখের দৃষ্টি, কান নাড়া ল্যাজ নাড়া, সবগুলোরই সব মানে বুঝতে পারে। 'হাতের পাঁচ' যেমন বলে, 'আঁচলে বাঁধা' বললে যেরকম বোঝায়, কিংবা এও ঠিক হল না, ও যদি কোমর বেঁকিয়ে, পা দেখিয়ে বলে, 'ও আমার এখানকার লোক' তা হলেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। আর সেই জন্যেই রাগে আর ঘৃণায়, ইচ্ছা করছিল, ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে দিই। মনে মনে বলেছিলাম, 'ছেনালী হচ্ছে।' কিন্তু গম্ভীর মুখেই বলেছিলাম, 'সেটা জেনে তোমার বিশেষ ভাল হবে। তুমি কোথায় চলেছ?'

আমি পাল্টা তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিল, 'আমার ঘরে।'

প্রায় একটা থাপ্পরের মতই কথাটা বলেছিল ও, যে কারণে আমি মনে মনে আবার বলেছিলাম, 'হারামজাদী'। এবং সেই 'হারামজাদী' বলার মধ্যে রাগ বা ঘৃণা ততটা ছিল না, যতটা প্রশংসাসূচক আদুরে ভাব ছিল, অনেকটা আমার নিজেকেই আদর করে খিস্তি করার মত। ওর কথার থেকে আরো বেশী করে প্রমাণ হয়েছিল, আমাকে, ঐ পুরুষটাকে ও আপাদমস্তক চেনে, অর্থাৎ আমার জিজ্ঞাসাটাই শুধু নয়, কী শুনলে আমার মুখের মত (জুতো) হবে, সেটাও ও জানত। কারণ ও নিশ্চয়ই আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, ওর সম্পর্কে আমি কী ভাবছি, কোন অভিসার বা কোথাও কোন রমজানি করতে চলেছে ও, আমার এই মনোভাবটা ও পরিষ্কার বুঝতে পারছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার মনে আবার ঈর্ষা ও রাগ ফুঁসে উঠেছিল এই ভেবে যে, এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার মানেই, সেখানে অন্য কেউ কেউ আসবে, জমবে, র‍্যালা হবে। নিজের ঘরে গিয়ে ও একলা থাকবার পাত্রী নয় নিশ্চয়। তাই ঘুরিয়ে বলেছিলাম, 'কেন, কে আসছে?'

'কেউ না।'

'সে কি, কেউ না অথচ এত তাড়াতাড়ি?'

'কেন, আমি কি আমার ঘরে একলা সন্ধ্যাবেলা থাকি না?'

'হ্যাঁ, তোমার তো আবার একলারই গেরস্থালি। তবে সন্ধ্যাবেলা, ঘরের মধ্যে, নীতা রায়...।'

'একলা কোথায়, এই তো তোমাকে পেয়ে গেলাম।'

আর একটা থাপ্পর কষিয়েছিল। হারামজাদী। (ওই সেই একই প্রশংসাসূচক আদুরে ভাবে। তারপরে মনে মনে শব্দ করেছিলাম, হুম! এবং ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছিলাম আবার, ও তাকিয়েছিল আমার দিকে। হুম্, ঠোঁটের কোণ টেপা, আর সেই হাসি, যা বুঝেও ঠিক বোঝা যায় না এবং চকচকে চোখের ছাউনিও সেই রকম, না দেখলে মনে হয়, ও-ও আমার মুখে খুঁজে দেখছে, কথাটা আমি কী ভাবে নিচ্ছি। যাতে দরকার হলে, ওর ইচ্ছেমত এক কথায় আমাকে নাকচ করতে পারে। সাধারণত ওর সঙ্গে তো আমার সম্পর্কটা আবার প্রেমের, (পীরিতের করাত প্রাণ কাটে চিরে চিরে, মালিনী এমন করাত কোথায় পেলি।) তাই সময় সুযোগ বুঝে ও আমাকে টেলিফোনে বা অন্যভাবে খবর দেয়, 'কী হল, সত্যি ভুলে গেলে নাকি? কতদিন দেখা দাওনি বল তো আজ কিন্তু আসতেই হবে।' তার মানে, ওর ইচ্ছানুযায়ী সেই দিনটা আমার। কিংবা ওর স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গী আমি। তখন আমি বলি, 'তুমি তো জান, ভুলি না। কী করব, তোমার তো আবার এ সে নানানরকম, (কসবী! মনে মনে বলি।)' 'তা থাকুক গে, তুমি আজ চলে এস, একটুও ভাল লাগছে না।' (আঃ প্রাণে আর সইছে না সখী।) 'কিন্তু তুমি তো জান, আমি কী রকম হিংসুটে, কেউ থাকলে আমি সইতে পারি না, তোমাকে একলা না পেলে আমার ভাল লাগে না, তাই হবে গো, তাই হবে।' (ইয়াহ।) এই রকম প্রেমের সম্পর্ক যেখানে, সেখানে একলা ঘরে ফিরে যাবার সঙ্গে আমাকে পেয়ে যাবার', কথাটা যখন বলে ফেলতে পেরেছে, তখন নাকচ নাও করতে পারে।

তবু আমাকে বলতে হয়েছিল, 'আর টেনে নিয়ে যেও না, আমাকে নামিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।'

ও বলেছিল, 'আর একটু তো আমার ডের তো এসে গেলাম।'

'কিন্তু তোমার সোস্যাল কন্ট্যাক্ট, লোকজন আমার ভাল লাগবে না।'

'লোকজন থাকলে তোমাকে যেতে বলতে পারি?'

কারণ একটি মেয়ে, দশজনের সামনে তার প্রেমিককে কখনো যেতে বলতে পারে! আমি যে ওর প্রেমিক—প্রেমিকপ্রবর। রাস্তায় যখন পেয়েই গেল, তখন (এ সময়ে মনে হয়, সেই কল্পিত যন্ত্রটা পেলে মন্দ হত না, সেটা দিয়ে মনের খবর সব জানা যায়।) ঘরে গিয়ে টেলিফোন করে এমন কাউকে আর ডাকতে হবে না, যাকে নিয়ে হয়তো সন্ধ্যা, রাত্রিটা কাটাবার একটা পরিকল্পনা করেছিল। কিংবা বিনা পরিকল্পনাতেই, হঠাৎ যাকে মনে আসত, সে যে কখন তার মানে, ও বলতে চাইছিল, আমি তো কোন বার-এ বসে তখন বন্ধুদের সঙ্গে মদ গিলতাম, এবং ট্যাক্সিতেই কেন, ওর হাতে-পায়ে ধরে বলেনি, 'তোমার সঙ্গে যাব' বা সেই জাতীয় কিছু, যাতে ওর মেয়ে-মন (সব মেয়েমানুষের মতই।) খুশি হতে পারত, ও সদয় হয়ে আমাকে নিয়ে আসত, (যদিও তাই এসেছিল।) আর ওকে পেয়ে তখন চুমো খেয়ে যে খুশিতে উপ্‌ছে পড়ছিলাম, এই সব মিলিয়ে ওর স্বভাবজাত খোঁচা দিচ্ছিল, যার মানে, যা-কিছুই দেবে, তার সবটার মধ্যেই এই কথাটা ভুলতে দিতে নারাজ যে, 'দেখ তোমাকে দিচ্ছি।'

কিন্তু ওসব কথার জবাব দেওয়া খুব জরুরী মনে করছিলাম না আমি, বরং জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বের কর না, কী আছে?'

ও বলেছিল, 'কিছু নেই।'

আমি বলেছিলাম, 'শরীর-টরীর খারাপ হলে তো, একটু আধটু চলে।' (একটু-আধটু? ইচ্ছে হলে পঞ্চাশ লিটার।)

'আজ শরীর খারাপ করেনি।'

বলে ও ঠোঁট টিপে হেসেছিল, যার অর্থ দাঁড়ায়, ইচ্ছে হলে সেরকম শরীর খারাপ করতে পারে। যদিও এসব কোন কথাই সত্যি নয়, কারণ ড্রিংক করতে ও অনভ্যস্ত নয়, অথচ হাফগেরস্থ চালের কথাগুলো ও কেন বলে বুঝি না, কারণ ঠিক হাফগেরস্থ বলতে যা বোঝায়, সংসারে থাকে, ঠিক সময় বেঁধে দিনের একটা সময়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে চায় বাইরে, আবার এসে বাপ-ভাইয়ের, মা-বোনের বা বিবাহিতা হলে স্বামী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজেকর্মে

সংসারে দিনযাপন করে, অর্থাৎ গেরস্থ ঘরের মেয়ে বা বউ, অথচ গেরস্থালির জন্যেই দেহ বিক্রী করে, অতএব সে হাফগেরস্থ, (অর্ধেক বেশ্যা, তাই না? এর চেয়ে সহজ ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ আর কী হতে পারে।) নীতাকে তা বলতে পারি না, যাদের মদ খেতে কোন বাধা নেই, খেতেও ভালই বাসে, অথচ সোজাসুজি সেটা কবুল করতে গররাজি, নীতাকে ঠিক সে রকমও বলা যাবে না, তবে দেখা যায় ড্রিংকের কথা হলেই, 'না', 'না থাক', এরকম কিছু না বলে পারে না, এবং খেলে 'আজ শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, একটু খাওয়া যাক, এমনি একটা অছিলা করবে। কিংবা মেয়ে বলেই হয়তো মদ খাওয়াটা সহজে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে একটা সহজাত বাধা থাকে, এই সমাজে মেয়েদের মূল আকর্ষণটাই নষ্ট করে দিতে পারে। ভয়ের এই সহজাত বাধার কথা বলছি।

বলেছিলাম, 'একটু খারাপ কর না শরীরটা।'

নীতা তখন শোবার ঘরের দিকে চলছিল, আমিও ওর পাশে পাশে, গায়ের সঙ্গে গা ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে শোবার ঘরে এসেছিলাম। ও ড্রেসিং-টেবিলটার কাছে দাঁড়িয়ে মুখটা একবার দেখে নিতে নিতে বলেছিল, 'ওসব না হলে চলে না, না? তাহলে বার-এ গেলেই পারতে?'

আমি যে যেতে পারি না, কুকুরটা যে যেতে পারে না, এই জেনেই মনিবের অত ধমক-ধামক শাসন, এবং বুলিটা সহজে ও ছাড়বে না জানতাম, তাই বলেছিলাম, 'না হলেও চলবে, পেটে তো কিছু আছে, তবে আর একটু জমত।'

'না, জমানো-টমানো কিছু হবে না'

বলে, আমার দিকে একবার চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে (শত হলেও প্রেমিক তো তাকে মদ খাওয়ানোটা একটা নৈতিক অন্যায় নয়?) শোবার ঘরেরই পাশে একটা ছোট পার্টিশনের মধ্যে, রেফ্রিজারেটর থেকে আধশূন্য জিন-এর বোতল বের করে নিয়ে এসেছিল। জিন। মদ ধরবার সময় সেই যে ভেটারেনস্‌দের মুখ থেকে শুনেছিলাম, 'মদ নয়, ঘোড়ার মুত' বা 'মেয়েদের ড্রিংকস্‌' (একখানি পাঁট খেয়ে তারপরে যা বলবার বলো যাদু, ঘোড়ার মুত না মেয়েদের ড্রিংকস্‌।) সেই থেকে, বেশ ভাল নেশা হওয়া সত্ত্বেও, জিন দেখলেই ঠোঁট ওল্‌টাবার অভ্যাসটা যায়নি। যেন সব মাঠে মারা গেল আর কি। জানতাম, কেউ হয়তো,

নীতার বন্ধু বা বান্ধবীরা, নিয়ে এসেছিল, এবং আমি এখানেই সঠিক আসছি কি না বুঝতে পারলে, নিশ্চয়ই পথে আসতে একটা হুইস্কি কিনে নিয়ে আসতাম, তবু বলেছিলাম, 'নিজের জন্যে এনেছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমি খেয়ে উল্‌টে যাচ্ছি।'

বলবেই, ও কথাটা বলবেই জানতাম, এবং ও বিষয়ে আর কিছু বলে, কিন্তু মিথ্যে কথা শোনার থেকে, বোতলটা আমি ওর হাত থেকে নিয়েছিলাম। ও গিয়ে আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আমি কাঠের পার্টিশনে ঢুকে নিজেই দুটো গেলাস আর লাইম-এর বোতলটা বের করে নিয়ে এসেছিলাম। ও আয়নায় সবই দেখছিল, এবং চুলগুলো খুলে দিয়ে, মোটা চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নিচ্ছিল। আমি জিন আর লাইম ঢেলে, ওর গেলাসে জল ঢেলে দিয়েছিলাম, আমারটায় ঢালিনি, কারণ এই শীত শীত সন্ধ্যা রাত্রে খানিকটা ঠাণ্ডা জলো স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছে আমার ছিল না। লাইম একটু মিশিয়েছিলাম নিতান্ত মুখরোচক করবার জন্যে, তাও ভাল লাগে না, বিটার থাকলে তাই মেশাতাম। অন্যথায় অভাবে, জিন্‌ আমার নীট্‌ খেতেই ভাল লাগে। অনেকটা ছেলেবেলার হোমিও-প্যাথিক লিকুইড ওষুধের কথা মনে করিয়ে দেয়।

গেলাস দুটো নিয়ে নীতার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, চিরুনী চালানো থামিয়ে ও ফিরে তাকিয়েছিল, বলেছিল, 'আমার জন্যে ঢাললে কেন?'

'একটুখানি, আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার অনারে।'

আমার গলার স্বর বেশ, গদ্‌গদ শোনাচ্ছিল, আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। নীতাও তাকিয়েছিল, যেন (আমার ধারণা) ভাবতে চেষ্টা করছিল, আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে, কার সঙ্গে হত, বা ও কী করত, কোথায় থাকত। তারপরে, ও যেন মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল, আমার দিকে তাকিয়ে, আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে, আমার সঙ্গে যখন থাকে, সেই সব দিন ও সময়গুলোর কথা বোধহয় ওর মনে পড়ছিল, এবং আমাকে এই সন্ধ্যায় পেয়ে যাওয়ার মধ্যে যদি বা কোরকম অসন্তুষ্টি অনিচ্ছা দ্বিধা ছিল, সেগুলো সম্ভবত কেটে যাচ্ছিল, আর তারপরেই সমূহ আবেগ-বশত তাই বোধহয় বলেছিল, 'সত্যি, তোমাকে যে এ সময়ে ওরকম জায়গায় দেখতে পাব, ভাবতেই পারিনি। একবার ভেবেছিলাম, ডাকব না।'

'কেন?'

'জানি তো, এলেই খালি এসব খেতে চাইবে, আর—।'

বাকীটা ও উচ্চারণ করেনি, যা উচ্চারণ না করেই, একটু ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটের কোণ টিপে, অথচ ঠোঁটে চোখে, একটা, যাকে বলে স্পষ্ট ইশারার হাসি ফুটে উঠেছিল, সবই পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল, আমি আর কী চাইব বা করব। আমি তখন ওর গায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম, এবং দু' হাতে গেলাস না থাকলে, সেই মুহূর্তেই নিশ্চিত হাত দিতাম। অবিশ্যি, এ রকম অবস্থায়, না-বলা কাজটা বা চাওয়াটা যে কী, সে তো মেয়েমানুষ মাত্রই ভাল করে সকলের জানা, আর সকলেরই টেকনিক এক, উনিশ আর বিশ। গেলাসটা বাড়িতে দিয়েছিলাম, 'নাও, ধর।'

ও চিরুনীটা রেখে, কাঠের পার্টিশনের আড়ালে চলে গিয়েছিল, একটু হাসি ছিল মুখে, যেন বুঝতে পেরেছিল, হাত খালি হলেই আমি কোন্‌ দিকে বাড়াব। গেলাস দুটো রেখে, আমিও পার্টিশনের আড়ালে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম, ও হিটারটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, রেফ্রিজারেটর থেকে সস্‌পেনে রাখা রান্না মাংস তার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী করছ?'

ও কোন জবাব না দিয়ে, একটা প্লেট আর চামচ টেনে বের করছিল, বুঝতে পেরেছিলাম, একটু খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, যাকে বলে মদের সঙ্গে চাট। আমি সেই অবস্থাতেই পেছন থেকে ওকে আলগোছে জড়িয়ে ধরেছিলাম, তখন ও বলেছিল, 'জানি, অফিস থেকে বেরিয়ে খালি পেটেই এসব চালাচ্ছ।'

কেন জানি না, এ ধরনের কথা শুনলে আমি বুঝতে পারি না, এগুলো মেয়েদের সহজাত কথা কি না, হয়তো ওর অন্যান্য বন্ধুদের এমনি করেই বলে থাকে, আমা-কেও বলে, আজও বলেছিল, তবু, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, এরকম করে বললে বেশ ভালই লাগে। মনে হয়, প্রায় প্রেম-প্রেম ভাবেরই কথা, খালি পেটে ড্রিংক করলে, লিভারের (যে বস্তুটাকে আমি ইতিমধ্যেই অনেকখানি লড়িয়ে শুইয়ে বসে আছি।) ক্ষতি হবে, সে জন্যে ওর দুশ্চিন্তা, এবং আমার লিভারের জন্যে ওর দুশ্চিন্তা—মানে আমার ভালর জন্যে, এই রকম একটা চিন্তা থেকে ওই রকম ধারণা জন্মায় ও আমাকে ভালবাসে, কিংবা আসলে হয়তো ও কিছু না ভেবেই বলেছে, একটা চলতি ধারণার বশেই বলেছে, মদ খেলে একটু মাংস-টাংস তার

M/s ... Traders

সঙ্গে খাওয়ার দরকার, যেমন চায়ের সঙ্গে লোকে বিস্কুট দিয়ে থাকে বা ওর নিজেরই প্রয়োজনে, ওর পেটও খালি থাকতে পারে ; যে ভাবেই হোক, কথাটা বিশেষ করে নীতার মুখ থেকে শোনার জন্যেই, আমার কানে হয়তো অন্যভাবে বাজে, যে কারণে আমার মনটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠতে চায়, গম্ভীর, মানে সীরিয়স, একটা কিছু, (কেন ? প্লেন ! দেখো বাবা, একেবারে হেঁদিয়ে যেও না ।) মানে যাকে বলা যায় ভাবাবেশ ।

আমি ওকে একটু বুকের কাছে চেপে ধরে বলেছিলাম, 'কিন্তু তুমি রাত্রে কী খাবে, তোমার খাবারটা এভাবে—। (যেন এ পাড়ায় রাত্রে আর খাবার পাওয়া যাবে না, কী দুশ্চিন্তা ।)'

কথাটা শেষ না করেই আমি চুপ করেছিলাম । নীতা বলেছিল, 'সে হবে এখন একটা কিছু ।'

আমি বলেছিলাম, 'তা হবে না, তা হলে, রাত্রে দুজনেই কোথাও খেতে যাব ।'

'কিন্তু চিত্রাকে কিছুই বলা নেই, ওর ফিরতে তো সেই রাত দশটা, সাড়ে দশটা ।'

চিত্রা, ঝিয়ের নাম, সেই মেয়েটা, যার নামটা আমি কত কী ভেবেছিলাম ! অলকা, আশোকা, অনীতা, যে নামটা ও যার করে জুড়েছে নিশ্চয়, সে নামটা চিত্রা, এবং সেটা নিশ্চয়ই ধার করা । বলেছিলাম, 'এত রাত হবে ?'

'হ্যাঁ, রোজই তাই আসে, সন্ধ্যাবেলা চলে যায়, ওর তো আবার অনেক গণ্ডা সব আছে ।'

'এসে না হয় একটু বাইরে বসে থাকবে ।'

'তা অবিশ্যি অসুবিধে নেই । রাত্রি এগারোটার মধ্যে ফিরে আসব আমি ।'

যার অর্থ হল, চিত্রা প্রায়ই ওরকম বাইরে বসে থাকে, আর নীতা অনেক রাত্রে ফেরে । তখন একবার আমি ঘড়ি দেখেছিলাম, পৌনে সাতটার মত । মাংসটা প্লেটে ঢেলে পার্টিশনের বাইরে টেবিলের ওপর রেখেছিল নীতা । আমি নিজেই আবার ওর গেলাসটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, হাতে নিয়ে চুমুক দিয়েছিল, আমিও দিয়েছিলাম, তারপরে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিলাম, এবং প্রতিদানের জন্য ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট রেখে, ওর চোখের দিকে

তাকিয়েছিলাম, ও হেসেছিল একটু, আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল, আলতো করে একটু ছুঁইয়ে দিয়েছিল । আমি আরো আশা করেছিলাম, বুকের কাছে টেনে ধরে আবার চেয়েছিলাম, আর ও একটু দাঁত বসিয়ে দিয়ে, চোখ কুঁচকে, যেন শাসাচ্ছে, এমনিভাবে সরে গিয়েছিল । সরে গিয়ে রেডিও-গ্রামের রেকর্ড বাজাবার খোপটা খুলে, রেকর্ড বাছতে আরম্ভ করেছিল, যদিচ তখন গেলাসটা সঙ্গে নিতে ভোলেনি, চুমুক দিতে দিতে রেকর্ড বেছে নিচ্ছিল, আর আমি আমার গেলাস এক ঢোকে শেষ করে, নতুন করে ঢালতে ঢালতে, গুনগুনিয়ে উঠেছিলাম, 'এ পীস্‌ফুল পোর্ট আন্‌ডেসেজেড্‌ বাই দি স্টর্ম...।' যেন ওই গানটা গুনগুন করেছিলাম, জানি না, 'ঝড়ে অক্ষত এক শান্ত বন্দর', নাবিক হয়ে যেখানে যাবার ইচ্ছে ছিল গায়কের, এই রকমের গান । ঝড়ে অক্ষত শান্ত বন্দর বলতে কী বোঝায়, আমি অবিশ্যি জানি না, ভার্জিন বোঝায় না নিশ্চয়, যদি সেরকম ভেবেই কিছু গানটা লিখে থাকে, বা এমন যদি কল্পনা করা হয়ে থাকে, 'যাকে কোন আঘাতেই দমাতে পারেনি, কোন আঘাতেই যে ভেঙে পড়েনি, পবিত্রতা হারায়নি', (বন্দরে আবার পবিত্রতা, বেশ্যার আবার আঘাতে ভেঙে পড়ার ভয়, যেন কলকাতা বন্দরকে আমরা চিনি না, জনি কীপ অ্যাসাইড ইওর লিরিক, শালুক চিনেছে...।) কারণ, গানটার বক্তব্য প্রায় সেইরকম, একটি শান্ত অক্ষত বন্দরে সে নোঙর করতে চেয়েছে । মহত্ত্বসন্ধানী হীরেনই একমাত্র এর মর্ম উদ্ধার করতে পারে । আমি আসলে সুরের জন্যেই গুনগুনিয়ে উঠেছিলাম, তালের জন্যে, যাতে পায়ের তাল আর কোমরের দোলা লাগে ।

তারপরে রেকর্ড বেজে উঠেছিল, প্রথম গান, 'অ্যান্‌ এণ্ডলেস্‌ কিস ।' নীতা গেলাস নিয়ে সরে এসেছিল, এবং রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিজেও গুনগুন করে উঠেছিল, গেলাসটা গালে চেপে, আমার দিকে তাকিয়ে, মন্থর তালে একটু একটু দুলেছিল । নতুন করে ঢালা গেলাসে আমি চুমুক দিয়েছিলাম, নীতার কাছে গিয়ে, ওর গেলাসে ওকে চুমুক দিয়েছিলাম, গেলাসটা ও শেষ করে দিয়েছিল । আবার ঢেলে দিয়েছিলাম, এবং ওকে কুক্ষিগত করে, ওয়াল্‌জ-এর মন্থর তালে নাচতে আরম্ভ করেছিলাম । একটার পর একটা গান বেজে চলছিল, 'হোয়েন আই ওয়াজ অন্‌ দি ওয়ে টু মাই গ্যাল...' 'এ

সক্‌ট্‌, আণ্ড লিকুইড জয় ফ্লোড...'একটার পর একটা গান বেজে চলছিল, আমরা নাচছিলাম, আমি অসবুর হয়ে বারে বারে ঘুমো খাচ্ছিলাম। এক-একটা রেকর্ড' শেষ হচ্ছিল, আর-একটা শুরু হবার কয়েক সেকেণ্ডের ফাঁকে গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলাম, দুজনেই। এক পিঠের রেকর্ড'গুলো যখন শেষ হয়েছিল, আমি তখন বাকীগুলো উলটে দিয়েছিলাম, এবং নীতা ঠিক হিসেব করেই রেকর্ড' বেছেছিল ও চালিয়েছিল। নতুন সুর ও তাল বেজে উঠেছিল নতুন গানে, আমরা টুইস্ট নাচতে আরম্ভ করেছিলাম! নীতার বুক এবং কোমর-দোলানি দেখে, আমার মেজাজ খারাপ (খারাপ মানে, যাকে বলে উল্‌সে ওঠা।) হয়ে উঠছিল, নীতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরছিল, চোখ একটু লাল হয়ে উঠেছিল, সেই লাল চোখ দিয়ে আমাকে যেন কিছু ইশারা করছিল, কিছু একটা, সেটা আসলে টুইস্টের চল্‌তি ঢং-এর মধ্যেই পড়ে, এবং আমার সস্‌ সস্‌ শব্দের সমন্বয়ে, পাক খেয়ে খেয়ে, 'উ-রা-ই-থ্যাঃ' শব্দ (যেটাকে আমার বর্ষার রাত্রে একলা কুকুরীর কাম-কুহরের মত মনে হয়।) করছিল, আর খিলখিল করে হেসে উঠছিল, বা দেখে, নাছ-টাচ চুলোয় যাক ভেবে, (বোধহয় ডাক শুনে ক্ষ্যাপা কুকুরটা তখন ঘোপঝাড় ডিঙিয়ে ছুটছিল।) ওকে সাপটে ধরতে ইচ্ছে করছিল। ধরেছিলামও তাই, যেমনি গান শেষ হয়েছিল, নাচ থেমেছিল, আমি হাততালি দিয়ে, ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম ওর শাড়ির স্ট্রাচটা খসে গিয়েছিল, আমি ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম খাটের ওপর, এবং আমার ব্যাপারটা অনুমান করেই তখন বাতি নেভানো বা আরনার কথা উঠেছিল, আমি বাধা দিয়ে (দর্শনের ঐশিয়ি) ওর গা খালি করে দিয়েছিলাম। তখনই জুতো খোলার কথা উঠেছিল, স্বভাবতই সে সব উৎসাহ তখন আমার ছিল না, বরং উৎসাহবশে যা যা করছিলাম, যা বলছিলাম, তাতে নীতা ক্রমেই আমার বুকের তলায় (যেন বিছের কামড়ের বিষে) টেউয়ের মত দুলে, মুচড়ে মুচড়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল, এবং শুধু মাঝে মাঝে 'না' 'কেন' (আহা, একেই কি প্রেম বলে না, খাঁটি প্রেমের এই তো সর্বোচ্চ শিখর, বল বাবাজী, নীতা রার মেপ্র, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তার।) বা 'তোমার তো কবি দত্ত আছে' ইত্যাদি বুলি বা শব্দ ছাড়ছিল।

তারপরে প্রেম যখন শেষ হল, তখন খোরারির পালা, এবং তখনই ট্‌মরো

I/2280/2280

আর ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে কথাগুলো শুরু হয়েছিল। নীতা তখনো প্রায় আমার বুকের কাছে যদিও আমার সর্বাঙ্গের ভার ছিল না, ওর খালি গায়ের ওপর দিয়ে আমার বাঁ হাতটা এগিয়ে পড়েছিল, বাঁ পা-টা ওর কোমরের ওপর দিয়ে, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর আমার সেই ঘৃণাটা জেগে উঠছিল, রাগ এবং ঘৃণা, যেটাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম, একটা ভীষণ আকর্ষণ অথচ সেইরকম অনাসক্তি, প্রায় নামদোবাজীর মতই যেটা মনে হয়, সে কারণে আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, নীতাও অলস আধবোজা চোখে তাকিয়েছিল, জানি না, আমার মত ওরও আমাকে ঘৃণা হচ্ছিল কি না, রাগ হচ্ছিল কি না; তখন এইভাবে কথা শুরু হয়েছিল:

'যদি আজ দেখা না হয়ে যেত—'

মনে মনে বলেছিলাম, 'কার কাছে এখন এভাবে থাকতে কে জানে।' ওর মুখে আমার থুথু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল।

'হয়তো অন্য কারুর কাছে ছুটতে, না?'

'আমি না তুমি?'

'কেন, কী ভাব তুমি আমাকে?'

'আমাকে তুমি কী ভাব?'

'পুরুষরা বা।'

'তোমাকেও আমি একটা মেয়ে ভাবি। মেয়েরা বা, ঠিক তাই।'

'মেয়েরা কী?'

'সব চাওয়াতেই যে গলে, যে মনে করে, সবাই আমাকে চাক্‌।'

'আর তোমরা? চেয়ে বেড়াও।'

'হ্যাঁ।'

'আর ভালবাসা?'

'যে বা সার ভাল ল্যাভেটরি আছে।'

আমি হেসেছিলাম, নীতা বলেছিল, সে তো তোমাকে গোড়া থেকেই দেখে বুঝেছি।

তৎক্ষণাৎ ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, দিইনি, কেবল ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর আমার প্রথম প্রেমের কথা মনে পড়ছিল, যে

M/s. Jhenidah Traders.
KALI BARI ROAD,
KHULNA.

কারণে এখন আমার সন্দেহ হয়, তখন আমি আদতে হতাশ বা নিরাশ ছিলাম না, দাঁত আর নখকেই শানাচ্ছিলাম সম্ভবত। বলেছিলাম, 'কারণ তুমি গোড়ায় আমার সঙ্গে প্রেম করেছিলে।'

'তোমার চোখ ভীষণ লাল দেখাচ্ছে।'

'মাল টেনেছি।'

'উঃ, লাগছে বুকে, ছাড়।'

'এরকম লাগাতে বেশ লাগছে।'

'তার মানে, তুমি এই, এই রকমই বীস্ট, তুমি কখনোই ভালবাসতে পার না।'

'আর তুমি এ্যাঞ্জেল, তুমি পার।'

'জীবনে কোন মেয়েকে কখনো সত্যি বলনি। এ সময়ে তোমাকে আমার ভীষণ ঘেন্না করে।'

'আর তুমি সতী, চিরদিন সত্যি বলেছ। তোমার মুখে আমার থু থু দিতে ইচ্ছে করে।'

'আমারও করে। ছাড়, আর গলা জড়িয়ে ধরতে হবে না।'

'না, ছাড়ব না।'

গলা জড়িয়ে ধরিনি, আমার বনুইটা ওর গলায়, টুঁটির কাছে চেপে বসছিল। তখন আমি দেখছিলাম, ওর চোখ ফেটে পড়ছিল, ও বলতে চাইছিল, 'তুমি—' আমি আমার শরীরে সব শক্তি দিয়ে চাপছিলাম বলেই বোধহয় আমার গলা চাপা আর মোটা শোনাচ্ছিল, বলেছিলাম, 'কোন কথা নয়, এবং ওর গলাটা যে এত নরম, আগে তা কখনো মনে হয়নি, যেন একটা গর্তের মধ্যে বনুইটা ঢুকে যাচ্ছিল, আর নীতার হাত দুটো যেহেতু ওর দু' পাশে এলিয়ে পড়ছিল, সেই হেতুই, আমার ধারণা, ওর হাত দুটো আমার পেটের কাছে, হঠাৎ খামচে ধরেছিল। আমার বনুই ছাড়বার উপায় না থাকায় এমন জোরে ধরেছিল যে, পেটটা ছিঁড়েই ফেলবে প্রায়। তাই আমি হাঁচকা দিয়ে আমার নিচের দিকটা টেনে তুলে নিতেই পড়পড়, শব্দে শার্টটা ছিঁড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল, আর হাঁচকা দিয়ে ওঠবার দরুনই সম্ভবত গলায় বনুইয়ের চাপটা আরো জোরে পড়েছিল, যে কারণে ও পা-দুটো শূন্যে ছুঁড়ছিল। কোমরযুক্ত (অন্য

কথা মনে করিয়ে দেয়) উঁচুতে তুলে ফেলছিল, আর আমার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়া যাকে বলে, তেমনিভাবে হাত-পা এলিয়ে পড়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল। একে নিশ্চয়ই খুন করাই বলে। সত্যি রাগ জিনিসটা একেবারে চণ্ডাল, অথচ ওকে আমি খুন করতে চাইনি, (মাইরি) কারণ ওকে যদি খুন করতে হয়, তা হলে তো আমার নিজেকেও খুন করতে হয়। কিন্তু ওরে বাবা, অসম্ভব, তা আমি ভাবতেই পারি না যে, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আর আমি সত্যি মরে যাচ্ছি, যদিচ এই ঘৃণায় ও রাগে নীতাও আমাকে গলা টিপে মারতে পারত। ওর কথার থেকে যেন মনে হচ্ছিল, ঠিক আমার যেরকম, আসক্তি অনাসক্তিই না কি জানি না, ভীষণ পেতে ইচ্ছে করে, অথচ ঘৃণায় আর রাগে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে, ওর ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। আমি যেমন ঝগড়া করলেও, এতটা বাড়াবাড়ি করি না, নীতাও তেমনি আজকের মত এতটা রেগে কথাবার্তা বলে না। বরাবরই মোটামুটি মানিয়ে নেওয়া গিয়েছে।

কে জানে হয়তো এই কারণেই আমার ওই কথা মনে হচ্ছিল, যেন কোন তুখোড় শিকারী, একটা মানুষখেকো বাঘকে মারবার জন্যে, গাছের তলায় একটা নধর ছাগলকে বেঁধে রেখেছে, এবং বাঘটা তার নিজের শিকারের সাড়া পেয়ে, গন্ধ পেয়ে, অন্ধকারে বন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে এসেছে। ব্যাপারটা যেন সেই রকমই নয় খানিকটা। যদিচ এরকম একটা কথা একেবারেই হাস্যকর, কারণ সে শিকারীটা কে? ক্যালকাটা পুলিশ কমিশনার? তিনি জানবেন কেমন করে, এরকম একটা বাঘ দিব্যি কলকাতার লোকজনের মধ্যে, একজন বেশ স্যুটেড বুটেড, আবার দায়িত্বশীল, ভদ্রলোক সেজে বেড়াচ্ছে? কিংবা আমাকে খতম করার জন্যে, কোন ভয়ংকর আততায়ী (সে কোথায় থাকে!) এরকম একটা ফাঁদ পেতেছে। দূর, যত বাজে চিন্তা, সবাই শিকারী, সবাই ফাঁদ পাতে।

যাই হোক, আমি থেমে গিয়েছিলাম প্রায়, এবং নীতার ঘাড়-ভাঙা মত সেই চেহারাটা দেখতে ভাল লাগছিল না বলে, ওকে উপুড় করে দিয়েছিলাম। তারপরে—।

মোট ব্যাপারটা যদি এইরকম দাঁড়ায়, তা হলে এখন আমার কী করা উচিত, সেইটা ভাবা দরকার। নীতা যখন মরেই গিয়েছে, এটাকে যখন খুন হিসেবেই

দেখা হবে, তখন আমার নিশ্চয় উচিত, এখান থেকে কেটে পড়া, (ক'টা বেজেছে? ওরে বাবা, পৌনে দশ! ঝি-মেয়েটার প্রেম বোধ হয় এতক্ষণে শেষ হল, এখুনি এসে পড়বে)। কিন্তু বইয়েতে যে-সব কথা লেখে, অপরাধীরা কোন-না-কোন চিহ্ন রেখে যায়, সেরকম কিছু আবার পেছনে ফেলে যাব না তো। তারপরে চট করে হাতে হাতকড়া, চল শ্রীঘর, সেরেছে।

আমি উঠে বললাম, আয়নার দিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি প্যান্টটা চেপে ধরলাম, বোতাম খোলা। চোখে পড়ল, শার্টের নিচের অংশটা যেন টেনে মুচড়ে ছিঁড়েছে, সাংঘাতিক শক্তি বলতে হবে, নতুন টেরেলিনের শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, এমন কি নীতার নখের রঙ পর্যন্ত ছেঁড়া জায়গার কাছে একটু-আধটু লেগে গিয়েছে। জামাটা প্যান্টের মধ্যে গুঁজে নিয়ে, খাট থেকে নেমে, বোতাম আঁটলাম। খাটের চাদরটা টেনে টেনে ঠিক করে, ওরই ব্লাউজ রেসিয়ার ও শায়া দিয়ে ঝেড়ে দিলাম, ওর গোটা-গাটাও মুছে দিলাম, কেন না, ওই যে-সব কী বলে, ছাপ-টাপ থেকে যেতে পারে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাকে বলে। গেলাস ডিস ছামচ সবই পার্টিশনের আড়ালে, বেসিনের মধ্যে রেখে, জল ঢেলে দিলাম। তারপরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, টাই বাঁধতে বাঁধতে মনে হল, যথেষ্ট হয়েছে, জামা ছেঁড়াটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ও বাবা, পায়ের ছাপটা কী করব? ঝাঁট দেব ঘরটা? একি ফ্যাচাং রে বাবা, শেষে ঝাঁটা হাতে ঘর পরিষ্কার করতে হবে, এত মজুরি পোষায় না। খুনীরা এত ঝামেলা নিয়ে এ-সব করে কী করে, আমি তো তাই বুঝতে পারছি না। তবু পার্টিশনের আড়াল থেকে ঝাঁটাটা নিয়ে এলাম। সোফার ওপর রেখে কোটটা গায়ে দিলাম, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, (চোখ টিপে খচর) নিজেকে দেখে হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে, একটু পরে আবার নীতাকে দেখলাম, কিন্তু আয়নার থেকে কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল। কাছে গেলাম (যেমন রাগিয়ে দিলে, তাই মরলে।) এবং মনে হল, নীতাকে আর কখনো পাওয়া যাবে না, ঘৃণা করেও চুমো খাওয়া হবে না, আর আজ ও সত্যি যেভাবে নাচল, মনে হয় বেশ খুশিই ছিল। খেতে যাবে কথা ছিল, আমি তো এমন কি কোন্ হোটেলে খাব, সেটাও ভেবে রেখেছিলাম, যে-হোটেলে গিয়ে আবার একটু ডিংকে করে নাচা যাবে, সেই রকম হোটেলই ভেবে রেখে-ছিলাম, এমন কি, গোটা রাতটা ওর কাছে কাটাতে পারব কি না, তা-ও ভেবে-

ছিলাম, মাঝখান থেকে, দেখ তো কী হয়ে গেল। যাচ্ছেতাই। কিন্তু আমি সত্যি বলতে কি, এতটা শাস্তিও যেন বোধ করছি, সেটা আবার কীরকম শাস্তি, সে মা-ভগাই জানে, তবু কেমন একটা প্রশান্তি (প্রশান্তি?) যেন জড়িয়ে ধরছে আমাকে।

আমি ওর গায়ে হাত না দিয়ে, নিচু হয়ে ওকে চুমো খেতে চাইলাম, (নাটক মনে হচ্ছে, তবু ইচ্ছেটা সত্যি হচ্ছে।) যদিও ওকে না ধরে চুমো খাওয়া অসম্ভব। কারণ মুখটা যেভাবে রয়েছে, ঠোঁটটা বড় বেকায়দা জায়গায় পড়ে গিয়েছে, অত দূর এগোনই মুশকিল তবু যতটা পারা যায়, নিচু হলাম, আর তখনই চোখে পড়ল, ওর ঠোঁটের কষে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আশ্চর্য, আগে দেখিনি তো, এবং সেই প্রায়-শুকিয়ে যাওয়া মোটা রক্তের দরানি দেখে, চুমো খাওয়ার ইচ্ছেটা আমার কেটে গেল, মনে মনে বললাম, 'থাক, শুধু শুধু ঠাণ্ডা মরা ঠোঁটে কী দরকার আর চুমো খেয়ে, ও বেঁচে থাকতে তো অনেকবারই খাওয়া হয়েছে, এই ভেবে উঠে পড়লাম, এবং মনে মনে চুমোটা অনুভব করলাম, আর নীতাও আজ সত্যি বেশ মেজাজেই ছিল, আমার তলার ঠোঁটটা তো এখনো বেশ মালুম দিচ্ছে। খাবার খাওয়ার সময় আরো দেবে। না, আর দেরি না, এবার কেটে পড়া যাক, ঝিটা এসে পড়বে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাব, আর ঠিক এ সময়েই টেলিফোনটা বেজে উঠল, মনে হল, বুকটা একবার ধক্ করে উঠল, কারণ প্রায় একটা মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই যেন শব্দটা তীরের মত এসে বিঁধল, এবং তেমনি ভাবেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, যাতে প্রমাণ করা যায়, 'নো রিপ্লাই,' যার মানে ন'টা পঞ্চাশ মিনিটে, এখন এ ঘরে কেউ নেই। কিন্তু পাশের এ্যাপার্টমেন্টের লোকেরা যদি শুনতে পায়, গাড়লটা থামবে কখন, (কিংবা, খ্যাপা ষাঁড় বলাই ভাল, কারণ রিঙটা এমন ভাবে বাজছে যেন, সেরকম ভাবেই নীতাকে ডাকছে, 'নীতা, কোথায়? আমি রাত্রে তোমার এ্যাপার্টমেন্টে যাব, নী-তা, নী-তা!' কিন্তু চাঁদ, যে-ই হও, হাপিস্।) আমি যে শক্ত হয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুটকি মাছ হয়ে গেলাম। অবিশ্যি টেলিফোনের ও পাশের লোকটার হয়তো আজ আসবার কথা ছিল, হয়তো ভাবছে, নীতা বাথরুমে গিয়েছে রিঙ শুনে...যাক্, থেমেছে, আঃ, হরিবল্, হঠাৎ যেন সব শূন্য মনে হচ্ছে এখন। এতটা, যাকে বলে স্তব্ধ, এর আগে মনে হয় নি। কিন্তু না আর দেরি নয়, ঝিটা এসে পড়বে।

সরে গিয়ে ঝাঁটাটা নিয়ে এলোমেলো বোলালাম মেঝেয়, আর পেছিয়ে গেলাম দরজার দিকে, তারপর ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে মনে হল, ঝাঁটার হাতায় হাতের ছাপ থেকে যাবে না তো আবার। ভেবে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে হাতটা মুছে খাটের নিচে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম। দিয়ে রুমাল সহই দরজার হাতলটা ধরে, টেনে দিলাম, জানি, অটোমেটিক দরজার ভিতর থেকে চাবি পড়ে গেল, বাইরে থেকে কেউ খুলতে পারবে না। একটা কমজোর আলোয় লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির কাছে কেউ নেই, তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। রাস্তায় লোকজন কমে গিয়েছে, বোধেই শীত পড়ছে তো, কিন্তু আমার আর একটু ড্রিংক চাই, যদিচ রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে, মধ্যরাত্রের শুঁড়িখানা ছাড়া উপায় নেই সেদিকেই পা বাড়ালাম।

না, নেশা হওয়ার সম্ভাবনা যে নেই, তা গেলাসে চুমুক দিয়েই বোঝা গেল। আমি মাতাল হতে চাই না কিন্তু একটা ঘোর ঘোর ভাব চাইছিলাম, আমেজ যাকে বলে, যার কোন চিহ্নই এখন আর নেই, সন্ধ্যাবেলার হুইস্কি বা নীটার জিন, সব যেন গায়েব হয়ে গিয়েছে। এ রকমটা ঠিক হবার কথা নয় যে, প্রায় ছ' সাত পেগ পেটে গেল, মিক্সও হল, অথচ শরীরটা একেবারে খটখটে। আর এখানে, এই মিড্‌নাইট বার-এ, হুইস্কিতে কোন স্বাদই নেই, চোট্টারা জল মিশিয়ে একেবারে হোড় করে দেয়, কারণ জানে, এখানে যারা আসে নেহাত দায়ে পড়েই আসে, কারণ নেশা জমেনি, অন্য বারগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অথচ নেশা করবার ঝোঁক চেপেছে, যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ পেলেই যাবে, অতএব, গিলাও করপোরেশনকে পানী। অবিশ্যি অনেকে মেয়েমানুষের খোঁজেও এখানে আসে, সেটাও একরকমের দায়ে পড়ে আসাই বলতে হবে, কেননা, কোথায় আবার এত রাত্রে মেয়েমানুষের খোঁজে যাবে, যদিচ রাজ্যের যত বুড়ি বেশ্যাগুলো, পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত রং মেখে, স্লীভলেস, আঁট খাটো জামা পরে সন্ধ্যের সময় থেকেই, এক বোতল বীয়ার বা যা হোক একটা কিছু নিয়ে (আইন বাঁচিয়ে চলতে হবে তো, তাই খদ্দেরের ছদ্মবেশেই এসে বসতে হয়, কারণ বার তো আর বেশ্যা-বৃত্তির জায়গা নয়, তা ছাড়া, বেশ্যাবৃত্তি তো আবার এ মুলুকে বে-আইনি, আহা, কৃপা কর মা, বেশ্যাবৃত্তি বে-আইনি, তাই-নিরোধের আইনে যাতে পড়তে না হয়, সবাইকেই খদ্দের সেজে বসতে হয়, তারপর তোমরা খদ্দেররা কার টেবিলে কে বসেছে, কে কাকে খাওয়াচ্ছে চোখ ইশারায় ডেকে নিয়ে গিয়েছে, কত টাকার রফা করেছে এবং কোথায় যাবে, তা আমার কান পেতে শোনার দরকার নেই।) বসে যায় এবং এদের মধ্য থেকেই যখন খুঁজে নিতে হবে, তখন সেটা দায়ে পড়েই আসা হয়। বিশেষ করে যাদের আবার দিশী মেয়ে ভাল লাগে না, যারা শাড়ীটাড়ি পরে, সেইরকম মেয়ে যাদের ভাল লাগে না, মেমসাহেবের বাতিক, (সে কারীই

হোক যার ধর্মই হোক, যে-পাড়ার, যে-মুলুকের, যে ধর্মেরই হোক, মোটের উপর ইংরেজীতে বুকনিওয়ালী মেমসাহেব তাকে হতে হবে। তবু মেমসাহেব তো!) তারা আগে আসে এখানে। এই ব্যবসা-এর খ্যাতি আবার সেই কারণেই যে মেয়েরা এখানে ভিড় করে, আর মেয়েরা যেখানে ভিড় করে, এই ধরনের মেয়েরা, যাদের আসল লক্ষ্য ঠিক কলকাতার বাসিন্দা নয়, বন্দরের বিদেশী জাহাজী সাঁইরা, উপোসী হাঙরের মত যারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ট্যাঁকের কড়ি ফুঁকে দিতে যাদের ভাবনা নেই, কারণ পেটের ভাত জাহাজে বাঁধা, ফিরে গেলে খেতে পাবে ঠিক, তাদের যেখানে ভিড়, সেখানে কর্পোরেশনের জল মলে একটু মিশবে, এ তো জানা কথা।' তবে এখানে শুধু বুড়িদের ভিড়, সেটা বললে ঠিক হবে না, দেখলেই বোঝা যায়, ছুঁড়িরা কারুর না কারুর বগলে গলে গিয়েছে, কিংবা কেউ কেউ আগেভাগেই শিকার ধরে কেটে পড়েছে, যদিও কে যে শিকার তা জানি না, যার পকেটের টাকা, তাকেই বরাবর শিকার বলে আসা হয়েছে, আমি তা মানি না, কারণ টাকা দিয়ে যারা মেয়ে ধরে, সে কেন শিকারী না বুঝতে পারি না, সে ব্যাটাও বুড়ো-হাবড়া খাগী রুগী সবই হতে পারে, অথচ দুর্নামের ভাগটা মেয়েদের বেলায়। আমার মনে হয়েছে, এখানে অল্পবয়সী একটু দেখতে ভাল জোয়ান মেয়ে, পাতে পড়তে পায় না, টেবিলে এসে বসতে না বসতে হাসিপ, কোন কোন দিন তো মারামারিই লেগে যায়, চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি পর্যন্ত গড়ায়, পুলিশকে ডাকতে হয়, তারপর খোকন গুণ্ডবরের মত চলে যান হাজতে। (লে হালুয়া!) তবু বেশ্যারাই শিকারী, আর খদ্দেররা সব শিকার (আহা, বাছারে!) এই সম্পর্কটাই বাজারে চালু আছে।

আমার উপায় ছিল না, নীতার এ্যাপার্টমেন্ট থেকে পায়ে হেঁটে কাছাকাছির মধ্যে, এই মধ্যরাত্রির শুঁড়িখানাটাই ছিল, তাই এসেছি, এবং বোধহয় এখানকার গোলমালের জন্যই, আরো খারাপ লাগছে, নেশা ধরছে না। মিউজিক আর গান সব সময়েই চলছে, জোড়ায় জোড়ায় দল বেঁধে সব নাচছে, আর সেই একই গান, 'দি সান ইজ অলরেডি স্লিপিং অন দি ক্যাকটাস', (এ গান কেন শুঁড়িখানার বা এ গানটা নীতারই বা প্রিয়, তা জানি না।) নয় তো, 'মাই লাভ, মাই ডিয়ারেস্ট লাভ!' এর সঙ্গে হাততালি আর টুইস্ট, আমার এসব ঠিক এইন ভাল লাগছে না। সেই গোরানীজ মেয়েটা, এখানে যে মেয়েটাকে আমার সব থেকে বেশী ভাল লাগে, (কালো কিন্তু চেহারাটা দারুণ, এক কথায় কড়ামাল।) সেই

মেয়েটা সম্ভবত ওর আজকের রাত্রের রফা করে ফেলা লোকটার সঙ্গে নাচতে নাচতেই, আমাকে কয়েকবার হাতছানি দিয়েছে, হেসেছে, যার অর্থ, 'তোমাকে দেখতে পেয়েছি' এইরকম সম্ভাষণ, এবং আমিও সেইরকম ভাবেই হাত তুলে হেসেছি, 'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও, তবু নেশা জমছিল না বলেই, ওকে পাবার মত বা ডেকে একটু খাওয়াবার মত ইচ্ছে হচ্ছিল না। এখানে আসা মানেই একটু হল্লোড়বাজী করা এবং হল্লোড়বাজী করতে এলে, ওই মেয়েটাকে না পেলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে, এটা মেয়েটাও জানে, তাই বোধহয় একটু সান্ত্বনাও আমাকে দিতে চাইল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, নেশা তো জমছেই না, তার ওপরে আমি বেশ ক্লান্তি বোধ করছি, যেন গড়াতে ইচ্ছে করছে, হাই উঠছে, চোখে ঘুম ঘুম ভাব, যেটা মোটেই নেশা বা আমেজ নয়। অথচ মাত্র তো সাড়ে দশটা বাজে, এ সময়ে একেবারে বিছানা নেবার মত অবস্থা তো কোনদিনই হয় না। নাঃ, কেটে পড়া যাক, বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ি। তা ছাড়া, একটা মোটা-ঠোঁট রোগা মেয়ে, বুক উঁচিয়ে যেভাবে তাকাচ্ছে, টেবিলে উঠে এলেই এক পাক্কর কোন, না গেঁড়িয়ে ছাড়বে, তার আগেই ওটা ভাল, কেননা, গোরানীজ মেয়েটা হলে তবু একটা বথা ছিল, নেশা জমাবার চেষ্টা করে দেখা যেত, আর ওই মেয়েটা, যার মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, একটু একটু শরীরে যা তাপ আছে, তাও ভুস্ হয়ে যাবে, তাকে কাছে আসার সুযোগ না দেওয়াই ভাল। হাত তুলে বেয়ারাকে ইশারায় ডেকে, বিল দিতে বললাম। বেয়ারাকে ছুটতে হল না, ওর উদির পকেটেই বিল ছিল, যদিও জানাই ছিল, দু'পাক্কর খেয়েছি, অর্থাৎ দু' পেগ, (জলের মাপটা তার মধ্যে ধরতে হবে, যতটা, তা অবিশ্যি জানি না।) অতএব দামটা দিয়ে ওঠবার আগে, আর একবার মোটা ঠোঁটওয়ালীটার দিকে ফিরে তাকালাম, এবং যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই, চোখাচোখি হতেই একটু হাসল, (উস্! দাঁতগুলোও উঁচু, নকল কি না, তাই বা কে জানে।) ঠোঁট নাড়ল, যেন আমাকে 'গুডনাইট' জানাল, যার অর্থ, মনে মনে হয়তো বলছে, 'ওরে শুয়োরের বাচ্চা কেটে পড়লি, একটা পেগ বাগাতে পারলাম না?' আমিও একটু ঠোঁট নাড়বার ভঙ্গি করলাম, মনে মনে বললাম, 'শালুক চিনেছে...!'

দরোয়ান দরজা খুলল, সেলাম ঠুকল, যার অর্থ, সিকেটা আধুলিটা যদি আমার হাত দিয়ে বেরোয়। বেরুবে না জানা কথাই, তাই সেলামের জবাব দূরের কথা, দেখতে না পাওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাহেবি ঢঙ, যদিও, কেন জানি না,

কাঁধের কাছটা তবু একটু কুঁচকে যায়, আর আমি যেন পরিষ্কার শুনতে পাই, দরোয়ানটা আমার দিকে তাকিয়ে, কুকুরের হাসিটা, হায়েনার হাসিতে বেঁকিয়ে মনে মনে বলছে, 'শালা ফোকট কা সাব, ছোটর মে দারু পীনে আয়া।' মনে মনে শুনলাম, এবং আমিও মনে মনে বললাম, 'হাঁ রে গাড়লদালাল (দালাল মানে পীম্‌প্‌), ওসব আমার জানা আছে'—বলে ঘাড়ে একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। না, এখানে ট্যাক্সির অভাব নেই, প্রচুর আসছে, যাচ্ছে, বা এমনিতেও মিটারে, মাথায় আলো জেলে অপেক্ষা করছে, (অনেকটা ওই মোটাঠোঁট মেয়েটার মত মেয়েটার মত, বেকার বেশ্যার অপেক্ষা যাকে বলা যায়।) কারণ, জানে এখান থেকে ভাল খদ্দের পাওয়া যাবে, কিছু উপরি রোজগারের ব্যবস্থা খুবই স্বাভাবিক, চাই কি তেমন মাতাল হলে, পকেট উজাড় করে সবকিছু ঝেড়ে দিয়ে, কোথাও শুইয়ে দিলেই হবে।

শীত, জম্‌ তা মন্দ নয়, অথচ এই শীতটুকু লাগবার কথা নয়, গা বেশ গরম থাকবারই কথা, কিন্তু কোথায় আমার শরীরে যেন তেজ নেই, তাপ নেই, কী হল, কে জানে। একটা ট্যাক্সির হাতল ধরে, দরজা খুলে ভিতরে বসলাম। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে চাই' আমি 'সাউথ' উচ্চারণ করলাম। খুশি হয়নি লোকটা বোঝাই গেল, কারণ মাতাল নই, সঙ্গে মেয়েমানুষ নেই, নিশ্চয় মনে মনে বলছে, 'শালা কিসমত খারাপ।'

কিন্তু, ওটা কে, নীতা নাকি? একটা মেয়েকে দেখে হঠাৎ তাই মনে হল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল, নীতা ওর ঘরে মৃত পড়ে আছে, ওকে এখন এখানে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। কে জানে, কি-টা এতক্ষণে এসেছে কি না, এসে থাকলেও নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকতে পারেনি, চাবির ফুটো দিয়ে নিশ্চয়ই উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছে, যেহেতু ঘরের আলো আমি অফ করিনি, তাই ফুটো দিয়ে হয়তো চোখেও পড়েছে, নীতা খালি গায়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। আচ্ছা, কোমরের কাপড়টা ঠিক ছিল তো? আমি তো আর টেনেটুনে দিয়ে আসিনি, সেসব খেয়াল আমার ছিল না, যদিও কোমর অবধি কাপড় টানা থাকলেও কি যা ভেবেছে, না থাকলেও তাই ভেবেছে, ভেবেছে যে, দিদিমণি আজ হয়তো খুব মাতামাতি করেছে, তাই এলিয়ে পড়ে আছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভাববার চেষ্টা করছে, কে এসেছিল? এইসব ভাবতে ভাবতে, নিশ্চয় কলিংবেল টিপেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেই সে-শব্দ শুনেছে, অথচ কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে, আবার

ফুটো দিয়ে উঁকি মেরেছে, দেখেছে, দিদিমণি যেমন শুয়ে থাকার তেমনি শুয়ে আছে, একটুও নড়াচড়া নেই। তারপরে জানি না বাবা, মরা মানুষ অনেকক্ষণ বাদে বেঁচে উঠেছে, এরকম তো শোনা যায়, সেই যে কে একটা লোক মরে যাবার পর পোড়াতে নিয়ে গিয়ে, শ্মশানে বেঁচে গিয়েছিল, দার্জিলিং-এ না কোথায়, সেও তো আবার খুনেরই ব্যাপার, কী যেন বলে, এক 'চাঞ্চল্যকর মামলা' হয়েছিল, সেরকম হয়ে যাবার চান্স নেই তো! কেন না, এখন আবার বেঁচে উঠলে ফ্যাসাদ আছে, সত্যি সত্যি খুনের দায়ে পড়ে যাব। অথচ না সত্যি খুনের দায়ে পড়ে যাব। অথচ না, সত্যি কী যে বলি, আমি এখন প্রায় ভুলে যেতেই বসেছি, নীতাকে নিজের হাতেই মেরে ফেলেছি, যদিচ, আমার নিজের ধারণা, পাকা খুনীর মত আমি অনেককেই মনে মনে মেরেছি, যার হিসেব করাই দায়, যে হিসেবের মধ্যে আমার বাবা পর্যন্ত বাদ যায় না, তবু সত্যি, নীতাকে অথচ...।

আমার এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে, (না, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, কাঁচটা তুলে দিই।) একটা অদ্ভুত স্বপ্ন আমি সপ্তাহ দুয়েক আগেই দেখেছিলাম, যার কোন মাথা-মুণ্ডু আমি বুঝতে পারিনি, এবং সেটা আসলে আমার নিজের কোন ব্যাপারই নয়, যে-ঘটনাটা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি দেখেছিলাম, নক্‌শাকাটা লোহার রেলিংঘেরা একটা পুকুর, পীচের রাস্তার ধারেই সেই পুকুরটা, যার চারপাশে কী ছিল, সেটা সঠিক স্মরণ করতে পারছি না, মনে হয়, শ্যাওলা-ধরা দেওয়াল ছিল। পুরনো বাড়ির দেওয়াল হতে পারে, তাতে হয়তো সেকালে বাড়ির মত জানালাও ছিল, আমার মনে পড়ছে না। যাই হোক, রেলিংঘেরা থাকলেও রাস্তার ফুটপাতের উপর থেকেই সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়েছে এবং এখনো হয়তো লোহার গেট ছিল, যেটা তখন (আমার স্বপ্নের সময়ে।) আর ছিল না। যদিও, তখন দিনের বেলা, যেন কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা ভেজা ভেজা, আকাশটা কালো কালো, রাস্তায় তেমন লোকজন নেই, অথচ সেটা একটা শহর, কোন্‌ শহর, তা কিছুতেই বুঝতে পারিনি, এখনো পারি না। আমি কোথা থেকেই বা এসেছিলাম, কেনই বা ওই সময়ে, ওই পুকুরের ধারে গিয়েছিলাম, তাও আমি জানি না, যে কারণে স্বপ্ন মানেই উৎকৃষ্ট পীজা বলে আমার ধারণা। আমি সেই পুকুর ধারে, নিচের সিঁড়িতে দেখেছিলাম, একটা খালি গা ভিখিরির মত লোক, লাঠি দিয়ে জলে খোঁচাচ্ছে। কী আছে দেখবার জন্যে আমিও উঁকি দিয়েছিলাম, এবং জলটা এত পরিষ্কার, ঠিক যেন কাঁচের

চেয়েও পরিষ্কার তলাটা দেখা যাচ্ছিল, যে জন্যে, আমি দেখেছিলাম, একটা ফর্সা মেয়ে জলের তলায় ডুবে আছে। মেয়েটার গায়ে কিছুই ছিল না, সে উপুড় হয়ে পড়েছিল। স্বপ্নে ছাড়া এমনটা কি সম্ভব যে, একটা মরা শরীর জলের তলায় ডুবে থাকবে, আবার তা (একেই বোধহয় 'স্ফটিক স্বচ্ছ' জল বলে।) দেখাও যাবে। বলিহারি স্বপ্ন বাবাজি কে জানে সেদিন পেটে কী পরিমাণ 'দ্রব্যসম্ভার' ছিল। যতদূর মনে পড়ে, লোকটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে জলে ডোবা শবটা তুলতে চাইছিল, এবং আমি কেন তার পাশে বসে পড়েছিলাম, তার হাতের লাঠিটা নিয়ে আমিও মৃতদেহটা তুলতে চাইছিলাম, তার কোন কারণই জানি না। সেই ভিখিরির মত লোকটা বা মরা মেয়েটা, কেউ যে আমার পরিচিত নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।...যখন ওভাবে দেখছিলাম, তখনই হঠাৎ একটা পুলিস ভ্যান আসতে দেখেছিলাম দূর থেকে এবং দেখেই লাঠিটা ফেলে, পীচের রাস্তা পেরিয়ে, একটা কাঁচা রাস্তা ধরে চোঁচা দৌড় মেরেছিলাম! দু'একবার পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখেছিলাম, ভ্যানটা পুকুরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, পুলিস নেমে এসেছিল, তাদের সঙ্গে একটা কুকুর। তারা কী যেন জিজ্ঞেস করেছিল সেই ভিখিরির মত লোকটাকে, লোকটা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিস আমার দিকে দৌড়তে আরম্ভ করেছিল। পুলিসের থেকেও অনেক তাড়াতাড়ি কুকুরটা আমার পিছনে ধাওয়া করেছিল, আমাকে ধরবে ধরবে করতে করতেই; 'স্বপন পারাপারের খেয়া' খচ্ করে থেকে গিয়েছিল, ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, এবং বেশ কয়েক সেকেণ্ড সময় লেগেছিল, যাতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা একটা স্বপ্ন। বুকটা সত্যি আমার ধকধক করছিল, ঘরের চারদিকটা একবার দেখেছিলাম, বিছানাটা হাত দিয়ে দেখেছিলাম, আবার ধপাস্ করে শুয়ে পড়েছিলাম, 'যাক বাবা, তা হলে সত্যি নয়।'

ওই সে একই কথা, আজকাল তো আবার সবই সারাটেফিক, কে জানে ওই স্বপ্নের মধ্যেও সে রকম কিছু আছে কি না, তবে নীতার ব্যাপারের সঙ্গে স্বপ্নটার যেন মিলই নেই, এমন কি প্রথম শীতের কলকাতার এই রাত্রি, আজকের এই সবই, যাকে বলে প্রায় ডবলেট হয়ে যাওয়া এই দিনের সঙ্গে কোন মিলই নেই।

'দাঁড়াতে হবে।'

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আমি ভাড়া মিটিয়ে নামলাম।

স্থাপিত-১৯৩৭

আমাদের বাড়ির ছোট বাগানের বেড়ার ধার দিয়ে, বড় রাস্তা থেকে ঢুকতে হয়। যদিও বারান্দা থেকে বেড়ার ধারের সরু রাস্তাটা মাত্র হাত পনেরো, তবু বারান্দার সান-সেট্-এর তালার আলোটা একটু জোরালো হলে, সবদিক থেকেই ভাল হয়, অথচ প্রায় জিরো পাওয়ারের আলোটা কোন দিনই বদলানো হয় না। এত অস্বস্তি লাগে আমার, ঠিক যেন মনে হয়, নরকের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। লালচে মিটমিটে, অন্ধকার অন্ধকার আলো, আর বাগান তো একেবারে যাকে বলে 'বিশ্বের বিস্ময়' হ্যাঙিং গার্ডেন, ওজের কল্পবতী ফুল গাছ, যার লম্বা লম্বা পাতা এই মিটমিটে লালচে আলোর বিচ্ছিরি ধরনের ছায়ার মত দোলে, যা দেখলেই আমার খারাপ লাগে। ভয় আমি পাই না, তবু আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু বাড়ির যিনি কর্তা, অর্থাৎ আমার 'পিতৃদেব', তিনি মনে করেন, বাইরের এই আলোটা বেশী পাওয়ারের করা অর্থহীন। কারণ, বারান্দায় আসবার জন্যে, ওই আলোই নাকি যথেষ্ট এবং শুধু তাই নয়, বেশী পাওয়ারের আলো দিলেই যেহেতু ওটা যে কোন সময়েই চুরি যেতে পারে, সেই হেতু ওভাবে মিস্ইউজ করার পয়সা নেই। তা ছাড়া, যেটা সন্ধ্যার সময় থেকেই জ্বলবে, সেটাতে বেশী খরচা করা যায় না, এই হল ভদ্রলোকের অভিমত। এই ধরনের হিসেবীদের জন্যেই সম্ভবত 'সামনে দিয়ে ছুঁচ গলে না, পেছন দিয়ে ফাল গলে যায়' কথাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে।

হুম্, যা ভাবা গিয়েছিল, তাই, বারান্দা থেকে সোজা দোতালায় উঠে যাবার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ, আর বাঁ পাশের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, এবং যথাপূর্বং তার দরজাও বন্ধ। আর ঘরের মধ্যে যে এখন কে কে আছে, তা-ও আমার জানা, এবং ঢোকবার মুখে এই কংক্রীটের ফালি পথে আমার পায়ের শব্দও যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই, আর শব্দ পাওয়া

মাত্রই যারা, হাতে হাত দিয়ে, গায়ে গা দিয়ে, কে জানে, পায়ে পা গলিয়েই বা বসেছিল, নয় তো ঠোঁটে ঠোঁট ঢুকিয়ে—কী বলা যাবে, 'ওষ্ঠামৃত' না কি 'মুখামৃত' পান করছিল (কেন, থুথু—অমৃত বা দাঁতের ময়লা কিংবা পাইরোরিয়ামৃতই বা নয় কেন, জানি না। চোষবার সময় কি আর ওসব মনে থাকে? যদি থাকত, তবে অনেক মুখেই তো মুখ দেওয়া যেত না, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসত, ওয়াক্! শালা, এক-একটা মুখে কী দুর্গন্ধ মাইরি, কিন্তু আশ্চর্য, তখন একেবারেই খেয়াল থাকে না, যদিও একটা বিদ্‌নি ঠিক লাগে, তবু ওই আর কি, লোহা চিবিয়ে খাবার মত যেমন নোংরার বেহদ্দ হোটেলে বসেও খেয়ে নেওয়া যায়, অনেকটা সেই রকমের, আগে তো কলজে ঠাণ্ডা হোক, তারপর ওসব ভাবা যাবে, তারপরে গা ঘেলায় তো বমি করা যাবে। ওরকম আমার অনেকবার হয়েছে, এমন কি, কোন কোন সময় নীতার মুখেও দুর্গন্ধ পাওয়া গিয়াছে। ওর পক্ষে যেটা খুবই আশ্চর্যের, কারণ ওসব বিষয়ে ও খুব সচেতন ছিল, তবু গলায় ফ্যানিনজাইটিস না কী বলে, ঠাণ্ডা লাগলে গলা ব্যথা করে কিংবা পাকস্থলী পরিষ্কার না থাকলে দুর্গন্ধ ঠিকই বেরোয়, আমরও বেরোয়, লিভার-টিভার খারাপ থাকলে তো কথাই নেই, যে-কারণে দুর্গন্ধের ভয়টা আমারই বেশী, তবে পেটে একটু হুইস্কি-টুইস্কি থাকলে, ওতেই মেরে দেয়। তা ছাড়া, আমি তো ওর দাঁতের ফাঁকে এঁটে-থাকা খাবারের কুচিও অনেক সময় গিলে মিরে দিয়েছি, নীতাও নিশ্চয় দিয়েছে, যেমন আজও ওর মুখের মাংসের কুচি বা আমার মুখেরটা ওর মুখে চলে গিয়েছিল, এবং মুশকিল তখন মুখ খুলে, ওগুলো থুথু করে ফেলা যায় না, গিলেই ফেলতে হয়, পরে ভাবলে অবশ্য একটু ঘিন ঘিন করে, যদিচ, নীতার বেলায় আমার আবার তেমন কিছু মনে হয় না, এখনো সেরকম মনে হচ্ছে না, ওর হত কি না জানি না, কোনদিন বলেনি।) যাক গে, হ্যাঁ, বাইরের ঘরে, দরজা বন্ধ করে যারা বাড়িতে বসেই সুবোধ বালক-বালিকার মত প্রেম করছিল, তারা নিশ্চয়ই নিজেদের আলাদা করে, যাকে বলে সভ্য ভব্য হয়ে, যাকে বলে শালীন হয়ে বসেছে, এবং সিঁড়ির দিকে যাবার দরজাটাও বন্ধ ছিল, সেটাও টুক করে গিয়ে খুলে দিয়েছে, যাতে আমার কাছে প্রমাণ করা যায়, 'দেখ নিতাজ সাদা কাগজের মত দুটিতে বসে আছি' নিতাও খোকা খুকু, তবে যদি বল,

এত রাত্রি পর্যন্ত বাইরের ঘরে তোমরা দুটিতে বসে এত কী জরুরী কথা বলছ, সেটা কেমন অভদ্র সন্দেহপ্রবণ বলে মনে হয় না? শত হলেও ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে, মা-বাবার মনের কথাটাও জান, হ্যাঁ, ওই আর কী, একটা 'এনগেজমেন্ট' যদি ঘোষণা করা যায়, অ্যারেঞ্জমেন্ট করে তো আর, যাকে বলে সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দেওয়া, ওরকম কিছু চাপিয়ে দেওয়া তো আর, চলে না। লেখাপড়া শিখেছে, বড় হয়েছে সবাই, আর বাড়িতে বসেই যখন কথাবার্তা বলছে, বাইরে গিয়ে তো কিছু বেলেল্লাপনা করছে না (যেন কেউ দেখতে গিয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় কে কোথায় কাটিয়ে এসেছে।) অতএব, এটা তো ঘটবেই, তোমাকে এই স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। এই স্বাধীনতা! কত স্বাধীনতা যে তলিয়ে গেল, সে খবর কে রাখে।

তবু, অর্থাৎ জুতোর শব্দে সাবধান হলেও, শব্দ পাওয়াটা জানতে দিতে নারাজ, তা হলে সাবধান হওয়াটা খানিকটা প্রমাণ হয়ে যায়, অতএব, আমাকে কলিংবেলের বোতামটা টিপতেই হয়, এবং আমাকেও বুঝে নিতে হবে, বাইরের ঘরে কেউ নেই, অতএব আমিও ইচ্ছে করেই বেশী সময় ধরে বোতাম টিপে ধরি, যেন ওপরের লোকদের কানে যাবে বলেই টিপতে হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যায়। দরজা খুলেই সামনে দাঁড়ায় বিদিশা, (কেন এ ধরনের নাম রাখা হয়েছে, আমার জানা নেই, ওটা যতদূর জানি, একটা জায়গার নাম, তার মানে বিদিশা সেরকমই একটা জায়গা, ওর বাবা-মা কি তাই ভেবেছিল, নাকি কানে শুনতে ভাল লেগেছিল বলে, জানি না, তবে দিল্লী বোম্বাই কায়মাণ্ডু কায়মাটার কী দোষ করেছিল।) আমার 'সহোদরা', যাকে 'ভগ্নী' বলে আর কী। ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, যেটা বলতে চাইছে, 'খুলেছি বাবা আর টিপতে হবে না', যদিও সেটা না বলে, মুখের ভাবেই বোঝাতে চাইছে, এবং আমার বোঝবার কথা নয়, কারণ আমি তো জানি না নিচে বাইরের ঘরে এখন কেউ আছে, অতএব তুই একটা নেকী, আমিও একটা ন্যাকা, যদিও অবিশ্যি পরমুহূর্তেই আমি মুখের ভাবটা করি, 'ও, তুই নিচেই আছিস নাকি বুঝতে পারিনি।' জানি, আমার মুখের দিকে তাকাবেই, বিদিশা (ওকে বাড়িতে খুকু বলা হয়, আহা, বোনটি আমার খুকুমণি, পার করেছেন ক'জনই, যাঃ বাবা, কবিতাই বলে ফেললাম, ঋচরটির প্রতিভা আছে বলতে হবে।) নাকে

গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইছে, দাদাটি কী পরিমাণ গিলে এসেছেন, যদিও বাড়িতে মাতলামি করবার পাত্র আমি নই, কখনো করিনি, তবু আমার প্রতি মনে মনে একটা ভয় ঘৃণা ওর আছে আর সেটা মদ খাবার জন্যেই নয়, বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই এমন যে, আমি রোজগার করে ওদের মাথা কিনেছি, আমি বড়, অতএব আমাকে রেসপেক্ট করতেই হবে। অথচ আমরা নিজেদের বেশ ভাল করেই জানি, মোটামুটি কার কী মতলব, যে-সব মতলবগুলোর অধিকাংশই হল, কেউ কারুর কড়ি ধারে না, সবই বুজরুকি, যে-যার নিজেরটা ঠিক বুঝে নেবার তালে আছে, 'চালিয়ে যাও বাবা', 'গরুক গে ছাই, বয়ে গেছে, কার ঘাড়ে কে বাঁশ কাটে' এমনিভাবে বললে যেরকম বোঝায়, তবু যেমনটা হতে হয়, আমি 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা' ও 'কনিষ্ঠা ভগ্নি' এই ধরনের ওপরের তাগিদগুলো সব বজায় আছে। 'তুমি কার কে তোমার' এ-সব ভগবৎ কাব্য বোঝা হয়ে গিয়েছে বাবা, 'দুনিয়াদারী ফক্কিকার' সবাই বুঝে নিয়েছি, তবে কেউই সেটা খোলাখুলি দেখায় না, যদিও মনে মনে সবাই জানে। তার ওপরে, আমার মত যদি 'বড়ই ভাবিত' বা 'অতীব দায়িত্বশীল' (ঘরে নয়, বাইরে, নইলে ছলনাটা বজায় রাখা যায় না।) ভাবভঙ্গিগুলো বজায় রাখা যায়, কিংবা কিছুটা 'দুর্মুখ' বলে প্রমাণ করা যায় তা হলে তুমি একটি উৎকৃষ্ট বদ বলে বাড়িতে গণ্য হতে পার, যে-কারণে সবাই তোমাকে ভয় করবে, ঘৃণা আরো বেশী, কারণ, একটু বেশী খোলাখুলি হয়ে যেতে হয়। তাতে অবিশ্যি সুবিধাটা এই, কেউ বিশেষ ঘাঁটাবার সাহস পায় না, নিজের কোট বজায় থাকে, আর অনেক কালতু সুযোগ নেওয়া যায়, কারণ, সত্যি বলতে কি, কারুর জন্যে আমার তেমন দুঃখ-টুঃখ হয় না, যেরকম অনেকের দেখা যায় বা শোনা যায়, আমার জন্যেও অন্য কারুর হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না, শালুক আমি চিনি। মোট কথা হল গিয়ে সংসার-টংসারের রূপোটা আমার ভাল লাগে না, যাকে বলে পরিবার, ফ্যামিলি, কারণ, ওসব কাকে বলে আমি বুঝি না।

ঘরে ঢুকতেই যেটা প্রথম লক্ষণীয়, সেটা হল বশংবদ কুকুরের মত হাসি (কুকুর যে হাসে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।) ও লেজ নাড়তে নাড়তে, প্রায় আমারই বয়সী একটা লোক উঠে দাঁড়ান, এই লোকটা—অর্থাৎ বর্তমানে যে

বিদিশার প্রেমিক, কত নম্বর, আমি সেটা ঠিক বলতে পারব না, কারণ, বিদিশার সঙ্গে বেশী রাত অবধি গল্প করার অধিকার খালি এ-লোকটাই পায়নি, আরো কয়েকজন পেয়েছে (এই হিসেবটা অবিশ্যি বাড়ির হিসেবের কথা বলছি, যাকে বলা যায়, 'পিতা-মাতার অনুমত্যানুসারে'—কেননা, আজ সন্ধেবেলাতেই কার সঙ্গে কোথায় ঘুরে এসেছে, কে জানে, হয়তো এ-লোকটিকেও ধাপ্পা মেরেছে, যে এখন 'অনুমত্যানুসারে' এত রাত্রি অবধি রাস্তা করার সুযোগ পেয়েছে, কারণ, এটি নিশ্চয়ই, সমাজে নাম করা, পিতৃদেবের বন্ধুস্থানী এমন কোন ভদ্রলোকের ছেলে, চাকরিটিও মন্দ করে না, অতএব—) সে আমাকে বলে উঠল, 'এই যে দাদা, ফিরলেন?'

এই 'দাদা' উচ্চারণটা ঠিক রাস্তার লোকের 'দাদা' বলার মত নয়, অনেকটা বিদিশার সঙ্গে নৈকট্য প্রমাণের জন্য, রেসপেক্টর-এর সুরে বলা, অর্থাৎ বিদিশার দাদা, ওরও দাদা (ও যাবাকেলে বাদ), যদি বিয়ে হয়, তবে তো তাই বলবে আমাকে, সেটা এখন থেকেই গেয়ে রাখতে চায়। হয়তো গতকাল রাত্রে এ সময়ে অন্য কোন বাড়িতে, আর কোন বিদিশার কাছে গিয়েছিল, কিংবা কে জানে, ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে কোন বেশ্যাবাড়িতেই গিয়ে বসেছিল, চেনা আছে সবাইকে, কিন্তু আমার তাতে কিছুই যায়-আসে না। যা পারে ঝেড়ে নিয়ে যাবে, তাতে আমার কী করার আছে, বিদিশার শরীরটা তো আর আমার নয়। আর বিদিশার বাবা মা-ই যখন সুযোগ দিয়েছে, যারা মরে, তারা হল, মেয়ের 'নৈতিক পাহারাদার'—তখন দাদাই বা সুযোগ দিতে পারবে না কেন।

হেসে (প্রাণের হাসি) বললাম, 'হ্যাঁ।' না ফিরলে সুবিধে হত তা জানি, কারণ অভিভাবকদের সম্ভবত সেইরকম না বলে অনুমতি দেওয়া আছে, মোটামুটি আমি রোজ যে সময়ে ফিরে থাকি, সে সময় পর্যন্তই নিচে বসে কথা বলা যাবে। আর এখন বাড়ি আসা মানে ফেরা-ই, বেজনো নয়, এবং এ ধরনের ন্যাকার মত কথা সবাই বলে থাকে, অন্তত যাতে কিছু একটা কথা বলা যায়, বিশেষ করে সেখানে, যে-লোকটা সব থেকে অপ্রয়োজনীয়, যার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, যার মুখটাও সারাদিনে একবার মনে পড়েছে কিনা সন্দেহ, যে লোকটার কথা মনের কোথাও ছিল না, (একমাত্র কোন কারণে যদি সন্দেহ

হয়ে থাকে, এই বুঝি বাড়ি আসছি ; তাহলে আজকের মত লীলাখেলা সাঙ্গ) অথচ কথা না বলেও কোন উপায় নেই, কারণ সেটা আবার বড় বেমানান লাগে। অবিশ্যি, আমার বাড়ি ফেরার একটা বাঁধাধরা সময় প্রায়ই থাকে, যদি না বিশেষ কিছু যোগাযোগ ঘটে যায়। যেমন আজ যদি নীতার সঙ্গে কোন হোটেলে যেতাম বা নীতার কাছে সারা রাত্রি থাকবার সুযোগ পেতাম তা হলে নিশ্চয়ই দেরী হত, এবং সে ক্ষেত্রে 'মাতৃদেবীর' নিশ্চয়ই টনক নড়ত, এবং সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়েই বলত, (কী জানি, নিচে গেলে মেয়েকে আবার কী অবস্থায় দেখতে হয় কে জানে, যদিও একেবারে খোলাখুলি রাজা কিছু নিশ্চয়ই সাহসে কুলোবে না, তবু হাত ধরাধরি বা চুমো খাওয়াখায়ি, তাহলেই তো মহাভারত অশুদ্ধ।) 'তুই কি নিচে রয়েছিস নাকি?'

তার মানে, 'জানি নিচে রয়েছিস, কিন্তু দেরী হচ্ছে, তোর দাদা তো এখনো এল না, এবার উঠে আয়' এই হচ্ছে মূল বক্তব্য। ভদ্রলোকদের কথা তো সব সময়েই, সেই তেতো ক্যাপসুলের ওপরে একটি পিঠে কোটিং দেবার মত করেই কথা বলতে হয়, কারণ ওটাই হচ্ছে শালীনতা, যদিও আমার ধারণা খুকু কতদূর পর্যন্ত এগোবে, এটা তার মায়ের ভাল করেই জানা আছে, আর মেয়েরা মেয়েদের খুব ভাল করেই জানে, সে মা আর মেয়েই হোক আর যা-ই হোক, ওরা দু-এক কথার ভেতর দিয়েই নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝি করে নেয়, একেবারে খোলাখুলি পষ্টাপষ্টি কিছু না বুঝিয়ে বললেও চলে দেখেছি ; তবু এই চেনাচেনিটা আছে বলেই শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস না করে উপায় নেই, কারণ জানে, ওদের কদম কদম পেছুবার রীতিটা, কখন এক সময় সব কদম পেরিয়ে এক লাফে সামনে গিয়ে পড়বে, যেহেতু একবার মনে মনে রাজী হয়ে গেলে আর রক্ষে নেই, আর পুরুষরা তো এগিয়েই আছে।

তবু আমি একবার বিদিশার মুখের দিকে তাকালাম, এবং ও ঠিকই অনুমান করল, আমি কী দেখেছি, যে কারণে মুখের একটি অতি সরল (সেই নিষ্পাপ পবিত্রতা।) ভাব করে, অন্য দিকে তাকিয়ে, আর নিশ্চয় মনে মনে আমাকে 'শয়তান' বা 'পাজি' জাতীয় কিছু বলল, কে জানে তার চেয়েও খারাপ কিছু কি না, হয়তো থুথুই দিয়ে দিল আমার মুখে। তখন লোকটা, (নামটা মনে পড়েও পড়ছে না, যাক গে।) আবার বলল, 'এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল, আপনার আসতে আবার দেরী হবে কি না।'

সত্যি? মাইরি? কেন, ওপর থেকে ডাক পড়েছিল নাকি। আমি হাত তুলে ঘড়ি দেখলাম, এগারোটা বাজতে পাঁচ, প্রায় এ সময়েই তো ফিরি, বিশ পঁচিশ মিনিট দেরী হয়েছে হয়তো। বললাম, 'খুব দেরী হয়নি তো। বসুন।'

বলতে বলতে আমি সিঁড়ির দরজার দিকে এগোলাম, এবং বসুন বলাটা ভদ্রতার মধ্যে পড়ে তৎসহ হাসি হাসি ভাবটা, যদিও 'বসুন' বলা কেন, ও দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়লেও আমার কিছু যায় আসে না, ওর অস্তিত্বের প্রায় কোন অনুভূতিই আমার নেই, তবু এরকম মিথ্যে কথাই তো সব সময় বলি। তা ছাড়া তুমি যে এখন যাবে না, বা আর একজন তোমাকে যেতে দেবে না, তাও আমি জানি, আর সেটাই তো 'ওহো, কী গভীর প্রেম। প্রাণটা 'শ্মশান' হয়ে গেল মাইরি।'

আমি বসুন বলাতেই যেন তাড়া গেলে গেল, বলল, 'না, আর বসব না অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'তবে গোল্লায় যাও শালা' মনে মনে বললেও, নেহাত একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার ভঙ্গি করে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। আমি আর বিদিশা ছাড়া এ বাড়িতে আর যে তিন টি ছেলেমেয়ে আছে, তারা এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই, কারণ এ সময়ে তারা তাই পড়ে। সবাই ভবিষ্যতের 'আমি' আর 'বিদিশা', যদিও ছেলেবেলায় অনেক কিছু মনে হয়। যেমন গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথ বা বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ, সবাই ওইরকম একটা কিছু হয়ে উঠবে, কারণ আমাদের সবাইকে ছেলেবেলায় ওইরকম একটা কিছু হয়ে ওঠবার জন্যেই তালিম দেওয়া হত, এখনো হয়, এবং আচ্ছা, সবাই যদি তাই হয়ে উঠত, গোটা দেশ জুড়ে সব ছেলেরাই যদি কোটি কোটি প্রতিভাবান, আর মেয়েরা সব সরোজিনী নাইডু বা শ্রীশ্রীমা সারদা, তাহলে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াত। দাঁড়াত বোধহয় এই, ছেলেদের আর রোজগারের কথা ভাবতে হত না, মেয়েদের আর বরের কথা ভাবতে হত না, যে জন্যে ছেলেবেলা থেকে এত তালিম, সে সবই তো তখন হাতের মুঠোয় এসে যেত। আহা, ভাব একবার গোটা ভারতবর্ষের ছবিটা, এখন যেমন কথায় কথায় বলা হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ, 'বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ', 'গান্ধীজীর ভারতবর্ষ' অর্থাৎ অনেকটা আক্ষেপ করেই যেন বলা হয়ে থাকে, নতুন ভারতবর্ষ যাদের হাতে

তৈরী হয়ে উঠেছে, সেই ভারতবর্ষের এ হেন দুর্দশা, (দুর্দশা কোথায়, বেশ তো চলেছে বাবা ! এফিসিয়েন্ট মন্ত্রিসভার ভারতবর্ষ, ফিল্ম স্টারদের ভারতবর্ষ, ডেমোক্রাটিক জনতার ভারতবর্ষ, 'ডেমোক্রাটিক'—ইয়াকি নয়, বেশী এদিক-ওদিক করলে এমন মুভমেন্ট করব, পার্লামেন্ট কাঁপিয়ে দেব, অ্যাসেম্বলি ঝুলিয়ে দেব, আমাদের স.সব অধিকার আছে।) তখন সেই ভারতবর্ষের ঘরে-বাইরে রাস্তা-ঘাটে হোটেল-রেস্তোরাঁয় পান-সিগারেটের দোকানে, সর্বত্র প্রতিভাবান মনীষা ও বিদুষীতে গিজগিজ করছে। আচ্ছা, তখন আবার দলাদলি মারামারি হত না তো ? যারা রবীন্দ্রনাথ, তারা বলল, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ। যারা গান্ধী, তারা বলল, না, গান্ধীজীর ভারতবর্ষ ! হুম্, এতক্ষণে নতুন করে পেটের দুর্বাগুণ চাগিয়ে উঠল কিনা কে জানে, নইলে এসব মাথায় আসছে কেন, বেশ তো আছে ভারতবর্ষ, বেশ তো আছি বাবা, এখন না হয় ভারতবর্ষটা আমাদেরই, মোট কথা আমার ভাইবোনেরাও ঠিকই আছে, ড্রেন পাইপ প্যান্ট, কচি ঠোঁটে সিগারেট, কাঁচা শরীরে আট-খাটো ছোট ফ্রক, টুইস্ট এবং ভবিষ্যতের দিলদরিয়া স্বপ্ন, বিলকুল ঠিক আছে। ঘরের মালকড়িটি নিয়ে এস, রবি দত্ত আঁচলে চাবির গোছা বাঁধা থাকুক, যাতে পেনের দরজা খোলা যায়, ঠিক কামাল করে দেব। তা ছাড়া ভাইবোনদের আমি কতটুকুই বা চিনি, কতক্ষণই বা দেখতে পাই, ওদের সঙ্গে আমার কতটুকুই বা পরিচয়, ওরাই বা আমাকে কতটুকু চেনে ? কারণ ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কী, তার চেয়ে চোখ বুজলে অফিসের বস্, ঘুষ দেওয়ার পার্টি এবং বার-এর বেয়ারা এবং মেয়েদের মুখ আমার অনেক আগে মনে পড়ে। ওরা ওদের নিয়ে আছে, আমি আমাকে নিয়ে আছি, আমরা কেউ কাউকে চিনি না, কারণ ওরাও চোখ বুজলে অন্য কিছু দেখতে পায়। আমি সেখানে কোথাও নেই, থাকলে যে অনেক ঝামেলা হত, কোন সন্দেহ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, প্রথম ঘরটাই বলতে গেলে আমার, আমার একার থাকবার জন্যে, এবং প্রথম ঘরটাই আমার জন্যে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, যতটা সম্ভব বাইরের দিকে আমাকে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী, কারণ আমি কখন ফিরব না-ফিরব তার কোন ঠিক-ঠিকানা প্রায়ই থাকে না। পারিবারিক নানান ব্যাপার (কী ব্যাপার আমি অত সব

জানি না।) আমার গোচরে আনাটাও তাদের অভিপ্রেত নয় এবং আমার নিজের দিক থেকেও সেটাই বাঞ্ছনীয়, ওড়ের কৌটায় মাছির মত, (পারিবারিক জীবন।) নিজেদের বেশ সব কিছু নিয়ে মাখামাখি করে থাকতে আমার ঘেন্না করে। মোট ঘর খান চারেক, রান্নাঘর আর খাবারঘর ছাড়া, সম্ভবত এ হিসেবটা আমার ভুল হচ্ছে না, যদিও জোর করে আমি তাও বলতে পারি না, কারণ আমার আঠার বছর বয়সে এ বাড়িতে আসা হয়েছে, যখন থেকে আমি নিজেকে নিয়ে এত বেসামাল যে, আরো দু-একটা ঘর আমার অগোচরে থেকে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সব থেকে শ্রেষ্ঠ ঘর, যেটার আলো-বাতাস বেশী আছে, যেটা সব থেকে বড়, সেইটি বাড়ির কর্তার জন্যে নির্দিষ্ট আছে। কর্তার জন্যে নির্দিষ্ট মানেই কর্ত্রীর জন্যেও বটে। আর সেটাই তো নিয়ম, বস্-এরা বরাবরই সব কিছুর ভালটা ভোগ করবে, তা সে বাবাই হোক আর যে-ই হোক। বাদবাকীগুলোতে তাদের 'সন্তান-সন্ততিরা' থাকে যাদের তারা প্রচুর টাকা রোজগার ও খ্যাতিমান হবার এবং শাঁসালো বর পাকড়াবার জন্যে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে মানুষ করছে।

আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম, হুম্—চোখগুলো সত্যি লাল হয়ে উঠেছে এবং ছোট দেখাচ্ছে, এবং দুঃখটা, নাঃ খারাপ নয় তেমন, এখন অনেকটা কী যেন নাম সেই তারকাটির, হলিউডেরই হবে বোধহয়, নামটা মনে করতে পারছি না, তার মত দেখাচ্ছে। চোখ টিপে নিজেকে একবার ইশারা করলাম, কোটটা খুলে ওয়ারড্রবের মধ্যে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিলাম। তারপরে (নিচে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল, ওঃ বিরহ দিয়ে গেল...) সার্টটা টেনে তুলতেই নিচের ছেঁড়া অংশ বেরিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে নীতার কথা মনে পড়ে গেল। আমি ছেঁড়া জায়গাটা তুলে দেখলাম, হ্যাঁ ঠিকই, নীতার নখের রং লেগে আছে এবং আমার মনে পড়ে গেল, পেটের কাছে নীতা খামচে ধরেছিল, মনে পড়তেই, দুটো বোতাম খুলে প্যান্ট নামিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে দেখলাম, শুধু ধরেনি, অস্পষ্ট নখের দাগ পড়ে গিয়েছে এবং একটু ব্যথাও হয়েছে। হাত দিয়ে অনুভব করে দেখলাম, চামড়ার ওপরটা একটু ফুলে ফুলেও উঠেছে, নখ দিয়ে আঁচড়ালে যে রকম হয়, আর নখ দিয়ে আঁচড়াবার

সময় হয়তো এমনও হতে পারে যে, টেরিলিনের এক-আধটা সুতোর কুঁচি ওর নখে লেগে রয়েছে, কারণ ওর নখগুলো ছোট ছিল না, সুন্দর করবার জন্যে বেশ বড় বড়ই রাখত, (যত সুন্দর তত ধারালো, যাতে মাংস অবধি তুলে নেওয়া যায়, সৌন্দর্যের তত্ত্বটা সেরকম কি না, আমি জানি না।) অতএব পুলিসের চোখে যদি সেটা ধরা পড়ে, পড়বেই, যদি থেকে থাকে, তাহলে ধরেই নেবে, যে মেরেছে তার গায় টেরেলিনের জামা ছিল বা শাড়ি। অবিশ্যি টেরেলিনের শাড়ি থেকে সার্টের কথাটাই আগে ভাববে এবং এই সার্টটা যদি আমার কাছেই থাকে, অসম্ভব নয়, হয়তো আমার এই ঘরটাও সার্চ করতে আসতে পারে। তাহলে নির্ঘাত ধরা পড়তে হবে। তৎক্ষণাৎ সার্টটা খুলে আমি দলা পাকিয়ে ফেললাম, বিছানার তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। পরে, অর্থাৎ আজ রাত্রেই যাতে এটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে পারি, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। জানিস, এসব কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই বকে। খুন, খুনের এত ঝামেলা, তবু খুনীরা, যারা খুন করলে ভেবে করে, তারা এত কাচাং পোড়ার কী করে! কিন্তু কী করা যাবে, আমি তো আর ভেবে এসব কিছু করিনি, অথচ এসব আমার মনে পড়ছে, যেন অনেকটা দৌড়ে বাসে উঠে, ভিড়ের মধ্যে একটা লোকের পা মাড়িয়ে দেবার মত, অনিচ্ছাবশত, তবু যেন অপরাধ করে ফেলেছি এবং তার জন্যে তাড়াতাড়ি নিজেকে সাবধান করে নেওয়া, আর যাকে অপরাধটা (এটা অপরাধ কি না জানি না, ভিড় হলে পা মাড়িয়ে তো যাবেই, আমারাও যেতে পারব, যেমন নীতা আমাকে মেরে ফেললেও বলার কিছু ছিল না।) গোপন করা যায়, তার জন্য খুবই কায়দা-কানুন করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, যাক মিটে গেল। সেইভাবেই সব মিটিয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে অবিশ্যি ওরকম ক্ষমা চেয়ে নয়, অন্যভাবে সবই গোপন করে ফেলতে হবে।

প্যান্ট সার্ট সব খুলে ফেলে একবার আড়মোড়া ভাঙবার জন্যে গোটা শরীরটাকেই আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে আয়নায় নিজেকে আর একবার দেখলাম, আর সেই মুহূর্তেই আমার গাটা ঘুলিয়ে উঠল। কিন্তু ঘুলিয়ে ওঠবার তো কিছু নেই, কারণ দেশাই জমেনি, অতএব মদ খেয়ে বমি করার মত অবস্থা আমার হয়নি। তবু গা ঘুলিয়ে উঠল শুধু নয়, মাথাটা বোঁ করে যেন একবার পাক খেয়ে গেল, সেটা প্রায়ই অবিশ্যি হয়, সেটা প্রেশার না উইও, সঠিক জানি না, কিন্তু

এখন এরকম হবে কেন। এমন নয় যে, একেবারে খালি পেটে আছি। নীতার রাত্রের খাবার মাংসের কিছু পরিমাণ তো আমার পেটেই ঢুকেছে, তবু, হ্যাঁ, মুখে যেন খানিকটা জল জমেই কাটছে। আমি গলার একটা হাত, আর পেটে আর একটা হাত রেখে স্থির হয়ে একটু দাঁড়ালাম। আশ্চর্য, আমার শীতও করছে না। একটু সামলে নেবার জন্যেই যেন অনেকটা চুপি-চুপি, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং ঢোঁক গিলে গিলে জলকাটা ভাবটা সামলে নিতে লাগলাম, আর আস্তে আস্তে মনে হল, আবার সব ঠিক হয়ে আসছে। জানি না, কুঁচো কৃমির দৌরাত্মটা আবার বেড়েছে কি না, যেগুলো আমার পেটে প্রায় মৌরসী-পাট্টাই গেড়েছে, সময়মত ঠিক নাগাড় দিয়ে ওঠে। অথচ তবু আয়নার সামনে নিজেকে আমার মন্দ লাগল না দেখতে। আস্তে আস্তে সরে গিয়ে পায়জামাটা বের করে নিয়ে, যেন পড়ে যাবে, এমনিভাবে, যাকে বলে খুব সাবধানে পায়ের মধ্য দিয়ে গলিয়ে পরলাম, একটা জামাও চাপালাম। আসলে শরীরটা বেশী নড়াচড়া পছন্দ করছে না বোধহয়, একটু চুপচাপ থাকতে চাইছে। যদিচ বাথরুমে আমাকে একবার যেতেই হবে, কারণ ঘাড়ে মাথায় একটু জল না দিলে চলবে মনে হচ্ছে, আর সেরকম বুঝলে, গলায় আঙুল দিয়ে, পেটটাকে খালি করে ফেলতে হবে। কি জানি বলা যায় না, বার-এ মালের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল কি না, কিংবা করপোরেশনের জলের মধ্যে কিছু ছিল।

এখন আমি সাবধান হয়ে গিয়েছি, আর তাড়াতাড়ি নয়, আস্তে আস্তে এগিয়ে দরজা খুললাম, আর খুলেই দেখলাম শ্রীমতি অনসূয়া দেবী দাঁড়িয়ে। যাঁর একমাত্র দাবী হল তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। ভগবান জানে মাইরি, বিয়ের দাবী এবং কে সেই দিব্যি দিয়েছিল, আমি তাবা-তুলসী নিয়ে হলপ করে বলতে পারি, আমি এর কিছুই জানতাম না। দেখলেই বোঝা যায়, অনসূয়া দেবী ক্লান্ত, বড় বড় চোখে ব্যথার ছায়া, একটু বা বিরক্তি, তারপরে জানি না সেখানে কোন উদ্বেগের ছাপও আছে কি না। আপাতদৃষ্টিতে যে শান্ত 'মাতৃমূর্তি' দেখা যাচ্ছে, জানি, তার মধ্যে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ ইত্যাদি সব চাপা পড়ে রয়েছে, যেগুলো ব্যক্ত করার ইচ্ছে থাকলেও জানে, সময় বা সুযোগ নেই। বা সময় সুযোগ থাকলেও আর একজনের তা গ্রাহ্য করবার মত অবস্থা নয়।

অনসূয়া দেবী এগিয়ে এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ডক্টর বাগচিকে ফোন করেছিলি? কী বললেন?'

সত্যি বলতে কি, কথাটা শুনলাম, তাই এখন আমার মনে পড়ল যে, আজ ডক্টর বাগচিকে অনসূয়া দেবীর স্বামী সম্পর্কে একটি খবর দেবার ছিল ও ওষুধ বদলানো হবে কি না এই সংবাদটাও নেবার ছিল, অথচ কথাটা আমার একবারের জন্যেও মনে পড়েনি এবং কোনদিনই মনে পড়ে না, এটা জেনেও বারে-বারেই কেন যে এসব দায়িত্ব দেওয়া হয়, আমি বুঝতে পারি না। যেন, 'তুমি ভুলেই যাও, আর যা-ই কর, তোমার মনে থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে আমরা এ বিষয়ে সব সময়েই বলে যাব, কারণ এটা তোমার কর্তব্য, এবং কর্তব্য থেকে তোমার বিচ্যুতি যাতে না ঘটে, সেটাই আমাদের দেখা উচিত, 'অতএব'—অতএব আমার যা মুখে এল তাই বললাম; হ্যাঁ, খবর দেবার তো কথা ছিল, কিন্তু অফিসে গিয়েই দেখি, ইমিডিয়েটলি বাইরে একটা কাজের জন্যে যাবার অর্ডার রয়েছে, চোরের পর্যন্ত বসতে পাইনি, এমন তাড়াহুড়োর ব্যাপার যে, তারপরে আর মনেই ছিল না।'

অবিশ্যি এটা সত্যি কথাই যে, কথাটা এখন নিছক মিথ্যে বলেও, ওরকম আমাকে মাঝে মধ্যে যেতে হয়, কারণ আমার চাকরিটাই সেরকম, প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী যে কোন জেলাতেই চলে যেতে হতে পারে। অবিশ্যি বেশী দূরে গেলে হয়তো কিছু সময়ের নোটিস পাওয়া যায়, কিন্তু কলকাতার মধ্যে বা চব্বিশ পরগণা বা হুগলি, বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে হলে, সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেতে হতে পারে, তাই মিথ্যে বললেও সত্যের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ আছে যাতে আমার মায়ের পক্ষে তার প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়। প্রতিবাদই বলতে হয়, কারণ আমি জানি, এ ধরনের বাজে কথা অকপটে আমি এত বলেছি, এবং সেগুলো সবই মিথ্যে তা মায়ের পক্ষে একেবারেই না বোঝার কোন কারণ নেই, যদিচ বুঝেও প্রতিবাদ করার উপায় নেই যেহেতু উভয় পক্ষই জানে, তাতে ব্যাপারটা খুব সুবিধের হবে না, অতএব মা মনে মনে ভাবেন, 'হারামজাদা, তবু তোকে ছাড়ব না তোকে দিয়ে আমি এসব কাজ করাবই, কারণ ছেলে হিসেবে তুমি বাধ্য, সংসারের সবকিছু দেখাশুনা করার,' আর ছেলে ভাবে, 'তোমার স্বামী শাহেনসা ঘরে বসে বসে দশ রকম ব্যাধিতে ভুগবেন, আর

আমাকে রোজ রোজ ডাক্তারের কাছে 'জ্যেষ্ঠ পুত্রের' কর্তব্য করতে যেতে হবে, সে গুড়ে বালি।' যদিচ আপাতত মা ও ছেলেকে দেখে, পরস্পরকে কিছুই বোঝা যাবে না, দুজনের মাঝখানে 'জন্মগ্রহণ বা জন্মদান করার সূত্র ধরে যে সব দাবীদাওয়াগুলো জন্মায়, সে সবের কোন কিছুই নেই, কারণ তার কোন যুক্তি নেই (আমার তাই বিশ্বাস।) এবং 'মাতা ও পুত্র' এমনি কতগুলো চলতি নিয়মের নিষ্প্রাণ চলন্ত ছবির (তার মানে কি, বায়স্কোপের ছবি?) মতই আমরা চলেছি, অথচ সত্যি বলতে কি, তৎসত্ত্বেও যে ছাড়াছাড়ি হয় না, তার কারণ, উভয় পক্ষেরই কিছু লেনদেনের ব্যাপার আছে, আর সবটাই মিথ্যে ও শূন্য, এই আমার ধারণা, যদিচ এ ধারণা মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু আসল কথা হল এই যে, মায়ের দিকে কোন সত্য-টত্য আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার কাছে সবই মিথ্যে, আমি কিছুই অনুভব করি না।

এর পরেই আমি জানি, মা বাবার কথা বলবে, এবং আমার আচরণের ত্রুটি-গুলোর কথা এমন একটা অহিংস বেদনান্বিত স্বরে বলবে, যেটাকে একরকমের ছলনা বলেই আমার মনে হয়, কারণ ওভাবে বললে যদি ছেলের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' হয় (হৃদয় বহুকাল পাথর হয়ে গেছে মা, ওটিকে আর গলাতে হচ্ছে না।) যার অর্থ হল, নিজেদের প্রয়োজনে লাগানো যায়, উপকার দিলেই 'হৃদয়ের পরিবর্তন' বলে গণ্য করা যাবে কি না। এবং মা বললও তাই, 'উনি আজ ক'দিন ধরে তো ঘর থেকেই প্রায় বেরুতে পারছেন না, সকালবেলা বেরিয়ে যাস, রাত্রে ফিরিস, ফিরেও তো একটু যেতে পারিস। শত হলেও বাপ তো।'

সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, মা যখন বলছে যে, শত হলেও উনি আমার বাপ, এবং এটা কখনো বুঝতে পারি না, উনি জন্মদাতা হয়েছেন বলেই আমার কাছে এই সব দাবিদাওয়াগুলো কেন। এখন, নিচে বিদিশার সঙ্গে ওই লোকটার যদি কিছু হয়ে যায়, ভাল কথায়, 'দৈহিক মিলন' বলতে হবে বোধ হয়, সান্ত্বনা হিসেবে খুবই অসুবিধাজনক যদিও, তাই দু-তিন মিনিটের মধ্যেই প্রেমের এক হাত পরাকাষ্ঠা দেখে দিতে হবে, এবং তাতে যদি একজন দশ মাস দশ দিন পরে পৃথিবীতে এসে পড়ে, যার বিষয়ে কোন চিন্তা মূর্তি, ছবি, আচার আচরণ, কোন কিছুর চিহ্ন দূরে থাক, নিতান্ত সুখের উন্মাদনাতেই মশগুল, তারপরে ভবিষ্যতে তার কাছে 'জন্মদাতা' বলে গোঁফ মোচড়ানো,

দাবিদাওয়াগুলোর মানে কী। যে এল, আসার জন্যে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা, দায়দায়িত্ব কিছুই নেই, এবং যে মুহূর্তে এল, সেই মুহূর্তেই ওর গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখ, ওরই লাগবে, ও-ই চেঁচাবে, তোমার গায়ে কোথাও লাগবে না (লে হালুয়া!), এটা কী রকম একটা অবিচার বলে বোধ হচ্ছে না? তোমরা যা খুশি তাই কর গে, কিন্তু আমি কেন এলাম, এ কৈফিয়তটা আমাকে কেউ দেবে না, একটা কুকুরের বাচ্চাকেও কেউ দেয় না, সে চায়ও না, কেননা, তার কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাবনা চিন্তা নেই, কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারে না, অথচ আমার আবার সে সব আছে, অতএব এ চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকে উঠলেই, তখন অত্যন্ত অসহায়ভাবে নিজেকে একটা ইচ্ছেওয়ালা কুকুরের বাচ্চা বলে মনে হয়, একটা, কী বলব, দুঃসহই বলতে হবে, একটা দুঃসহ ঘৃণা উথলে উঠতে থাকে, উথলে উঠতে থাকে এই কারণেই যে, আমার ইচ্ছেগুলো আমার ইচ্ছায় পূর্ণ হবার নয়, কতগুলো নিয়ম কানুনের মারফত আমাকে চলতে হয়, যে নিয়ম-কানুনগুলোর সঙ্গে আমার ইচ্ছার কোন মিলই নেই অথচ যেহেতু আমার ইচ্ছা-গুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে চলা একেবারেই সম্ভব নয়, সেই হেতু আমি একটা মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছি, এবং নিয়মকানুনগুলোকে কাঁচকলা দেখাচ্ছি, যেমন সবাই দেখাচ্ছে। আর ইচ্ছেগুলো ভীরু কুকুরের বাচ্চার মতই ভেতরে ঘেঁউ ঘেঁউ করে মরছে, কারণ ইচ্ছে মানেই তো সে স্বাধীন, অথচ সেই স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে আচরণ করব সে সাহস নেই, স্বাধীনতাকে সকলের মত আমিও বেজায় ভয় পাই। আমি আমার গর্তের মধ্যে বেশ রসেবশেই আছি। সকলেই গর্তের মধ্যে আছে, আমার বাবাও তার নিজের গর্তের মধ্যে বেশ ভালই আছেন, মরবার ভয় নিয়ে, আত্মসুখের জন্যে চিরজীবন 'সংগ্রাম' করে, যেখানে পাপ-পুণ্যের কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না, অর্থাৎ সেই চলতি 'নিয়মকানুন' বা 'নিয়ন্ত্রণই' বলা যায়—সবগুলোকে কাঁচকলা দেখিয়ে, অথচ গায়ে আঁচড়ও লাগেনি (শাহেনসা লোক!) উপযুক্ত লোকদের লাগেও না, যে কারণে আমাকে শুধু চাকরির অন্ধিসন্ধি অলিগলিই নিজে দেখিয়ে দেননি, চলাফেরাটাও একটু চোখ কান মেলে যাতে হয় চুপিচুপি গলায় সেটা সাবধান করতেও ভোলেননি, অর্থাৎ চাকরির মধ্যে ঘুষ বদমাইসি ফেরেববাজীর নানান রাস্তায় আমি যেন একটা পাকা ধূর্ত শেয়ালের মত চলতে পারি, গোঁফের ডগারও যেন একটু রক্ত

লেগে না থাকে। বাপ তো শত হলেও, ছেলের এটুকু উপকার না করলে চলবে কেন, কেবল ভদ্রলোকের গর্তের মধ্যে ওই একটা দোষ নিয়মকানুনের দোহাই দিয়ে বাপের দাবিদাওয়াগুলো পেশ না করে পারেন না। কারণ তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবী করেন, কারণ সেই একই যে, তার দাবি তিনি আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন, যে-পৃথিবীতে আমি বাস করছি, (ওহো, কী অপূর্ব জায়গা, আমার গোটা জীবনটাই আজ এই সময় পর্যন্তই তার প্রমাণ।) এবং যদি এখন জিজ্ঞেস করি, 'বেশ করেছেন, কিন্তু কেন?' তা হলেই রাগের চোটে কথা বন্ধ হয়ে যাবে, কিংবা চীৎকার করেই উঠবেন, 'ইট ডেভিল, ইট ডেয়ার টু আস্ক...' অথবা এর থেকেও খারাপ কিছু, 'বেরিয়ে যা শূয়ারের বাচ্চা আমার সামনে থেকে' এবং তা গেলেই আমার যাওয়া হয় না, আমি যে এসে পড়েছি। আর এই সব দাবিদাওয়ার পেছনে যে নৈতিক যুক্তিগুলো আছে সেগুলো তিনি আমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন, অর্থাৎ ছোটবেলায় বাঁচিয়ে রেখেছেন, ওঁর নিজের ইচ্ছামত জামাকাপড় পরা, খাবার, শিক্ষা সবকিছু দিয়ে, সেটাও নিজের ইচ্ছা এবং বাসনা চরিতার্থ করার জন্যেই, যতদিন আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা-গুলো জেগে ওঠেনি। হ্যাঁ, বলা যায়, মেরে ফেলেননি কেন, হয়তো ফেলতেন, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন, তাই রেখেছেন, তখন যদি জানতেন, আমি ঠিক আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস হব না তাহলে কে জানে, আপনার খুন করবার সাহস হয়তো হত, কিন্তু আর সকলের মত আপনি ইচ্ছা চরিতার্থ করতেই বেশী মনোযোগী হয়েছিলেন, কারণ এই ব্যাপারে পশুরাও আপনার মতই করে থাকে, কারণ, সত্যি বলতে কি, রোজকার যত রকম প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতই, ওটা নিজের তাগিদেই করেছেন। যেমন কার্যকারণ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, রাস্তার কুকুর তার বাচ্চাগুলোকে চাটে, আর মুখে নিয়ে আশ্রয়ে ঢোকায়, কারণ ওটা প্রবৃত্তি, খিদে পেলে খাবার মতই। যদি না পারতেন, তাহলে এ দেশের হাজার হাজার বাচ্চার মত আমিও কুকুরের বাচ্চার মত রাস্তার রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতাম, অকালেই পটল তুলতাম, অনাথ আশ্রমে জায়গা হত, কিংবা অভাবের তাড়নায় বা আপনার বদমেজাজের একটি ধাক্কাতেই 'মানবলীলা সংবরণ' করতে হত। মোট কথা, ওই দাবিদাওয়াগুলোর কোন ভিত্তি নেই, এখন আমি যখন নিজের অনিচ্ছায় এই পৃথিবীতে উপস্থিত, তখন আমার ইচ্ছাই

আমাকে চালাবে, যদিচ যেই ইচ্ছার স্বাধীনতাকে প্রকাশ করতে ভয় পাই বলে আমি একটা গর্তে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি এবং বেশ মিথ্যে কথা বলে সকলের সঙ্গেই দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমরা তো জানি, আমরা কেউ সত্যি কথা বলি না, সত্যি আচরণ করি না, তাই প্রত্যেকেই একটা করে গর্ত বেছে নিয়েছি, আর পরাধীনতার সুখে 'নেশ্' আছি।

তবু সত্যি বলতে কি, গর্তের সুখ, পরাধীনতা যাকে বলে, তাকে মাঝে মাঝে 'স্বাধীনতা' এমন তেড়ে আসে যে, গর্তের সুখটুকু যায়-যায় হায়-হায় করে ওঠে, যেমন কি না একজন পকেটমারকে ধরে সবাই মিলে যখন রক্তাক্ত করে, আর আমি তার প্রতিবাদ করি, কারণ ওতে পকেটমার-অপরাধের সুরাহা হবে না, ওটা আইনও নয়, অক্ষম ক্রোধের, কী বলব, 'জিঘাংসা' মাত্র, তা হলে আমাকেও রক্তাক্ত করে ছেড়ে দেবে। কারণ আমি স্বাধীন ভাবে সত্যি বলে ফেলেছি। আইনের হাতে ছেড়ে দিতে বলেছি। কিন্তু এই স্বাধীনতার বদলে, আমিও যদি সকলে যা করে, সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকটাকে ঠ্যাঙাতাম, কিংবা চুপ করে দেখতাম আর বেশ গর্তের, সুখের নির্ঝঞ্ঝাট গর্তের ভিতর থেকে উপভোগ করতাম, সেটাকেই আমি পরাধীনতা বলতে চাইছি। অর্থাৎ, যা অন্যায় অবিচার ভুল আর মিথ্যা, যা আমাদের জীবনের চারপাশে শিকড় গেড়ে বসে আছে, যে কোন দিকে চোখ তুলে তাকালেই তা দেখা যায়, এসব মেনে নিয়ে থাকাটাই গর্তের সুখে থাকা। পরাধীনতা যাকে বলে, আর এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আমাকে ঠেলে দিতে চায়, যাকে আমি বলতে চাই, তেড়ে আসে। এবং এই তেড়ে আসাটা নিজেই অনেক সময় জানতে পারি না, যে কারণে বলতে হয়, নিজেকেই বোধ হয় ঠিক চিনি না, জানি না, যেমন ধরা যাক, আমার পরাধীনতা এবং গর্তের সুখের মধ্যে, প্রায়—কী বলব—প্রায় 'মধ্যমণির' মতই তো নীতা ছিল, যাকে বলে, গর্তের সুখের মধ্যমণি, স্বাধীনতাই তাকে হঠাৎ মেরে ফেলল। দিব্যি দুজনে মিথ্যে বলে, মিথ্যে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম, সেটাকে বোধ হয় আপোষ বা, কী জানি, একেই অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে কি না, এই সব করে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম, তুমোও যা, আমুও তাই, এই রকম চিন্তা করেই, বেশ মানিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপোষহীন স্বাধীনতা, যাকে বলে একেবারে আচমকা কনুয়ে ভর করে বসল, নীতার

গলার চেপে বসল, যার মানে, আমি আমার গর্তের বাইরে চলে এসেছিলাম। কেননা, ও নীতা, ওর সঙ্গে এত ছলনা, মিথ্যা, উভয় পক্ষেই, ঠিক সহ্য করা যাচ্ছিল না, যে কারণে পরাধীনতার আপস সইল না। জীবনে আর কখনো এরকম গর্তের বাইরে আসিনি, যে কারণে এখন তাড়াতাড়ি ভেতরে আবার লুকোবার তালে আছি, ঢোক্ ঢোক্, (শালা) পালা পালা জলদি, এইভাবে বলছি আর খুনের সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করার কথা ভাবতে হচ্ছে। জানি না একবার বাইরে বেরিয়ে পড়লে আর ভিতরে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সত্যি, স্বাধীনতা একদিক থেকে অতি কুৎসিত, যদিও নীতা মরার পর, সেই যে কী বলে, একটা 'প্রশান্তি' না কি, একটা 'অগাধ শান্তি' বোধ করছি।

কিন্তু যাই হোক, আমি এখন গর্তে, এবং গর্তের ভেতর থেকেই, আপাতত অনসূয়া দেবীকে, গর্তের ভাষাতেই বললাম, 'আজ রাত্রে আর দেখা করব না, কাল অফিসে বেরোবার আগে একবার যাব।'

যাব না জানি, কারণ আমি যখন যাব মনে করব, তার আগেই জীপের হর্ন শোনা যাবে, তখন আমাকে ছুটেই বেরিয়ে যেতে হবে, আর এখন একটা মুখের ভাব করলাম যেন, মদ-টদ খেয়ে এসেছি, এ অবস্থায় আর পিতৃদেবের কাছে আমাকে যেতে বলো না। দেখলাম অনসূয়া দেবীর কাছে সেটা কাজে লাগল, আসলে যাওয়াটাই তো বড় কথা নয়, যাবার ইচ্ছে আছে, সেটাই বড় কথা, অর্থাৎ 'হাতে আছি' এই জাতীয় একটা সান্ত্বনা এবং সেই সঙ্গেই এখন না যেতে চাওয়ার 'সুমতি'ও একটা মস্তবড় কথা। শালুক চিনেছে……। মা সরে গেল, আমি সোজা বাথরুমের দিকে গেলাম, এবং বাথরুমে ঢুকেই উৎকট দুর্গন্ধে আমার গা-ঘুলনো শরীর আরো ঘুলিয়ে উঠল, যার কারণটাও আমার জানা যে জগদীশনাথ (পিতৃদেব) বাথরুমে এসেছিলেন, এ দুর্গন্ধের বৈশিষ্ট্যটা তাঁরই, অথচ জল ঢেলে দিয়ে যাননি, পারতেন কি না জানি না, পারলে তিনি দেবেন না, তিনি কর্তা, 'কেন তোমরা ঢেলে দিতে পার না' যেন এমনি একটা ভাব, অথচ অপারগ হলেও কাউকে বলতে দোষ কী, বা না এলেই বা ক্ষতি কী, ভাবতে ভাবতেই, এ পুরনো ঘটনার, আমি খেঁজে চীৎকার করে উঠলাম, 'বাথরুমে কে এসেছিল, কে?'

এত জোরে চীৎকার করলাম যে, বিদিশা সবে নিচে থেকে ওপরে আসছিল,

ও ছুটে এল, আর চাকরটা কোথায় ছিল জানি না, সে আরো আগে ছুটে এল, এবং বলল, 'বাবা এসেছিলেন।'

রাগে এবং ঘৃণায় একই মুহূর্তে একটা অস্বস্তি বোধে, আমি আগের মতই চীৎকার করে উঠলাম, 'এসেছিলেন তো জল ঢেলে দিতে কী হয়েছিল, দুর্গাকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার যোগাড়। বেডপ্যান আছে কী করতে?'

ইতিমধ্যে চাকরটা বালতি বালতি জল ঢালতে আরম্ভ করেছে এবং বিদিশা (শেষ চুমোর আবেশটা বোধ হয় মাটিই হয়ে গেল, মনে মনে নিশ্চয় ছোটলোক ইতর ইত্যাদি বলে গালাগালিও দিচ্ছে আমাকে।) আমার দিকে একবার তাকিয়ে যেন চুপ করতে বলতে চাইল আমাকে এবং যেন আমার ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছে, বিরক্তি হয়েছে, এরকম একটা ভাব করে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। গোটা বাড়িটা যেন ভূতের বাড়ির মত একেবারে নিশ্চুপ কী বলব, যেন দম বন্ধ করে রয়েছে মনে হল, কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। চাকরটা বেরিয়ে যেতেই দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম এবং পিতৃদেবের মুখখানি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, বিছানায় শোয়া গম্ভীর থমথমে মুখ, (আসলে এখন খুনীর চেয়েও ভীষণ হয়ে উঠেছেন মনে মনে, বোধ হয় এই মুহূর্তেই কেউ আমার কাটামুণ্ডুটা নিয়ে যেতে পারলে তাকে পুরস্কার দিয়ে দিতে পারেন, 'আলাউদ্দীনের কাছে খিজিরের কাটামুণ্ডু!') মনে মনে যা বলছেন বুঝতেই পারছি। চোখ দিয়ে যদি রাগের চোটে জলও বেরিয়ে পড়ে, তা হলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, আর মায়ের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ, যদিও বাবার মত ঠিক অতটা ভয়ংকর না, তা হলে উপায় থাকলে সামনে এসে আমাকে একটু ধমক ধামক করতে পারলে ভাল হত। চাকরটার ওপর দিয়েই মায়ের রাগ যাবে এবং একটু অনুশোচনাও বটে, যদি জানা থাকত, স্বামী গিয়েছিলেন বাথরুমে তা হলে নিজেই একটা ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু আমার বারোটা বেজে গিয়েছে, কারণ আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম এই জন্যে যে, চীৎকার করার পরেই ইলেকট্রিকের তারে ঘা মারলে যে রকম ঝন্‌ন্‌ন্ এক-টানা শব্দ হয় খানিকক্ষণ ধরে, সেই রকম শব্দ হচ্ছিল আমার শরীরের ডান দিকটা জুড়ে, যদিও শব্দটা বাইরে ভেসে আসছিল না ঠিকই, কিন্তু ভেতরে যেন অবিকল সেরকমই ঝন্‌ন্‌ন্ করে বাজছিল, যাতে আমি যন্ত্রণা বোধ না করলেও

একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কারণ শব্দটা মাথা অবধি গিয়ে পৌঁছুচ্ছিল যেন। এটা আবার কী রকম ব্যাপার বুঝতে পারলাম না, এরকম আর কখনো হয়নি, যেন আমি হঠাৎ পড়ে যেতে পারি, তাই দরজাটা ধরেই আমি দাঁড়িয়ে-ছিলাম, এবং মুখে আবার সেরকম জল কাটতে আরম্ভ করেছিল, যার অর্থ বমি নিশ্চিত। অথচ, এমন কি মদ খেয়েছি, মাতাল তো একেবারেই হইনি, এর থেকে অনেক বেশি খেয়ে থাকি, যদিও এর থেকে কম খেয়েও এক-একদিন শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, যদি পেট ভাল না থাকে এবং এখনো নেই, বোঝা গিয়েছিল নীতার বাথরুমে যখন একটা সারতে গিয়ে আর একটা বেগ দাঁতে দাঁত পিষে চাপতে হয়েছিল।

প্রায় দু' মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পর, বেসিনটার কাছে না গিয়ে আস্তে আস্তে নিচের নর্দমার মুখের কাছে গিয়ে বসে, মাথাটা নিচু করতেই টক জলের সঙ্গে মেশানো মদের মত তরল পদার্থ বেরিয়ে এল, অনেকটা তাড়ির মত বমিটার স্বাদ। তাড়ির স্বাদ আমি অনেকবারই জেনেছি, একবার তো বীরভূমের এক জায়গায় অফিস থেকে একটা ইনভেস্টিগেশনে (আমার চাকরির মধ্যেও আবার তদন্ত-টদন্তর ব্যাপার আছে, অনেকটা পুলিসের মতই বলতে গেলে, যদিও পুলিস নয়, তবে মানুষের শাস্তির ব্যবস্থা তাতেও আছে এবং তা শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাত দিয়েই হয়ে থাকে, বা অন্যভাবেও হতে পারে।) গিয়ে, তিন দিন ধরে শুধু তাড়িই খেতে হয়েছিল, অবিশ্যি যথাপূর্বং তদন্তে শেষ পর্যন্ত একটা ঘুষের রফা করে যখন ফিরে আসি, তখন কয়েক বোতল মদ এসে জুটেছিল। যাই হোক, এখন বমির সঙ্গে নীতার মাংসও বেরিয়ে এল, অনেকটা হাল্কা আর সুস্থ বোধ করতে লাগলাম, যদিও কানের পাশ জ্বালা করছে। জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়ালাম, কেননা নীতার বাথরুমের সেই বেগটা আমাকে এখানে ছেড়ে যায়নি, একটা অস্বস্তি হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত পায়জামাটা আমাকে খুলতেই হল। প্যান-এর ওপরে বসতে না বসতেই জলতেষ্টা বোধ করতে লাগলাম, কিন্তু জল পাওয়া এখন সম্ভব নয়, আর ঠিক এতটা গোলমাল ইদানিং কালের মধ্যে অনেকদিন হয়নি। সত্যি বলতে কি, আজ নীতার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঠিক আগে থেকেই শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল, যেটা নীতার ওখান থেকে বেরুবার পর

বেড়ে উঠেছে। মনে হয়, নীতাকে যদি মারতে না হত, এবং দুজনে বেশ একটা আবেশে (রমণের আবেশ যাকে বলা যায়।) গায়ে গা দিয়ে হোটেলে গিয়ে, আর একটু টেনে, নেচে, খেয়ে ফিরতে পারলে এসব কিছুই হয়তো হত না। অনেক সময়ই এরকম দেখেছি, পেটে হয়তো গোলমাল বা শরীরটা হয়তো ম্যাজম্যাজ করছে, বেশ একটা ভয়-ভয়াই লাগছে, বাড়ি ফিরে গিয়ে হয়তো বিছানা নিতে হবে, কিন্তু তখনই, হঠাৎ কোন মেয়ের সঙ্গে রাগা আরম্ভ করে দিলাম, বা গাড়ি নিয়ে দূরের পথে কোথাও ছুটতে হল, কিংবা চকচক করে মদ খেতে আরম্ভ করলাম, অমনি অসুস্থতা সব কোথায় হারিয়ে গেল, যেন ভূত পালিয়ে গেল ওঝার ধাক্কায়। এ সব কথা ডাক্তারেরা শুনলে হয়তো মাতালের বা বদমাইসের কথা বলে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু (উঃ পেটটা খামচাচ্ছে যেন।) এরকম অবস্থা আমার অনেকবার হয়েছে এবং আজও সম্ভবত আমি বেশ বহাল তবিয়তে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়তে পারতাম, ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম, সকালবেলা দেখা যেত, বেশ ভালই আছি, যদি নীতা না মারত।

নীতার খেতে যাবার কথা ছিল, আবার মনে পড়ছে, ওর খাওয়া হয়নি। আচ্ছা, ঝিটা, কী নাম যেন, চিত্রা—চিত্রা কি এখনো, নীতার ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না ভেবে দরজার গোড়ায় চুপ করে বসে আছে? তা বোধ হয় সম্ভব নয়, কারণ চিত্রাও তো প্রেম করে বিয়েছে, শরীরটা এলিয়ে এলিয়ে পড়া ভাব, ওরও এখন পেটের খিদে মিটিয়ে (অন্য ক্ষুধা তো মিটেছেই) একটু শুতে পারলেই হয়, তাই ঘন ঘন বেল বাজিয়েও যখন চাবির ফুটো দিয়ে দেখেছে, নীতা একইভাবে পড়ে আছে, তখন হয়তো একটু অবাক হয়েছে, ভয়ও পেয়েছে কি না কে জানে, তবে ব্যাপারটা নিশ্চয় একটা অদ্ভুত লেগেছে, তাই বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ডেকেছে হয়তো যা শুনে পাশের অ্যাপার্টমেন্টের সেই ইন্দোনেশিয়ান মাগীটা, (তা ছাড়া আর কী বলা যাবে, কোন এক চক্রবর্তীর বউ হয়ে নাকি কলকাতায় বসে আছে, সেই চক্রবর্তীর কোন পাত্তাই কোনদিন পাওয়া যায় না, সে নাকি বোম্বেতে থাকে, আর ইন্দোনেশিয়ানী চক্কোত্তি সন্ধ্যে হলেই যত রাজ্যের পুরুষ বন্ধুদের সম্বর্ধনা করতে থাকবে, বোধ হয় সবাই স্বামীর বিরহ মেটাতে আসে, তার রেট কত আমি জানি না, নীতার পাশের ঘর কিনা!) বেরিয়ে এসেছে, জিজ্ঞেস করেছে কী ব্যাপার, তারপরে নিজ বেল বাজিয়েছে, চাবির

ফুটো দিয়ে দেখেছে, কে এসেছিল না এসেছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, (নাঃ তলপেটটায় খিল ধরে গেল!) না জানতে পেরে ঠিক ব্যাপারটাই হয়তো সন্দেহ করেছে, অর্থাৎ নীতা বেঁচে আছে কি না, সন্দেহ হতেই, বাড়িওয়ালাকে সংবাদ দেবার পরামর্শ দিয়েছে, যে ওপরের তলায় থাকে। এতক্ষণে চিত্রা বোধহয় তাই দিয়েছে, অন্যান্য ঘরের লোকেরাও হয়তো দরজা খুলে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে, এবং বাড়িওয়ালার কাছে যদি ডুপ্লিকেট চাবি থেকেও থাকে, তবু দরজা খোলাটা ঠিক হবে কি না, এরকম ভেবে, লালবাজারে ফোন করে দিয়েছে।

নাঃ, আর বসে থাকা যায় না, হয়তো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে, আস্তে আস্তে পেটের যন্ত্রণাটা কমে যাবে, কারণ পা দুটো ভারী হয়ে যেন টনটনিয়ে উঠছে। আর এক প্রস্থ চোখে মুখে পায়ে হাতে জল ছিটিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, খাবার ঘরে আলো জ্বলছে, পায়জামা আর সার্ট পরা ওড়িয়া ঠাকুরটা (নিশ্চয় ব্যাটা আমাকে মনে মনে গাল দিচ্ছে, 'শালা মাতালটার আর আসবার সময় হয় না' কারণ ও আমাকে মাতালই ভাবে।) দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাকে খেতে দেবে বলে। যদিও খাবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই, কিন্তু ওকে সে কথা এখন বলতে যাবার আমার উৎসাহ নেই। আমি আমার ঘরের দিকেই গেলাম, যাবার সময়ে, বিদিশা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এল, জিজ্ঞেস করল, 'খেতে বসলে না?'

'না, খাব না।'

আমি এগিয়ে গেলাম, এবং সেই মুহূর্তেই বিদিশা মনে মনে বলল, 'বাঁচা গেল' তা যেন আমি স্পষ্টই শুনতে পেলাম।

সাধারণত আমি খেতে বসলে, মা, বা মা যদি না আসতে পারে, তা হলে খুকুকে বলে দেয়, সে যেন একবার একটু দাঁড়ায় গিয়ে, কারণ তা নইলে নাকি সেটা ঠিক সংসারের পক্ষে ভাল দেখায় না, বাড়ির ছেলে খেতে বসল, কেউ একবারটি কাছে দাঁড়ায় না (আহা, নিমাই, আমার নিমাই রে!) যদিচ আমার ছোট ভাই খেতে বসলে এই নিয়ম না মানলেও চলে, আমার বেলায় চলে না, কিংবা পিতৃদেবের বেলায়, কারণ যদি রাগ হয়, বিগড়ে যাই, অর্থাৎ একটা ফর্মালিটির মতই যাকে বলে, ওই সেই কতগুলো চলতি নিয়মকানুনের মধ্যে, যাতে ভাল দেখা, দেখানোর জন্যে মেনে চলা। আজ বাথরুমের ঘটনায় যেহেতু

মায়ের রাগ হয়ে গিয়েছে, সেটা আমাকে জানবার জন্যেই, খুকুকে আগেই বলে রাখা হয়েছে, আমি খেতে বসলে সে যেন একটু সামনে দাঁড়ায়, এবং দাঁড়াতে হবে না শুনে খুকু মনে মনে খুবই খুশি হয়েছে জানি। তা ছাড়া, ও জানে, আমার চেয়েও বাবা মাকে খুশি রাখাই ওর সব দিক থেকে উচিত, আমি ওর কোন কিছুর মধ্যেই নেই, ওর নিজের গর্তের মধ্যে, ওর বাবা মা-র সাহায্যটাই বেশী দরকার। জানি না, আমার চীৎকারে অন্যান্য ভাইবোনেরাও জেগে গিয়েছে কি না, গিয়ে থাকলে নিশ্চয় গালাগালি দিয়েছে, শালা-টালা বলেছে কি না জানি না, তবে মনীষা চৌদ্দ বছরের বোনটা, সেটা বিদিশার কাছে শোয়, সে নিশ্চয় বলেছে, 'দাদাটা বাচ্ছেতাই।' হয়তো, আমার মরে যাবার কথাও ভাবে, এরকম অবস্থায়, সবাই হয়তো ভাবে, বাবার কাটামুণ্ড দেখতে চাওয়ার মত।

আমি ঘরে গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই, চাকরটা জাগে করে জল দিয়ে গেল, আমি দরজাটা বন্ধ করে, ফ্যানটা খুলে দিলাম। অথচ একটু যেন গরমই লাগছে, বাতাস লাগলে হয়তো ভালই লাগবে। অথচ শীতটা মোটামুটি মন্দ নয়। জাগটা তুলে নিয়ে, অনেকটা জল খেলাম। বাইরে দুটো দরজা বন্ধ হল, একটা বিদিশার, আর একটা মায়ের। এবার শ্রীমান ঠাকুর ব্যাটা খাবে, এবং খাওয়ার ঘরেই ও আর চাকরটা শোবে। মাঝে মাঝে ওদের ভাব আর ঝগড়া দেখলে মনে হয়, দুটোতে প্রেম করে। কিন্তু জামাটা, ওটার একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। কনুইটা একবার তুলে দেখলাম, কনুইটাই খুনী, গায়ের চামড়ার থেকে একটু বেশি কালো আর চামড়াটা কোচকানো, এই কনুইটাই যেন নীতাকে মেরে ফেলেছে, কারণ এই ছুঁচলো হাড়টাই তো ওর গলায় বিঁধেছিল। কিন্তু কনুইটাকে দেখে কিছুই বোঝাবার উপায় নেই, যাকে বলে, কোন এক্স্‌প্রেশনই নেই, তবু যে কনুইকে আমার কখনোই, সারা জীবনেও তুলে দেখবার দরকার হয়নি, আজ যেন মনে হচ্ছে, সেই কনুইটাই একটা বিশেষ কিছু। চেষ্টা করে দেখলাম, কনুইটা আমার গলার কাছে আসে কি না, আসে না, এলে একটু চেপে দেখতাম, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়। কিন্তু না, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, শুয়ে পড়া দরকার কিন্তু জামাটার একটা ব্যবস্থা না করে শুই কেমন করে, কারণ ঘুমিয়ে পড়লে, যদি আজ রাত্রেই, কিংবা ভোরেই পুলিস এসে পড়ে। আসাটা খুবই স্বাভাবিক, নীতার পরিচিত-

দেরই আগে খুঁজবে, ডাকবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে। হয়তো সার্চ করতেও চাইবে, এবং তখন যদি জামাটা পায়, তা হলেই তো গেলাম। তখন নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারব না যে আমি, (মাইরি স্যার) খুন করতে চাইনি, কিন্তু আমার গর্তের মধ্যে আমার সুখের পরাধীনতার মধ্যে অতি কুৎসিত নোংরা স্বাধীনতা নামক একটা জিনিস আছে, যে হঠাৎ আমার কনুইয়ে ভর করেছিল, শুনে নিন স্যার, (আর শোনাবার দরকার নেই, ডেলিবারেট মার্ডার, চল শ্রীঘর!) আপনাদের আমি বোধহয় ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলাম না, মানে, আসক্তি এবং অনাসক্তি নীতাকে নিয়ে এ দুয়ের মাঝখানে, (হ্যাঁ জানি এসব উল্লুকের মত কথা, কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, সত্যি বলছি।) একটা অদ্ভুত, কী বলব, একটা বিশ্রী 'দ্বন্দ্বের' মধ্যে আমি ছিলাম, আরো পরিষ্কার করে বললে, ওকে ভালবাসতাম, অথচ ঘৃণা করতাম, (মামদোবাজী বলছেন তো, আমিও তা জানি, কিন্তু কী করব, ব্যাপারটা যে তাই!) এবং যাকে আমি ভালবাসতাম, তাকেই একটা ঘৃণায় আর রাগে আমি (আমি নয়, কনুইটাই তো চেপে বসেছিল।) মেরে ফেলেছি। নীতা যদি আমাকে মেরে ফেলত, আমার মনে হয়, ওরও সেরকম মনের অবস্থা হয়েছিল, তা হলে, আমার মত এরকম কথাই বোধহয় বলত, আর তাতে আমি কোন মিথ্যা দেখি না। অবিশ্যি, এ কথাটা আমি এ জন্যেই বলতে পারছি যে, নীতার ঘৃণা উথলে উঠতে আমি দেখেছিলাম, এবং এই ঘৃণা আর রাগটাই সব থেকে সন্দেহজনক ব্যাপার, নারী পুরুষের ব্যাপারে, (আমার তো তাই ধারণা) কারণ এতে ঠিক নির্ভেজাল গর্তের সুখের প্রেম প্রমাণিত হয় না, যা নিয়ে সবাই বেশ আছে!

জানি এ সবই মুজরকি বলে প্রমাণ হবে, কারণ খুন, খুনই, নীতা করলেও তাই হত, আমি করেছি, অতএব তাই প্রমাণ হবে, অতএব জামাটা তাড়াতাড়ি সরাও, কেননা, কারণ স্বাধীনতার (কী ভয়ংকর) সাহস যে ভাবে, একজনকে একেবারে শেষ করেছে, যে একজনটা আসলে কী বলে, একটা 'দ্বন্দ্ব' এবং একজনকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবার জন্যে শেষ চেষ্টা করেছে, তার চিহ্ন হিসেবেই জামাটা রয়ে গিয়েছে। এ কথা মনে হতেই আমি আর অন্য কিছু ভাবলাম না, কোটের পকেট থেকে তাড়াতাড়ি দেশলাইটা বের করে, বিছানার ভেতর থেকে জামাটা টান দিয়ে নিয়ে, কাঠি জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম মেঝের

ওপর। টেরেলিনের জামা সামান্য একটা সিগারেটের ফুলকিতেই কী রকম ফুটো হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, আর এখন একটা পুরো দেশলাইয়ের কাঠির আগুন পেয়ে যেন আনন্দে জ্বলে উঠল, যেন অনেকটা উপোষী মাতালের শুকনো গলায় বেশ বড় পেগ্-এর মাল পড়ল, আর দেখতে দেখতে তার চোখ জলজলে হয়ে উঠল, মুখটা ঝকঝকিয়ে উঠল, ভেতরের কথা ফুটে উঠল। আমি নাকের পাটা ফুলিয়ে গন্ধ নেবার চেষ্টা করলাম, বন্ধ দরজা জানালার দিকে তাকালাম, কিন্তু তেমন কিছুই হচ্ছে বলে আমার মনে হল না। গন্ধ তো তেমন একটা কিছু পাচ্ছি না, কোন দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ, যার জন্যে পোড়া গন্ধ পেয়ে কেউ ছুটে আসতে পারে। কেবল, ঘরটা আলো হয়ে উঠল, আর অল্প একটু সময়ের মধ্যে নিভে ছাই হয়ে গেল। নিভে যেতেই, আগুনের আলোটা শেষ হয়ে যেতেই, ঘরটা আগের তুলনায় অন্ধকার লাগল, এবং ধোঁয়া দেখা গেল, এবং এবার একটা গন্ধ আমার নাকে ঢুকল, যে গন্ধটা ভাল না। আমি তাড়াতাড়ি, বাড়ির বাইরের দিকের জানালা খুলে দিলাম, নিচু হয়ে কালো রং-এর ছাইটা দেখলাম, কালো রং-ই, অথচ সুতোর জামা-কাপড় পুড়লে, তার রংটা ছাই ছাই দেখায়, এটা কালচে, এবং মেঝের দাগ করে দিয়েছে। একটা বাজে কাগজ টেনে নিলাম খাটের তলা থেকে, তার মধ্যে ছাইটা পুরে নিলাম, কিন্তু মেঝেতে যেন কেমন কালচে রস ও চটচটে মত জিনিস লেগে রইল, যেটা তখুনি কাগজ দিয়ে ঘষে তুলতে চেষ্টা করলাম, অথচ ঠিক মত উঠল না। জাগের থেকে খানিকটা জল সেখানে ফেলে দিয়ে, ঘষে ঘষে তুললাম, আর তাতে এবার অনেকটাই উঠে গেল, তার ওপরে আবার পা দিয়েও ঘষে ঘষে দিলাম। কিন্তু ধোঁয়াটা ঘরের মধ্যে যেন জমে থাকতে চাইছে, বাইরে বেরুতে চাইছে না, তাই ফ্যানের রেগুলেটার ঘুরিয়ে আরো জোর করে দিলাম এবং পোড়ানো জামাটার, (জামাটা তৈরী করতে খরচা পড়েছিল সাতাশ টাকা। হার্ডলি দু' মাস গায়ে দিয়েছি, অথচ একটা টেরেলিনের জামা অনেক দিন যায়, বছর কাবার তো বটেই। আবার একটা তৈরী করতে দিতে হবে, জামাটা আমার বেশ প্রিয় ছিল।) সব ছাই রঙ চিহ্ন, যা ছিল সবটুকু কাগজের মধ্যে নিয়ে, দরজার কাছে দাঁড়ালাম। আর একবার ঘরের মধ্যে তাকালাম, ধোঁয়াটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে এসেছে, মেঝেটাও পরিষ্কার দেখাচ্ছে, সামান্য

একটা হাল্কা ছাপ আছে, কাল সকালে ঘর মোছবার সময়, আর নিশ্চয় থাকবে না, তবু দরজাটা খোলবার আগে আমি বাইরে কান পেতে একটু অপেক্ষা করলাম। বোঝা গেল কেহই ওঠেনি, কারুরই নাকে কোন গন্ধ যায়নি, এবং সম্ভবত ঠাকুর চাকর, দুজনেই খাবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যাকে বলে 'শয্যা গ্রহণ' তা বোধহয় এখনো হয়নি, হয়তো এখনো আমার বিষয় নিয়েই তাদের আলোচনা হচ্ছে, যার অধিকাংশ কথাই হল, 'মাতাল লোকটা' 'শয়তান' দেবতার ঘরে (আমার বাবা, দেবতা দেবাদিদেব) অসুর' কিংবা কে জানে, আরো খারাপ খারাপ কথাই বলছে হয়তো এবং দুপুরের ছুটির অবসরে, আশেপাশের সব বাড়িতেই চাকর ঠাকুরদের মারফত, এ বাড়ির বিষয় প্রচার হয়ে যাবে। সকলের গায়েই গন্ধ, তবু আর একজনের গায়ের গন্ধটা না পেলে যেন আমাদের স্বস্তি হয় না, ওতে একটা বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায়।

দরজাটা আস্তে আস্তে খুললাম, বারান্দায় আলো জ্বলছে। সারারাত্রিই জ্বলে, এবং যা ভেবেছিলাম, তা-ই, খাবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সব ঘরের দরজাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। ভেতরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে, সমস্ত ছাই আর কাগজগুলো ছোট ছোট টুকরো করে, পায়খানার প্যান-এর মধ্যে ফেলতে লাগলাম, আর মগে করে জল ঢেলে দিতে লাগলাম। সব ফেলে দেবার পর, অনেকখানি জল ঢেলে দিলাম, যাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় পাইপের ভিতর দিয়ে সব দূরে চলে গিয়েছে এবং যখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তখন সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললাম। ফিরে যেতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালাম, হুম, বোধহয় জামাটা নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারেই এত বেশী ব্যস্ত ছিলাম যে, তলপেটের টনটনানিটা টের পাইনি, এখন ফিরে যেতে গিয়ে, সেটা পেলাম, এবং সেই একই কষ্ট, কিছুতেই যেন ভেতরটা একেবারে সম্পূর্ণ, যাকে বলে 'ভারমুক্ত' হতে চায় না। তারপরেই ঘরে গিয়ে, দরজা বন্ধ করে, ফ্যান অফ করে দিলাম আগে, একটা সিগারেট ধরলাম, এগিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আচ্ছা, সত্যি কি আমাকে কোন খুনে অপরাধীর মত দেখাচ্ছে? আমি খুনীদের অনেক ছবি ভাবার চেষ্টা করলাম। আর আশ্চর্য, দু একটা যা মনে পড়ল, তাদের সকলের চেহারাই

যেন আমার থেকে ভাল। সবাইকেই প্রায় ফিল্মের হিরোর মত দেখায়। আমাকেও তো দেখায়, তাই—আসলে এ কথা বোধহয় হলফ করে বলা যায় না, খুনীর বিশেষ কোন চেহারা আছে।

কিন্তু এ সবও কোন ঠিক কাজের কথা নয়, আসলে আমার কী রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছে, এবং সে অস্বস্তিটা যে কী রকমের, আমি বুঝতে পারছি না। শরীরের অস্বস্তিটা এখন তো নেই অথচ মনে হচ্ছে, আমার যেন কী সব করবার রয়েছে, অথচ করতে পারছি না, কারণ, কী করবার আছে, তা মনে করতে পারছি না। আমার সবই মামদোবাজী, (আয়নার ছায়ায় নিজেকেই একটা কোমর দোলানো ভঙ্গি করে দেখলাম, সেটাকে কী বলে, খুবই 'অশ্লীল' বলা হয়।) আমার নিজের কী করবার আছে, তাও আমি মনে করতে পারছি না, তার মানে, বলা যাক, আমার কিছুই করবার নেই। নেই, তবে আমার ভেতরে কী ঘটছে, আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছু একটা ঘটছে, যেটা ঠিক ধরতে পারছি না। যেন অনেকটা, আমার মাথাটা এখন একেবারে চিন্তা-শূন্য হয়ে গিয়েছে, কিছুই ভাবতে পারছি না, অথচ যেন কিছু একটা ভাবতে পারলেই ভাল হত। এ আমার কী রকম কথা, এ রকম কি মানুষের হয় নাকি যে কিছু ভাবতে চাইছে, কী ভাবতে চাইছে, তা জানে না, অথচ ভাবতেও পারছে না। অতএব, তার চেয়ে ঘুমনো ভাল, এই ভেবে সিগারেটটা এ্যাশ্‌ট্রেতে চুকিয়ে দিয়ে, আলো অফ করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং বেশ বুঝতে পারলাম, ভাবনাচিন্তাহীন মস্তিষ্কে একটা ভার নেমে আসছে, চোখ বুজে আসছে। আঃ ঘুম, হ্যাৎ মনে পড়ে গেল, মা আমাকে প্রায়ই বিয়ের কথা বলে, অর্থাৎ আমাকে বিয়ে করার কথা বলে, এবং এখনই হ্যাৎ এ কথাটা কেন মনে পড়ল, আমি বুঝতে পারলাম না। বিছানায় একলা শুতে হচ্ছে বলেই নিশ্চয় এ কথা মনে হচ্ছে না, কারণ ঘুমোবার সময় আমার পাশে কেউ শুয়ে আছে, কোন সময়েই তা ভাবতে পারি না, বরং কেউ থাকলে ঘুমোতেই পারি না। এমন যে ঘটে নি, তা নয়, সারারাত্রিই হয়তো পাশাপাশি শুয়ে থেকেছি। (এ বয়সে, ধরেই নিতে হবে, নিশ্চয় কোন পুরুষের সঙ্গে নয়, কোন মেয়ের সঙ্গে, সে যে-ই হোক, নীতাও।) কিন্তু কখনোই ঘুমোতে পারিনি। তবু এ কথাটা কেন মনে পড়ল, আমি জানি না, নিশ্চয় এমন নয় যে, আমি হঠাৎ সুবোধ বালকের মত ভাবতে

আরম্ভ করেছি, সকলের মত একটি বিয়ে করে, (যেটাকে বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও খারাপ মনে হয় আমার কাছে, কারণ বেশ্যাবৃত্তির সমস্ত ব্যাপারটাই খুব পরিষ্কার, সোজাসুজি, কড়ি আর তেল মাখাতেই যার শেষ, আর, বিয়ে, মানেই, আজীবন কড়ি ফেলা তো আছেই, তেল মাখাও বটে, তার সঙ্গে যতদিন বাঁচতে হবে, ততদিনই প্রতি পদে পদে ছলনা, মিথ্যে কথা, তুমি সৎ না আমি সৎ, যদিও দুজনেই জানে, তারা একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে গিয়েছে, মনের কথা খুলে বলা আর কোনদিনই যাবে না, যা এমনিতেই অনেক ছলনা করতে হয়, মন্ত্র পড়ে বা আইনের প্যাঁচ কষে আবার নতুন হলফ করে, তা করতে চাই না।) চোর দায়ে ধরা পড়ব। বিয়ে! শব্দটাই খুব পুরনো, অবাস্তব আর অর্থহীন বলে মনে হয় না? বিয়ে কেন করে লোকে? জানি, এত মিথ্যে কথা এর স্বপক্ষে বলবার আছে, যেন শুনলেই হঠাৎ মনে হয়, সমস্ত কথাগুলো দারুণ, যাকে বলে 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' আর গম্ভীর, এবং প্রথম কথাই বোধহয় এখনো একদল লোক বলে উঠবে (নিতান্ত মূর্খ!) 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' (হ্যাঁ, উৎপাদনের যন্ত্র!) যেটা এখন অধিকাংশ লোক ভাবতে পর্যন্ত শিউরে ওঠে। আর যাই হোক, এ শ্লোকটা (শ্লোগান) লোকে ভাবতেই ঘৃণা বোধ করে বলে আমার ধারণা, যে কারণে, ওই বীভৎস উৎপাদনটা বন্ধ করা যায় কী করে, তার জন্যেই পণ্ডিতেরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর আসল ভয়টাই তো সেখানে, যে কারণে, এখনকার শ্লোক হচ্ছে, 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'। যার অর্থ হল, সবই চলবে, সবাই হবে, কিন্তু উৎপাদনটি হবে না। তার জন্যে বিয়ে করার কী দরকার আমি বুঝতে পারি না, কারণ নিয়ন্ত্রণটা যখন সবাই জানছে, এ যুগের সব ছেলেমেয়েরাই, আর লোকে কাজেও লাগাচ্ছে, যেমন আমরা লাগিয়ে থাকি, তখন আর বিয়ে-ফিয়ের ঝ্যালা কেন, বুঝতে পারি না। উৎপাদন যখন চাই না, তখন কী বলে, 'যৌন জীবনটা' যেটা ফাঁকি দিতে পারা যাবে না, সেটার জন্যে বিয়ের বাঁধাবাঁধি কেন, যখন বিয়ে না করেই সব চালিয়ে যাচ্ছে সবাই। নাকি, এরপরে আবার 'একনিষ্ঠ যৌন জীবন' এরকম একটা কথার আমদানি করতে হবে, যেটা, আমার মনে হয়, সোনার পাথরবাটির মত অনেকটা। 'একনিষ্ঠ যৌন জীবন' আহা, বেড়ে শোনাচ্ছে, প্রায় 'ভালবাসার' মত মহৎ, তুমি আমার আমি তোমার, আর কেউ নয়। কিন্তু আমার হ্যাৎ বিয়ের কথা মনে পড়ল, আমি বুঝতে

পারছি না। যাকগে, বোধহয় ঘুমটা জড়িয়ে আসছে বলেই এসব মনে পড়ছে, কিংবা, আচ্ছা এরকম নয় ব্যাপারটা নিশ্চয় যে, নীতা মরে গিয়েছে, সুতরাং যেহেতু মা যতবারই বিয়ের কথা বলেছে, ততবারই নীতার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছে, তাই এখন হঠাৎ বিয়ের কথা মনে পড়ে গেল এই ভেবে, বিয়ের ভাবনা আমার চুকে গেল। কিন্তু সে ভাবনা তো আমার অনেকদিনই চুকে গিয়েছিল। যদিও, মা যখন তৃতীয় শ্রেণীর অফিসারের বাজারদর যাচিয়ে আমার বিয়ের কথা বলে, এবং নীতার কথা আমার মনে পড়ে যায়, বিশেষ করে নীতার কথা মনে পড়ে যায় বলেই ওসব চিন্তা আমার চুকে গিয়েছিল। তবে আজ (ঘুম আসছে) এই মুহূর্তে চুকে যাওয়া কথাই আর একবার মনে পড়ে গেল কেন। নীতা না মরেও (ঘুম নামছে) ওসব...ধু-র...শালুক...চিনেছে... নীতা এখন পুলিশ...ডাক্তার।

গেলাম, গেলাম, পড়ে গেলাম, কিছুতেই রেলওয়ে ব্রীজের কাঠের রীলার ধরে আর ঝুলতে পারছি না, দাঁত মুখ চেপে, তলপেট সিঁটিয়ে, সমস্ত শরীরটাকে শক্ত করে, কিছুতেই শূন্যে ঝুলে থাকতে পারছি না। অনেক অনেক উঁচু ব্রীজ, অনেক নীচে নদী, কিন্তু পড়লে, ও বাবা, পড়তে পড়তেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাব, জলে পড়বার অবসর পাব না, আর পড়লেও কোথায় তলিয়ে যাব অথচ রীলারে এন্‌জিনের তেল পড়ে পড়ে এমন পেছলা হয়ে গিয়েছে, ক্রমেই হাতটা সরে আসছে, আঙুলের শক্তি কমে যাচ্ছে, তার ওপরে এই সিগ্‌ন্যাল লাইন, গাড়িটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, যে কারণে, আমি রীলার ধরে ঝুলে পড়েছিলাম, পাশে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না, ভেবেছিলাম গাড়িটা চলে গেলে আবার উঠে দাঁড়াব, কিন্তু থাকতে পারছি না, আমার গা কাঁপতে আরম্ভ করেছে, এখনই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আর ব্রীজের ওপরে এসে পড়া গাড়িটার ভাইব্রেশন, আমার হাতকে আরো জোরে খসিয়ে দিচ্ছে। আমি একবার ওপরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম, উঃ, কী ভয়ংকর ঝকঝকে নীল আকাশ, চোখটা ধাঁধিয়ে গেল—কিন্তু পড়ে যাচ্ছি—না না না...উ-ই-আ, খুলে গেল হাত, পড়ে যাচ্ছি, পড়ছি ...জল, নিশ্চয়ই জল...

হঠাৎ সমস্ত শরীরটা ধপাস, করে এক জায়গায় পড়ল, ঝাঁকুনি আর খিঁচুনি, একসঙ্গেই লেগে, চোখ মেলে তাকালাম। অন্ধকার, কিন্তু হাত পা

নাড়তে ভয় লাগছে, অনড়, নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি, বুকের ভিতরটা ধক্‌ধক্ করছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ, এবং কয়েক মুহূর্ত সেইভাবে থাকতে থাকতেই, আচমকা একটা নিঃশ্বাস পড়ল, আর আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'যাঃ শালা স্বপ্ন মাইরি।' তারপরে দেখলাম, বিছানার চাদরটা দু হাতে মুঠো করে ধরে আছি, আর গলার এবং ঘাড়ের কাছে থেমে উঠেছে। উল্লুক। স্বপ্নটাকেই বললাম বা নিজেকে, তা ঠিক জানি না, কিন্তু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল, এবং পাশ ফিরে শুলাম। ব্রীজ থেকে পড়ে যাওয়ার স্বপ্নটা আর একবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, 'উরে ফাদার' মনে মনে, বললাম, 'হাপিস্ হয়ে যাচ্ছিলাম' তারপরে বেশ গুটিশুটি হয়ে শুতে শুতে ভাবলাম, মালের খোয়ারি এর থেকে ভাল, শয়তানটার আর স্বপ্ন ছিল না নাকি। যদিচ শয়তানটাকে আমি চিনিই না, যে স্বপ্নের আমদানি করে। যাকগে, এতক্ষণে নীতার ঘরটা বোধহয়...নাঃ চোখ জুড়ে যাচ্ছে, ঘুম আসছে আবার।

আরে, আশ্চর্য, এসব জায়গা জলে ডুবে গিয়েছে কবে, বা কী করে, আমার কোন ধারণা নেই, অথচ আমি প্রত্যেকটা জায়গাই চিনতে পারছি, যদিচ সবই জলের তলায়, আর আমি যেন একটা মাছের মত, জলের তলা দিয়ে চলেছি। ঠিক যে ভয়ে ভয়ে চলেছি, তা নয়, বরং একটা গা শিউরনো, ঘিনঘিনে ভাব নিয়ে, পচা হলদে জলের তলা দিয়ে, যেমন ডুব সাঁতার দিয়ে চলে, তেমনি ভাবে, কখনো কাত হয়ে, কখনো উপুড় হয়ে, গা বাঁচিয়ে চলেছি, কারণ ডুবে যাওয়া কলকাতার এইসব এঁদো রাস্তায়, হলদে রং-এর অনেক শুকনো পাতা, গাছের ডাল পড়ে রয়েছে, এবং এখানে সেখানে কেঁচো, বা বিষহীন সাপ সব দলা পাকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে শাদা কৃমির দলাও কিলবিল করছে, সেগুলো, যেন এই ধারের নর্দমায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পেট থেকেই এককালে বেরিয়েছিল, কারণ নর্দমাগুলো আমি পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছি, এবং সেই মহাবড় গাছের গুঁড়িটা, যার ধার ঘেঁষেই সেই একটা মন্দিরের রক, সে রকের পলেস্তরা এক এক জায়গায় খসে গিয়েছে, লাল ইঁট দেখা যাচ্ছে। জলটা, কী বলব, যাকে বলে, 'পঙ্কিল' সেই রকম, হলদে আর পচা পচা গন্ধ, এবং আমার ডুবে ডুবে যাওয়ার জন্যে, জল নাড়া খাওয়ায়, হলদে পাতাগুলো মাটি থেকে উঠে আসছে, আমার গায়ে লেগে যেতে চাইছে। কিন্তু যাতে

না লাগে, আমি সেই চেষ্টায় তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাচ্ছি, এবং একরকম পার হতে গিয়ে কেঁচো সাপ কৃমি যদি হঠাৎ গায়ে লেগে যায়, সেই ভয়ে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে, যদিচ, ওরা ওদের মনেই আছে, আমার গায়ে এসে পড়ার কোন চেষ্টাই ওদের নেই। জলে কোন স্রোত নেই, তাই ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, সবই যেন স্থির, সবই পরিষ্কার দেখা যায়, আর একেবারে চুপচাপ, যাকে বলে 'নিঃশব্দ', ঝিঁঝিও ডাকছে না, এবং সবই মিলিয়ে, এটা একটা কেমন ব্যাপার, তা আমি জানি না, বা আমি যে কোথায় চলেছি, জলে ডুবে যাওয়া আমার চেনা রাস্তা দিয়ে, আমি কিছুই জানি না, কেবল এইটুকুই আমি জানি, আমি যেন লুকিয়ে একটা জায়গা পার হয়ে চলে যাচ্ছি। অবিশ্যি, এটা জানি না, আমার লুকিয়ে যাবার জন্যেই এসব রাস্তাঘাট জলে ডুবে গিয়েছে কি না, এবং জলে ডোবা এসব গলিঘুলোর বাড়ির কোন দরজাই আমার চোখে পড়ছে না...। চলেছি, চলেছি, তারপরে সবই অন্ধকারে হারিয়ে গেল, আমার আর কিছুই খেয়াল রইল না, আমি যেন কোথায় ডুবে গেলাম।

তারপরেই হঠাৎ, আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম রাসবিহারী এভিন্যুর ওপরে, ট্রাম লাইনের ধারে, কারণ, অনেক লোক হৈ হৈ করে একটা লোকের পিছনে ছুটছে, আমার দৃষ্টি সেই লোকটার দিকে, যাকে সবাই তাড়া করছে, বেশ লম্বা শক্ত চেহারার একজন যুবক, ময়লা পায়জামা আর সার্ট তার গায়ে, চুলগুলো ঝাঁকড়া, এবং সত্য বলতে কি, ওই যে কী বলে, 'আজানুলম্বিত বাহু লোকটাকে দেখে আমার সেইরকম মনে হচ্ছে, এমন কি, এ কথাও হনে হল, ওই লোকটাকে অর্জুনের পার্ট দিলে মানাবে, যদিচ, কেন এ কথা আমার মনে হল, তা জানি না, কারণ ও ধরনের ভীম অর্জুন ইত্যাদি সেজে থিয়েটার করা বা দেখা, কোনটাই আমার কোষ্ঠিতে নেই, কিম্বা এমনও হতে পারে, কার আঁকা ছবি যেন আমি দেখেছিলাম, ফুল ফোটা ঘাস বনে, অর্জুন উপুড় বা কাত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে, আর তার সামনেই, কী যে বলে আবার তাকে, হ্যাঁ, 'স্বসিত বসন' চিত্রাঙ্গদা যেন এখন আলস্যে গোয়ারি কাটাচ্ছে। সেই ছবিটার অর্জুনই বোধ-হয় আমার চোখে ভেসে উঠল, তাড়া খাওয়া লোকটাকে দেখে। লোকটা সরীর ড্রাইভার, সে যেন কাকে চাপা দিয়েছে, এবং তারপর মারমুখী জনতার কয়েক ঘা খেয়েই সে দৌড়তে আরম্ভ করেছে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। তার কানের

পিছন থেকে রক্ত পড়ছে, সকালের রোদে আমি তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এবং আমিও যেন দাঁতে দাঁত চেপে লোকটার সঙ্গে দৌড়চ্ছি, যদিচ এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে আরম্ভ করেছে, ঘামতে আরম্ভ করেছি, আর লোকটার সঙ্গে দৌড়চ্ছি, এবং একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। যদিচ লোকটাকে এখন আর আমি দেখতে পাচ্ছি না, তবু সে যে ফ্ল্যাট বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠছে, তা যেন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, দোতালা, তেতালা পার হয়ে, হঠাৎ আর কোন পথ না দেখতে পেয়ে, সামনের দরজা খোলা বাথরুমে সে ঢুকে পড়ল দরজাটা বন্ধ করল, কিন্তু এই মেরেছে, ভিতর থেকে বন্ধ করা কোন হুড়কো বা ছিটকিনি নেই, ওদিক রাস্তার মারমুখী লোকেরা, বাড়ির বাসিন্দারা, সবাই উঠে আসছে চীৎকার করতে করতে, 'ওই যে শালা, ও দিকে', 'শুয়োরের বাচ্চাকে ধরা গেছে মাইরি, হিঃ হিঃ হিঃ যেন রাগে ঘৃণায় আর খুশিতে সবাই ফেটে পড়ছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাথরুমের দরজার ওপরে, আর লোকটা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটা চেপে ধরেছে। আমিও যেন লোকটার সঙ্গে দরজা চেপে ধরলাম, জোরে, আরো জোরে, আরো...ব্যাস, সুতো থেকে ঘুড়ি কেটে যাওয়ার মত আমি কোথায় যেন ছিঁড়ে গেলাম, অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম, কিছুই আর আমি দেখতে পেলাম না, আমি নিজেকে নিজেই হারিয়ে ফেললাম।...

তারপরেই, কে অচেনা মেয়েটির গায়ে হাত দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার এক হাত তার কোমরে, আর এক হাত কাঁধে—কাঁধের হাতটার কনুই মেয়েটির বুকে ঠেকে আছে, আর মেয়েটি বুকে ঠেকে আছে, আর মেয়েটি লজ্জা লজ্জা মুখে হাসছে, চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে। জায়গাটা কোথায়, মেয়েটাই বা কে, তা আমি কিছুই জানি না, কেবল এইটুকুই দেখছি মেয়েটির বয়স বাইশ-চব্বিশের মধ্যেই, চেহারাটি বেশ ভালই, শরীর-টরীর, যাকে বলে 'বেশ উচ্চ-মার্গে' তুলে দেবার মতই, মনে হল আমার, আমি তাকে চুমো খেলাম। সে আমার দিকে তাকাল, ঠোঁট তুলে, যাকে বলে 'প্রতিদান', তাই দিল, এবং আমি তাকে চিনতে পারলাম না, অথচ আমাদের যে পরিচয় আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর আমরা যে একটা উদ্দেশ্যেই এরকম মিলেছি, তাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যে কারণে, তাকে আমি বুকে নিলাম, সে আমার

গলা জড়িয়ে ধরল, এবং সত্যি বলতে কি, আমার শরীরে যেমন শক্তি নেই, মেয়েটাকে জকর ভারী মনে হল, বিছানা পর্যন্ত নিয়ে যেতে রগ ছিঁড়ে যাবে মনে হল, তবে একবার নিয়েছি, তখন ফেলে দেওয়া যায় না, যদিচ মেয়েটির মুখে হাসি, আমার কষ্ট সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই বা মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মনে হল, আমি খাইনি। মেয়েটিকে বিছানায় নিয়ে আমি যখন প্রেমে লিপ্ত হলাম, তখন দেখলাম, মেয়েটা নীতা। অথচ তাতে যে অবাক হলাম, তা নয়, যেন আমি নীতার সঙ্গেই প্রথম থেকে রয়েছি, এবং নীতা যেন ঢেউয়ের মত ফুলে ফুলে উঠছে, পাগলের মত আমার সারা মুখে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে, আর আশ্চর্য, আমি যেন কেঁদে ফেলব, এইরকম মনে হল...তারপরেই আমি যেন কোথায় কোন, অন্ধকারে ডুবে গেলাম, কোন সুখের স্রোতে নাকি কিসের মধ্যে হারিয়ে গেলাম, তবে একটা, যাকে বলে, 'উন্মত্তের' মত 'মিলনের' সুখে ডুবে গিয়ে, কোথায় তলিয়ে গেলাম।...

আমি একটা দেয়ালের পাশে লুকিয়ে রয়েছি, এবং একটুও অবাক না হয়ে দেখছি, আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা, আমার থাতলানো শরীরটা পড়ে রয়েছে। অনেক লোক সেখানে জমা হয়েছে, অনেক মেয়ে আর পুরুষ, তারা সব নানা-রকমের কথা বলাবলি করছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমি মিটিমিটি হাসছি। এটা যেন একরকমের খেলা, সকলেরই এরকম হয়ে থাকে, এমনি একটা স্বাভাবিক ঘটনার মতই, মানুষের সমাজে একটা সাধারণ লুকোচুরি খেলার মত খেলা করছি, যেন সকলেই নিজের মৃত্যু দেখে থাকে, নিজের শব দেখে থাকে, এবং আমার মত এমনি করে লুকিয়ে দেখে থাকে, একমাত্র 'বৈশিষ্ট্য' হল কে কী ভাবে মরেছে, সে কারণে এখন লোকেরা ভিড় করে আমার শব দেখছে। সকলেরই চোখে মুখে যেন একটা ঘৃণা আর ভয়ের ভাব। সেটা কেন, বিশ্রী দেখতে আমার শবের জন্যে, নাকি আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার কথা ভেবেই, তা আমি জানি না, কেনই বা আমাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, তাও আমি জানি না, কেবল খুব অস্পষ্টভাবে এইটুকু মনে পড়েছে, আমি গর্তের মধ্যে ছিলাম, সেখান থেকে যেই বেরিয়েছি, তখনই আমার মাথায় ডাণ্ডা পড়ল, কারা যেন আমাকে পিটতে লাগল, আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না। অথচ আমি তো বেঁচেই রয়েছি, সকলেই তাই থাকে, যেন সকলেই এক একবার এক এক

রকম করে মরে, এবং এসব মোটেই খুব অদ্ভুত লাগল না। তারপরেই হ্যাঁৎ পিঠে চিমটি খেয়ে ফিরে দেখি নীতা, ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, বলল, 'ফাজিল, খুব মজা লাগছে দেখতে, না?' আমি হেসে উঠলাম এবং তারপরেই আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম, কোন চেতনা রইল না।

দরজার ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল, এবং প্রথমেই মনে হল আমি যেন কোথায় কোথায় ঘুরছিলাম, তাদের সঙ্গে কী সব করছিলাম। একমাত্র নীতাকে বুকে নিয়ে শোয়া ছাড়া আর আমার কিছুই মনে পড়ল না, কারণ আমি বোধহয় নানারকম স্বপ্ন দেখছিলাম, (নির্ঘাত পেট গরম বা উর্ধ্ব বায়ু যাকে বলে।) এবং ওই একটি স্বপ্নের চিহ্নই, আমার সব কিছুতেই রেখে গিয়েছে। অথচ সারাটা রাত্রি যে অনেক ঘটনার মধ্য দিয়া কেটেছে, সেটা, যাকে বলে খুবই 'তিমিত' ভাবে আমার মনে পড়ছে। ঘুম ভাঙার প্রথম চমকটা কাটবার পরেই, আমি ঘরের চারপাশে তাকালাম, এবং তৎক্ষণাৎ আমার নজর চলে গেল ঘরের মেঝের দিকে, যেখানে জামাটা পুড়িয়েছিলাম, দেখলাম, সেখানে কোন দাগ নেই। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বেলা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ঠিক বুঝতে না পারলেও, রোদ দেখে অনুমান করলাম, একটু দেরী হয়েছে উঠতে, আর দেরী হলেও, অনেক ঠাকুর বা বিদিশা কিংবা মা দরজায় ধাক্কা দেয়। আমি শুয়েই জিজ্ঞেস করলাম 'কে?'

'আমি গুরু, আটটা বাজে।'

আমি কোন জবাব দিলাম না, বিদিশাও নিশ্চয় দাঁড়িয়ে নেই, কেবল জাগাবার প্রয়োজনেই ও এসেছিল, যদিও অন্যান্য দিন দরজার কড়া নাড়ার শব্দে আমি এতটা চমকাই না এবং শুধু তাই নয়, ঘুমিয়ে ওঠবার পর যেরকম একটা ভার ভার আমেজ থাকে, আমার সেরকম মোটেই হচ্ছে না, যেন এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর এইমাত্রই উঠলাম। অবিশ্যি, তাতে আমার কোন শারীরিক অস্বস্তি আছে বলে মনে হল না, কেবল যে আমেজটা থাকলে ঘুমিয়ে উঠেছি বলে মনে হয়, সেরকম বোধ হচ্ছে না। তবে কাল রাত্রের থেকে, এখন আমার শীতটা বেশী লাগছে। তাই ঘাড় কুঁকড়ে উঠে, আগেই টেবিলের সামনে গিয়ে ঘড়ি দেখলাম, পৌনে আটটা। সত্যি, অনেক বেলা হয়েছে, পৌনে ন'টা থেকে ন'টার মধ্যেই শুয়োর চেঁচানোর মত জীপের হর্ন

শোনা যাবে, যদিও একবারই বাজবে, এমন নয় যে ভাড়াটে যাত্রীকে তাড়া দেবার জন্যে ঘন ঘন বাজবে. তবু এখনই মিঃ চ্যাটার্জির মুখটা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটাকে আমি কোনদিন দেখিনি যে, জীপ গিয়ে পৌঁছুবার পর দু' চার মিনিট দেরি হয়েছে, বরং কোন কোন দিন বাড়ির গেটের সামনেই লম্বা লোকটা ধবধবে সাদা চোখে, (এত সাদা যে, মনে হয় এক ফোঁটা রক্ত নেই কৃমিতে সব খেয়ে ফেলেছে।) গোঁফদাড়ি কামানো তৈলাক্ত গম্ভীর মুখে (নির্ঘাত গাদা সরষের তেল মাখে।) দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ বোঝা যায়, লোকটা অসুখী তো বটেই, আর সেই অ-সুখের কথাই মনে মনে চিন্তা করেছেন এবং রাত্রে যে ঘুম হয়নি, যতই গম্ভীর হয়ে থাকুন, আর দাড়ি কামান, সেটা ঠিকই চোখের কোলের গর্তে ধরা পড়ে যায়, সব মিলিয়ে, কী বলা যাবে, একটি 'বিক্ষুব্ধ প্রৌঢ়' অথচ কার ওপরে যে শোধ নেবেন, তা ঠিক করে উঠতে পারছেন না বলেই যেন, বয়সের ভারে, শান্ত থাকবার চেষ্টা করেছেন। যদিও শান্ত নন একেবারেই, সেটি বোঝা যায়, অনবরত চোয়াল নাড়ায়, আর বুড়ো আঙুলের ডগা ঘষায়।

মুখটা মনে পড়তেই ড্রয়ার থেকে টুথব্রাশ পেস্ট টেনে নিলাম। (বাথরুমের ভিড়ে রাখতে ঘেন্না করে, তাই ড্রয়ারে।) কারণ আর একটুও সময় নেই, আর এ সময়ই আবার দরজায় ধাক্কা লাগল। খুলে দেখলাম, ঠাকুর চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চায়ের কাপটা নিতে গিয়েই, ওর দিকে আমি একবার ভাল করে তাকালাম, আর তাকালেই গেঁয়ো মেয়েদের মত ও যেমন চোখ নামিয়ে নেয়, সেভাবেই চোখ নামিয়ে নিল। নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার সামনে থেকে চলে গেল। ওর ভাবভঙ্গিগুলো এমন মেয়েলি, চেহারাটাও প্রায় তাই। আমার ধারণা, আমার এই মনোভাবটা ও জানে বলেই চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তা ছাড়া এমনি, মাতাল বলে ভয় তো আছেই, যদিও কোনদিনই আমাকে মাতাল দেখতে পায়নি, মুখে গন্ধ আর চোখ লাল দেখেছে কেবল। ওর এই ভয়, সঙ্কোচ, লজ্জা, এসবই আমার বেশ ভাল লাগে, যাকে বলে, বেশ এনজয় করি, কারণ ঠিক যে কারণে একজন দুর্বল অসহায়কে দেখলে তাকে করুণা করতে ইচ্ছে করে, করুণা করতে ভাল লাগে, এ অনেকটা সেই রকমেরই, কিংবা অনেকটা বোধহয় পোষা পশুপাখি নিয়ে খেলা করার মতই আনন্দ উপভোগ করি।

বাসি মুখে চা গিলেই, পেস্ট মাখানো ব্রাশটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। ব্রাকেট থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে, বাথরুমে ছুটলাম। যখন বেরিয়ে এলাম, তখন সাড়ে আটটা। আবার দরজা বন্ধ, জামা কাপড় পরা। যাকে বলে টাই-টু-টো, পুরোপুরি সাহেব সাজা। হ্যাঁ, মুখে একটু স্নো পাউডারের ব্যাপারও আছে, সব কিছু শেষ হতে না হতেই শুয়োরের চেঁচানি শোনা গেল। খাবার ঘরের দিকে ছুটতে ছুটতে চাকরকে বললাম, 'ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বল, খেয়ে আসছি।'

খাওয়া মানে, জলখাবার, ব্রেকফাস্ট যাকে বলা যায়। বিদিশাকে দেখা গেল খাবার ঘরে, ঠিক আমার জন্যেই নয়, অন্যান্যদের ব্যবস্থার জন্যেও নিশ্চয়। আর সম্ভবত মা এখন আসবে না, কারণ, এখনো রেগে আছে, এটা আমাকে জানানো দরকার, অন্যথায় অন্যান্য দিন মা-ই থাকে, বিদিশা থাকে নিজের তালে। তাল মানে বেকার মেয়ের, সবাইকে (প্রেমিকদের) সামলানোর যা যা চিন্তা ভাবনা, কাকে ফোন করবে, কোন্ সময় দেবে, কী বলবে, যদিও খবরের কাগজটা হাতে থাকবে, এবং খবরের চেয়ে প্রসাধন পোশাকে সিনেমার বিজ্ঞাপনের দিকেই লক্ষ্য থাকবে, এসব নিয়েই সকালটা কাটে। অন্তত যতক্ষণ বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে বেরিয়ে না যায়, ওর সে-পাঠ দু বছর হল চুকেছে। শী ইজ গ্রাজুয়েট যাকে বলে। খবরের কাগজটা বাড়ির সবাই পড়ে। যতদূর মনে পড়ে, বছর দুয়েক আগে আমিও পড়তাম, তারও আগে, খবরাখবর নিয়ে ভীষণ যাকে বলে, চিন্তিত উত্তেজিত (কী নয়।) হয়ে উঠতাম। বাবা, বিদিশা, সকলের সঙ্গেই তর্ক পর্যন্ত করতাম, যা ভাবলে এখন হাসি পায়। এখন প্রায় ভুলেই যেতে বসেছি, খবরের কাগজ বলে একটা জিনিস আছে, পৃথিবীর খবর যাতে থাকে, যা জানবার জন্যে একদা প্রচুর কৌতূহল ছিল, এখন যার চিহ্নই নেই আমার মনের মধ্যে। কোন কোন সময় যে চোখের সামনে তুলে ধরি না, তা নয়। অনেক সময় খানিকটা অভ্যাসবশেই, আবার অনেক সময়, শুধুমাত্র কোন অনাহূতকে ব্যস্ততা বা ব্যস্ত অন্যমনস্কতা বোঝাবার জন্যেই, কিংবা কোন অপরিচিত বিরক্তিকর পরিবেশে মুখটা আড়াল করার জন্যেই। কিন্তু সংবাদ বা বিজ্ঞাপন (একমাত্র ভাল কোন মেয়ের ছবি ছাড়া) কিছুই চোখে পড়ে না। অনেকটা, কী বলব, অনেকটা হাঁপিয়ে পড়ার

মত মনে হয়। ক্লান্ত হয়ে পড়া যাকে বলে, যদিচ সংবাদপত্রই একমাত্র প্রতিদিনের বিরক্তি কাটাবার জন্যে, একঘেয়েমি নষ্ট করবার জন্যে, কিছু নতুন ঘটনা হাজির করতে পারে। তাও যেন আমার কাছে নতুন বলে বোধ হয় না, তার কারণ নতুন কী-ই বা থাকতে পারে, যুদ্ধ? শান্তি? শান্তি যে কেউ চায় না, সে তো খবরের কাগজ দেখলেই বোঝা যায়, যে শান্তির কথাটা নেহাৎ না বললে নয়, আর যুদ্ধ করবার মুরোদও বিশেষ কারুর নেই, তাই শান্তির কথা বলতে হচ্ছে, অথচ যুদ্ধের প্রস্তুতি সবাই চালিয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজে আমি এমন একটা দেশের কথাও পড়িনি, যারা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে না। আর এটাও ঠিক, নিশ্চয় চোর তাড়াবার জন্যে কোন দেশ সামরিক প্রস্তুতি চালাচ্ছে না, আসলে সবাই প্রস্তুত থাকতে চাইছে, (গরম ফুলকো লুচি গিলছি বটে, আবার না পেট কামড়াতে আরম্ভ করে।) কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সবাই যে যার তাল সামলাচ্ছে। এদিকে লড়াই লাগাবার মুরোদ কারুর সত্যি নেই। কারণ, ওই যে কী একটা কথা আছে না, মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান, সব কান-কাটারাই জানে, আগে বাবা নিজের জান, কেন না, জানে, যুদ্ধ তো কইরবে মোড়ল, বেঙ্গাস্ত্র থেকে বাঁচার উপায় যে নাই, তবু সবাই উরত চাপড়াচ্ছে, আর বলছে, 'স্‌সান্তি, স্‌সান্তি স্‌সান্তি।' এই একই কথা থাকবে কোন না কোন দেশের, তারপরে পার্লামেন্ট, অ্যাসেম্বলি, মন্ত্রিসভা, বিরোধীদল, চাল-ডাল-কাপড়-সরষের তেল, এ বলে হম সোচ্চা ও বলে হম সাচ্চা অথচ যা হবার তা হয়েই যাচ্ছে। অনেকটা পেটের ছেলের মত, কেউ রোধ করতে পারছে না, যে কারণে, এসব খবরের পাশেই নির্ঘাত বাজার অগ্নিমূল্য, গোলায় ধান নাই, তেত্রিশ লক্ষ সাইকেল বিক্রী, ফিল্ম স্টার বিলেত চলল গোঁফ কামাতে, বিলেত থেকে একদল নাচতে এসেছে, তারপরে, নিদেন একটা মার্ডার (নীতার কথাও আমার মনে আছে, সেটাও খবরের কাগজে উঠবে, তবে হিসেব করে দেখেছি, আজ তা ওঠা সম্ভব না, কারণ পুলিশ আসবে, দেখবে, বুঝবে; খবরের কাগজকে খবর দেবে কি না ভাববে। এবং যদি দেয়, তখন এত দেরি হয়ে যাবে, গত ভোর রাত্রের মধ্যে সে খবর ছাপা অসুবিধা। বরং আগামী-কালের কাগজে বেরুবার সম্ভাবনা আছে, আর যা বেরুবে, তাও আমার জানা আছে, অতএব) কিছু চুরি জোচ্চুরি মারামারি, আবহাওয়া, ব্যবসা, ওফ্‌,

টারার্ড! অথচ এক সময়ে খবরের কাগজ ঘুম ভেঙে না পেলেই, যাকে বলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবার অবস্থা হয়ে উঠত, প্রাকৃতিক কর্মটর্ম, অর্থাৎ পাইখানায় যাওয়া মাথায় উঠে যেত, যেটা এখনো পিতৃদেবের আছে, (নিশ্চয় খবরের কাগজটি হাবড়ে নিয়ে বসে আছেন ঘরে।) ভাই-বোনেরাও তাই। ওরাও খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, স্পোর্টস আর ফিল্ম আর কে জানে, বার ক্যাবারের দিকেও নজর যায় কি না, (আমার যেত।) এমন কি মাতৃদেবীও চোখে চশমাটি এঁটে একটি শীট নিয়ে বসে যান, (তিনিই বা পেছিয়ে থাকেন কেন!) কী যে পড়েন তা আমি জানি না, বা কেন পড়েন, আজ পর্যন্ত তা বুঝতে পারিনি, আর আমি (কী বলা উচিত আমাকে, এ ক্ষেত্রে, 'একটি ভুষি মাল!') প্রায় ভুলেই গিয়েছি খবরের কাগজ বলে একটা জিনিস আছে, যেটা রোজ খাবার পরবার মতই, অথচ কোন কৌতূহলই আমার নেই তার সম্পর্কে।

বিদিশা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে আর লুচি দিতে বলব?'

শেষ গরাস আমার মুখে, মাতা নেড়ে জানালাম, চাই না, এবং ঘড়ি দেখলাম, সেকেণ্ডের কাঁটাটা আরবী ঘোড়ার মত ছুটছে, আর সেই সাদা চোখ, তেল-তেলে মুখ মিঃ চ্যাটার্জি (শ্যালকটি) দাঁড়িয়ে আছেন। কোনরকমে জল গিললাম, (দোহাই, এখন যেন আর বাথরুমে ছুটতে না হয়।) তারপরেই চা, জলের চেয়ে বেশী গরম নয়। ঢক ঢক করে গলায় ঢেলেই ছুটে গেলাম নিজের ঘরে, ড্রয়ার থেকে গগল্‌সটা বের করে পরলাম, দেখলাম আয়নার দিকে। দেখতে দেখতে একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে ধরলাম, স্যাটস্‌ ফাইন উম্‌? হুম্‌, পেটটা ঠিক আছে, চেহারাটা ঠিক আছে, এবার একটা পাক খেয়ে নেওয়া যাক, এবং দু'বার কোমর দোলানি, একটু চোখ টেপা, তারপরে, 'কাম, দেয়ার ইজ দি লেনেলি বীচ,' ভেতর থেকেই গুনগুনিয়ে উঠল, যদিচ, কেন নির্জন সৈকতে যাবার কথা মনে পড়ল তা জানি না, চলেছি তো জনারণ্যে, মনে হলেই গা ঘলিয়ে উঠতে চায়, বেশী মানুষ দেখলেই, শরীর খারাপ করতে আরম্ভ করে যেন অনেকটা নরকে পৌঁছুবার মত। তা ছাড়াই কাকেই বা ডাকছি যাবার জন্যে, আমার এই মুহূর্তে কারুর কথাই মনে পড়ছে না, কেবল নীতার কথাটা এই মাত্র, কিন্তু (ওরে সালো।) দেরি হচ্ছে, বেরিয়ে পড়া দরকার। অথচ মনে করতেই পারছি না, কী কাজ করার আছে। আছে হয়তো

কিন্তু, অফিসে না ঢুকলেই কিছুই মনে পড়তে চায় না, কারণ কাজটাকে তো কাজ বলেই মনে হয় না, নেহাত না গেলে টাকা, ঠাট, ঘুষ, দলবল, যা নিয়ে থাকতে হয় আর কি, সে সবগুলো হবে না, যাকে বলে জীবিকা। টাকা মানেই জীবিকা, যা নইলে এক মুহূর্তও চলে না, এমন কি এখন যে ঘরটায় আছি, টাকা না আনতে পারলে, তার দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে, এমন কি, ওরে বাবা, সব র‍্যালা রপোর্টই ডকে উঠে যাবে, মাল খাওয়া আর প্রেম করা (যত বেশী টাকা তত বেশী প্রেম।) আর যত খাতির পীরিত, সব হওয়া হয়ে যাবে। চাকরিটা যে কোনভাবেই রক্ষা করতে চাই। কিন্তু সত্যি বলতে চাকরিটা যেন অনেকটা ছেনালের মত, যে প্রথম দর্শনে খাঁটি প্রেমিকার মত ডাক দিয়েছিল, না ডাক নয়, ওটাকে কী বলে, 'আহ্বান' করেছিল আমাকে 'বিরাট পবিত্র' দায়িত্ব পালন, উন্নতি ও সুখ ও দেশের সেবা, জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ, যেমন খাঁটি প্রেমের, অর্থাৎ 'পিকিত পেরেম'-এর অনেক সব থাকে, জীবনকে মহৎ পবিত্রতা দান করা ইত্যাদি, তার পরে দেখা যায়, সব পয়মাল, সবাই সমান, সবাই এক। ঠিক মত বলতে গেলে, বলতে হয় নীতার মতন, 'নিষ্পাপ পবিত্রতা' ইতির মতন। প্রথম প্রথম সেই রকমই মনে হয়েছিল, (কিন্তু আর দেরী নয়, উল্লুকটা বেরিয়ে পড়।) এমন একটা বিরাট কাজ, এমন একটা দায়িত্বের কী বলা যায়—সম্মানজনক পদ, (সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে, একবার পিতৃদেবের ঘরের দরজার দিকে চোখ পড়ল যদিচ যাবার আর কোন প্রশ্নই নেই, গতরাত্রে বাথরুম এপিসোড বাঁচিয়ে দিয়েছে।) আমাকেও তাই জীবনের এই 'পরম পবিত্র সুযোগকে', যাকে বলে 'কৃতজ্ঞচিত্তে' গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে। গিয়েছিলামও তাই, (মাইরি! দুরু দুরু বুকে, অনেকটা জীবনের নতুন বাসরে যেমন করে ঢোকে, (নতুন বাসর, কী হয় ওখানে, জান না জাদু?) আমার ভবিষ্যৎ 'সুখ পবিত্রতা এবং সমাজের মঙ্গলার্থে' দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম আর প্রথম ফাইলের পাতাটা খোলা মানেই তো প্রথম ঘোমটা খোলা, আর প্রথম সই করা মানেই তো, 'প্রথম চুম্বন' রেখা আঁকা যাকে বলে, মনে হয়েছিল, যাঃ শালা, রাজা হয়ে গেছি একেবারে। তারপরে, ওরে বাবা! হাতী তলিয়ে যাবার গর্ত মা, (ড্রাইভারটা সেলাম করল, আমি উঠে বসতেই, শুয়োরের মত একবার চেঁচিয়ে উঠে, গোঁ গোঁ করে ছুটতে আরম্ভ করল।) কোথায় এসেছ

ভাঁদ একবার ভাল করে দেখ, হুঁ, মিথ্যে যদি না বলতে পার, দিনকে যদি রাত না করতে পার, ঘুষ যদি না খেতে পার, তাহলে কেটে পড়। তা নইলে সব প্রেম ফস্‌কা গেরো, প্রাণ হাট্‌কে দেখ, রস নেই, সুস্বাদ নেই, বুলি কপচাতে হয় ময়দানে চলে যাও। তাই কখনো যাই? যা শুনে এসেছি বরাবর, নেহাত উল্লুক বলে, সেসব আবার বিশ্বাসও করে বসেছিলাম, তাই যাকে বলে হকচকিয়ে যাওয়া, তাই গিয়াছিলাম, তারপরেই হাবড়ে পড়ে রইলাম, কারণ তাই কখনো যাওয়া যায় নাকি, জীবিকা না? ঠিক মত বলতে গেলে, চাকরিটাও যেন আমার কাছে এক রকমের নীতা হয়ে উঠল, এবং ঠিক মত ভাবতে গেলে, ব্যাপারটা তাই নয় কি? সেই প্রথম প্রেমের মত, যখন ভাবছিলাম, 'পেয়েছি' অর্থাৎ জীবনধারণ যাকে বলে, জীবনে করবার মত কাজ পেয়েছি একটা, যা আমাকে, কী বলে ওটাকে—কর্মোন্মাদনায় মাতিয়ে রাখবে, 'পবিত্র কর্ম'—তারপর দেখা গেল, কর্মের মন্দিরে ওসবের বালাই নেই। পূজাপাট সব অন্য রকম, ফেল কড়ি মাখ তেলের মতই, সবাই যা পারছে খিচে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেরই এক পূজা দাও আর নিয়ে যাও। আর ছাড়বার মুরোদ নেই, সব ছাড়তে পারি, শুধু একে কখনোই নয়, এখানে খুঁটি বাঁধা, অনেকটা নীতাকে ছাড়তে না পারার মতই, সব জারিজুরি খতম, অথচ সবটা মিলিয়ে, চাকরিটাকে মনে হয় দু'হাতে সামনে তুলে নিয়ে এসে গায়ে থুথু দিয়ে দিই। এক এক সময়, সত্যি বলতে কি, এত ঘেন্না করে, আর রাগ হয়, মনে হয় গলা টিপে খতম করে দিই। চাকরিটাকে আবার তা কেমন করে দেওয়া যায়, জানি না, সবই আমার সেই মামদোবাজী, তবু আমার কাছে ব্যাপারটা সেই রকমই, যে নাকি আমাকে দু' হাত ভরে টাকা দেয়। তার সঙ্গে আবার ইজ্জতও, কারণ আমি তো অফিসার, কিন্তু আমাকে তার সব মর্জিই মেনে চলতে হয়, তা নইলে টাকা আর ইজ্জত সবই হাপিস্। আর তার মর্জি মানে, সত্যি-মিথ্যের কোন ব্যাপার নেই, যেন সেও অনেকটা, কী বলে, অসহায়, কারণ চাকরি মেয়েটা, (চাকরিটাকে এভাবে স্ত্রী-লিঙ্গে দেখলেই, ঠিক দেখা হয় বলে আমার ধারণা) তার চারদিকে সবাই যে রকম মন্দা ময়ূরের মত পেখম মেলে ঘাড়ে চাপবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে, নিজেকে তার বাঁচিয়ে চলবার উপায় নেই, কারণ তারও সুড়সুড়ি লাগে, যাকে বলে শৃঙ্গার হয়, অতএব, সেও তোমার

কাছে মর্জি করবে বইকি। আর তার মর্জি মানেই প্রচুর মিথ্যে কথা বলা, (ছলা কলা করা যাকে বলে, যেমন পীরিতের বেলায় করতে হয়) কুকুরের মত ভয়ে ভয়ে থাকা, কতগুলো শুয়োরের বাচ্চা জাতীর প্রাণীর কাছে প্রায় হাত জোর করে দাঁত বের করে হাসা, এ সবই করতে হয়। কিন্তু যেহেতু, যাকে বলে, 'পান-আহার-মৈথুন' সে যোগায়, (পবিত্র কর্ম ও সহজ সেবা, ওসব তো সে অনেক আগেই ইউরিনালে বিসর্জন দিয়েছে) যেহেতু সে তোমাকে বেঁধে রেখেছে, সেইহেতু তুমি তাকে ছাড়তে পার না। তাই চাকরিটাও, আমার কাছে সেই আসক্তি ও অনাসক্তি, (আবার সেই মামদোবাজী) যাকে বলে, খুবই চাই, অথচ ভয়ংকর ঘৃণা করি, এবং বিশেষ করে যখন মনে হয় যে, এই চাকরির মধ্যে এমন সব, যাকে বলে মহৎ পরিণতির বিষয়বস্তু রয়েছে তাই এর জন্যে আমার গর্ব করার আছে, আছে ভেবে সুখী হই, অথচ পরমুহূর্তেই দারুণ ঘৃণায় প্রস্রাব করে দিতে ইচ্ছে করে, কারণ মহৎ পরিণতিগুলো ঠিক যেন বেশ্যার মত আমাকে কাজ সেরে বিদায় নিতে বলে, যার মানে দাঁড়ায়, তার পরিণতি তা-ই ; তুমি তো আসলে বড় বড় কথার মারপ্যাচে কাজের ফিরিস্তি দিয়ে টাকা লুটতে এসেছ, লুটে নিয়ে চলে যাও। তার মানে, সেই তুমোও যা, আমুও... ।

কিন্তু এতক্ষণে মাত্র শিয়ালদহের কাছে, বলতে গেলে সব থেকে জঘন্য জায়গাটাতে ট্রাফিক পুলিশের হাত যেখানে একবার উঠলে, যন্ত্রের মত বিকল হয়ে যেন দাঁড়িয়েই থাকে, আর রাশি রাশি পোকার মত মানুষ, (মানব-সাধারণ ওহো, 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এখানে এলেই বোঝা যায়, পবিত্র মানব-জন্মের কী অপূর্ব সার্থকতা।) এপার ওপার করছে, কারণ এ তো আর শুধু শহরের মানুষ নয়, বাইরের মানুষরা আসছে, যাদের ঠিক বমি করার মত, লোকাল ট্রেন-গুলো ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। অথচ এর মধ্যেই আমার ঠিক লক্ষ্য পড়ছে ভাগলপুরী গাইয়ের মত, নিতম্বিনী মেয়েটি পাস্ করছে, নিতম্বিনী। তার মানে কি, পাছা তো সকলেরই আছে, যেমন হাত পা পিঠ সকলেরই থাকে, এবং তার জন্যে নিশ্চয় কাউকে হাতওয়ালী, পাওয়ালা, পিঠওয়ালী এ সব বলা যায় না, তবু পাছাওয়ালী (নিতম্বিনী যাকে বলে!) বললেই যেন একটা বিশেষ ছবি ফুটে ওঠে, যে কারণে অনেক সময়েই ভাগলপুরী গাইয়ের কথাটা অনেকে বলে থাকে। মন্থরগামিনী পশুটিকে দেখলে একটু দুলে দুলে আস্তে আস্তে চলা,

স্বাস্থ্যবতী মেয়ের ছবি মনে পড়ে যায়। অবিশ্যি হাতীর তুলনা আমাদের চৌদ্দপুরুষ আগের লোকেরাই দিয়ে গিয়েছে, গাজেন্দ্রগামিনী, আমরা হাতী থেকে গরুতে নেমেছি, তবে ভাগলপুরটা তার সঙ্গে জুড়েছি, তফাতটা হল এই, যারা হাতীর তুলনা দিয়েছে, তারা সব কবি, আর আমরা যারা ভাগলপুরী গাই বলেছি, তারা সব রক্‌বাজ খচ্চর। জানি না' গাভীগামিনী বললে কি হত।

কিন্তু ওফ্, ট্রাফিক পুলিশের হাতটা বোধ হয় স্ক্রু আটকে গিয়েছে, আর কোনদিন নামবে না, এবং মানব-সন্তানেরা দৌড়ে লাফিয়ে হেঁটে, (আঃ বুলেট! একটা মেয়ে) পার হয়ে চলেছে, ভাবটা যেন এই মোড়টা পার হতে পারলেই জন্ম সার্থক, একেবারে জীবনের নন্দনকাননে (ভাগাড়ে নয়) গিয়ে পৌঁছুবে। এদিকে ঘড়িতে সোয়া নটা, চাটুয্যে মশাই হাঁপিয়ে উঠছেন, বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন ঘনঘন শুয়োরের চীৎকার শোনবার জন্যে কান পেতে আছেন, আর আমার মুখটা মনে হতেই, ওর মুখটা কুঁচকে উঠেছে, যেন আমি একটি তেতো বিষের বড়ি, কারণ লোকটার তো ধারণা, আমিই দেরী করছি। বিশেষ করে ছোকরা দেখলেই মিঃ চ্যাটার্জির মেজাজ খারাপ, যেহেতু ওঁর ছেলে ছোকরা, তাই দুনিয়ার সমস্ত ছোকরা হল শয়তান, যারা বয়সের তেজে বিমাতাকে ছেড়ে কথা কয় না। হয়তো নিজের ছেলে ওরকম না হলে, অর্থাৎ ওঁর তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে, (ছুঁড়িটা আমার দিকে তাকিয়ে দেখে গেল। আশ্চর্য, ভাবাই যায় না যে, কাল রাত্রে একটা মেয়ে, আমার হাতেই—) লটঘট না হলে, মিঃ চ্যাটার্জির কাছে আমি হতাম, যাকে বলে 'পুত্রপ্রতিম' স্নেহের পাত্র, কিন্তু লোকটা তা তো পারলেই না এমন কি নিজেকে সব সময়ে ছোট রাখবার জন্য আমাকে কোনদিন 'তুমি' বলতে পারলেন না, যদিচ, অন্যান্য বিগ্, বস্-এরা আমাকে তাই বলেন, এমন কি যাকে বলে স্নেহ করে খিস্তিও করেন, 'কি হে ছোকরা, কেমন চালাচ্ছ?'

আঃ হাত নেমেছে, জীপ ছুটেছে, এবং আমার আবার নীতার কথা মনে পড়ে গেল, নীতা এখন কি করছে, অর্থাৎ এখন ও কি অবস্থায় আছে, কে জানে। পুলিশ এসে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে কি না, পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠিয়েছে কি না, আর পোস্ট মর্টেমে গেলে ডাক্তার নিশ্চয় ওকে কেটেকুটে দেখবে, ইস্, মাইরি, তখন যদি থাকতে পারতাম, তাহলে ওর ভেতরটা দেখতে পেতাম।

আচ্ছা, ডাক্তার নিশ্চয় এটাও বুঝতে পারবে, মেয়েটা খুন হওয়ার আগে, কোন পুরুষের সঙ্গে শুয়েছিল, কিন্তু এটাও কি বুঝতে পারবে, পুরুষটা ওকে ধর্ষণ করেনি.স্বইচ্ছাতেই শুয়েছিল। আচ্ছা, নীতার কে কে আছে, মানে ওর বাবা-মায়ের কথা বলছি, এ সব খবর পুলিশ কী করে জানতে পারবে, কে জানে। শুনেছি নীতার বাপ-মা সবাই বর্তমান, এমন কি ভাই-বোনও নাকি আছে, তবে বাংলাদেশে নয়, বিহারের কোন অঞ্চলে। এক সময়ে নাকি, ওর বাপ-মা কলকাতায় এসে কিছুকাল ছিল, সে সময়ে কলকাতার সঙ্গে নীতার পরিচয় হয়েছিল, এবং ও কলকাতার কলেজে পড়েছে, কলকাতার সঙ্গে এমন জড়িয়ে গিয়েছে, আর ছেড়ে যেতে পারেনি। কিন্তু যা খুশী তাই হোক গে, আমি কিছুই জানি না, কনুইটা যত নষ্টের গোড়া।

M/s. Jh[illegible]
KALI BARI ROAD.
KHULNA.

M/s. [illegible]
KALI BARI ROAD.
KHULNA.

M/s. Jhenidah [illegible]aders.
KALI BARI ROAD.
KHULNA.

যা ভাবা গিয়েছিল, ঠিক তাই, মিঃ চ্যাটার্জী গেটের ওপর দাঁড়িয়ে, কোটের হাতা টেনে ঘড়ি দেখছেন, গোঁফদাড়ি কামানো তেলতেলে মুখখানি গম্ভীর, যে কারণে আমার দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করল না বোধ হয়, নিচু দৃষ্টি গাড়ীর চাকার দিকে, (ওখানেই যাবে তুমি) যেন আপাতত চাকার দিকে তাকিয়েই দেরীর কারণটা অনুমান করবার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ দিব্যি রোদে দাঁড়িয়েছিলেন, পায়ের কাছে শুকনো পাতা অনেক ছড়ানো, নিশ্চয়ই দু-একবার পায়চারী করতে গিয়ে মচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়েছে, বেশ তো মেজাজ আসার কথা, কিন্তু তা বুড়ো খোকনটির ভাল লাগবার কথা নয়, খালি তৃতীয় পক্ষ আর কোথা থেকে কত উপরি টাকা পাওয়া যায়, তার চিন্তা।

আমি বললাম, 'গুডমর্নিং স্যার।'

'মর্নিং।' না তাকিয়েই জবাব দিলেন চ্যাটার্জি, যেন আমি কোন অপরাধ করে এসেছি, যেন আমার মুখের দিকে তাকালেই সতীত্ব 'নাস্‌' হয়ে যাবে।

আমি ড্রাইভারের দিকে সরে গেলাম, সেটাই নিয়ম, সুপিরিয়রকে ভাল জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে, (সম্বন্ধী) যদিচ, বৃষ্টি-বাদলার সময় বা গ্রীষ্মকালে গায়ে রোদ বৃষ্টি পড়তে পারে, তখন সুপিরিয়র ড্রাইভারের পাশেই চলে যান, সেটাও ওই একই নিয়মে, (যে নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলেছে) এবং অনেক দিনই লক্ষ্য করেছি, আসলে উনি চান, আমি যেন পেছনের সীটে গিয়ে বসি, যাতে বুড়ো সামনের দিকে বেশ হাত-পা খেলিয়ে বসতে পারেন, কিন্তু সে গুড়ে বালি। তা আমি কোনদিনই বসি না, জানি, ওঁর উপায় নেই আমাকে বলেন পেছনে গিয়ে বসতে, এবং বললে যে সে কথা থাকবে না, আর না থাকার দরুন যে অবস্থাটা হবে, সেটার মুখোমুখি বুড়ো দাঁড়াতে চান না বলেই বলেন না। গাড়িটা বেরিয়ে যাবার আগেই, আমি একবার বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিলাম, যদি চ্যাটার্জির তৃতীয় পক্ষটিকে দেখা যায়, কিন্তু কোথায়, একটা কাক-পক্ষীও

দরজায়-জানালায় নেই, কোনদিনই দেখতে পাইনি। কিন্তু আমার ধারণা আমিই দেখতে পাই না, ভেতর থেকে নিশ্চয়ই আমাকে দেখেছে, সে সব ফোকড়-ফাকড় আমার জানা নেই। গাড়ী চলেছে এবার কলকাতার, কী বলে, হা-মুখে যেখানে সবকিছু খাওয়া হয়, এবং গোটা দশেক পাকস্থলীতে তা গিয়ে পড়ে, হজম বা বদহজম যাই হোক, সেটা টের পাওয়া যায়।

'পেপার দেখেছেন নাকি?'

চ্যাটার্জি সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর আমার প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠল, পেপারের প্রথম পাতায় নীতার উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা একটা ছবি। আমিও না তাকিয়েই বললাম, 'না। কেন, বিশেষ কোন খবর আছে নাকি স্যার?'

চ্যাটার্জি সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমার কথাটা বুড়ো খচর! কানেই যায়নি, কিংবা উনিই যেন গাড়িটা চালাচ্ছেন, এমনি একটা ভাব করে, গাড়িটা যখন পর পর দুটো লরীকে ওভারটেক করে গেল, তখন, অনেকটা নিশ্চিত হয়ে, হাতের কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। যেন বলবার কষ্টটা উনি আর করতে পারছেন না, বা আমার সঙ্গে অত কথা বলবার ইচ্ছে ওঁর নেই, তাতে মান যেতে পারে। বললেন, 'দেখুন।'

প্রথম পাতাটাই আগে খুলে দেখলাম, এবং প্রথম ছবিটাই, এটা ঠিকই, একটি মেয়ের, আর শুয়েই আছে, কিন্তু নাচের একটা বিশেষ ভঙ্গিতে, যেন শুয়ে আছে, পিঠটাও খোলাই, বুকের একটা পাশও প্রায় দেখা যাচ্ছে, (বেশ ডবকা) উরুতের অনেকখানি খোলা, তবে একটা পা প্রায় ঘাড়ের কাছে উঠেছে, মুখে হাসি, নিচে ইংরেজীতে লেখা আছে, 'শীতের নতুন আগন্তুক, এ পাখির জন্ম স্পেনে, মা অস্ট্রেলিয়ান, বাপ ইটালিয়ান, পাখি নাচ শিখেছে প্যারিসে, জয় করেছে ইউরোপ ও আমেরিকা, নাম মিস মারিয়া গ্রেহাম, এবার আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। ওর বিশ্বাস কলকাতাবাসীকে ও খুশী করতে পারবে।' তা পারবে, কতটা গা দেখাতে পারবে, তার ওপরে নির্ভর করছে, যদি পুরোটা পারে, (ইয়াহু!) তা হলে বিশ্বাস রাখাই উচিত, এবং কতটা শরীর দোলাতে পারবে, যার অর্থ, সবাই যাতে ওখান থেকেই কোন মেয়েমানুষের কাছে ছুটতে পারে।

'পাঁচের পাতা দেখুন।'

চ্যাটার্জি আবার বললেন, বুড়োর লক্ষ্য পড়েছে, আমি মিস মারিয়াকেই দেখছি, এবং পাতা ওল্টালাম, পাঁচের পাতায় দেখলাম, ছবি আছে, তবে ফিতে কাটার ছবি, যা দেখবার কোন দরকারই নেই, তাও পুরুষ। কিন্তু কই, নীতার ছবি বা খবর তো কোথাও দেখছি না, এক পাশে একটি লোকের ছবি, সে কী সব বলেছে, তারই ফিরিস্তি, যাতে আমার কোন মাথাব্যথাই নেই, এবং আর যা থাকে, পাক্-বর্জার, চাল ডাল সরষের তেল...।

'বুঝলেন কিছু?'

কোন, খবরটার কথা বলছেন, তাই বুঝলাম না, অতএব কী বোঝার কথা বলছেন, জানি না, তাই আমি চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকালাম, আর (খচর) বুড়ো সেই বাইরের দিকেই চোখ রেখেই কথা বলছেন। আমি বললাম, 'কোন, সংবাদটা, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন, ওই তো, ও পাশে ছবি দিয়েছে, হরলাল ভট্টাচার্য, দেশপ্রেমিক, কীভাবে দেশের ইণ্ডাস্ট্রি বাড়ানো যাবে, হাতে-কলমে কাজ করে তিনি দেখাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই একটা ছোটখাটো যন্ত্রপাতির কারখানা তৈরির ব্যাপারে উনি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন, আট বিঘা জমির ওপরে কারখানার বিল্ডিং তৈরি হতে চলেছে...।'

চ্যাটার্জি বলে চলেছেন, আর আমিও তখন কাগজে দেখে চলেছি, এক পাশে যে ছবিটা রয়েছে, কী সব ফিরিস্তি দিয়েছে বলে আমি মনে করেছিলাম, সেটাই আসলে খবরটা, যে কারণে তখন একবার আমার মনে হয়েছিল লোকটার মুখটা আমার যেন চেনা চেনা লাগছে, তবু মনোযোগ দেবার কোন কারণ ছিল না' রোজ একই মুখ খবরের কাগজে দেখা যায়, চেনা চেনা মনে হওয়াটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। কিন্তু এই লোকটা, একটি ঘোরেল মালবিশেষ, আমি খুব ভালই চিনি একে, এর সঙ্গে মাসখানেক আগে আমাকে দেখা করতে যেতে হয়েছিল, একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্যে, এবং এই চোরের শিরোমণিটি, এই হরলাল ভট্টাচার্য, ইতিমধ্যেই বয়েক লক্ষ টাকা, আমাদের ইণ্ডাস্ট্রির বিভাগ থেকে খেয়ে (লোন যার নাম, ধার করা যাকে বলে, শালা, কার ঘাড়ে কে বাঁশ কাটে) বসে

আছে. কারণ, সে একটা মস্তবড় কারখানা করবে. তার জন্যে তার টাকা দরকার. এবং বড়কর্তারা অনেকেই তার চেনা. সে নাকি একজন দেশপ্রেমিক. শুধু তাই নয়. আবার লাঞ্ছিত, অতএব তাকে বিশ্বাস করা হয়েছিল. লোন অনুমোদন করা হয়েছিল. কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছে. আরো পাবে. যদিচ দু' বছরের মধ্যে. মালটি বোধহয় কেবল মাল নিয়েই থেকেছে. কোন কাজই করেনি. অথচ. কাগজপত্রে. নথিপত্র যাকে বলে, ম্যাপ, প্ল্যান, সব কিছুতে সব ঠিক আছে. আমার ওপরেই আমার অফিসের কর্তৃপক্ষ ভার দিয়েছিল, ব্যাপারটা জানবার জন্যে, লোকটার সঙ্গে দেখা করে সব বিষয় খোঁজ নেবার জন্যে কতখানি খাঁটি কাজ হয়েছে. না কি সবই ভুয়া. টাকাটা গাড়িতে-বাড়িতে মদে-মাগীতেই গেল। ওই জাতীয় সব ব্যাপারেই যে টাকাটা গিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই. কারণ ব্যক্তিটি খুব মারাত্মক, যথার্থ স্থানে তিন বিঘে জমি ছাড়া কিছুই হয়নি। এ সব আবার আমাদেরই দেখতে হয়, জানতে হয়, তদন্ত করতে যেতে হয়, (অনেকটা চোরের সাক্ষী গাঁটকাটার মত, কে যে কাকে ধরে। এস বাবা, ভাগাভাগি করে নিয়ে নিই, কী দরকার ঝামেলার) তদন্ত করে রিপোর্ট করতে হয়, শাস্তির ব্যবস্থা করতে হয়। যদিচ মূল কারণ হল. ইণ্ডাস্ট্রিতে উৎসাহ দেওয়া, ইণ্ডাস্ট্রি তৈরী করা. আর এমন জায়গায় তৈরী করা যেখানে মেলাই কলোনী-টলোনী আছে, ছোকরারা সব বেকার বসে আছে, ছুঁড়িদের পেছনে লাগছে, আর দলাদলি মারামারি করছে, তাদের যাতে ওসব কারখানায় কাজকর্ম দিয়ে, দুটো খাইয়ে পরিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখা যায়, (কারণ পেটে ভাত না থাকলেই, 'যৌবন জলতরঙ্গ' যেন বেশী বান ডেকে ওঠে) অর্থাৎ একদিকে ইণ্ডাস্ট্রি, আর একদিকে বেকারনাশ. যদিও 'বেকার নাশন করা' ঠিক আমাদের সরাসরি দেখতে হয় না. তবু ওটা একটা মস্ত বড় কথা। যদি কর্তৃপক্ষ বোঝে, হ্যাঁ এই লোকটিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করলে. একটা কাজ হবে, তাহলে তাকে. তার কাজের—যাকে বলে ব্যাপ্তি, তাই বুঝে, টাকা দেওয়া হয়। অনুমোদনটা অবিশ্যিই অনেক ওপরের কর্তাদের ব্যাপার, আমাদের মতামত পরামর্শও চাওয়া হয়, (আমি তো এখনো বালক. যাদের পরামর্শ চাওয়া হয়, তারা সব ঘাগী বয়স্ক লোক। আমার মতামতের তেমন দামই দেওয়া হয় না।) কারণ অনুমোদনের পরে যাকে বল 'সর্বাঙ্গীণ কুশল' আমাদেরই দেখতে হয়, যে কারণে এই সব

পার্টি', আমাদেরকে হাতে রাখতে চায়। আর এই সব ধারের টাকায় এমন মাধুর্য, হাতে পেলেই সব রাজা, যেন. যাক একটা রাহাজানি বেশ তালের মাথাতেই করা গেছে, এবার দেখা যাক, কদ্দুর কী করা যায়, এখন তো রপোর্ট হোক। তা হোক এবার আমরা পেছনে লাগলাম, 'কই কী হচ্ছে মশাই' এই বলে গেঁাফে তা দিতে দিতে, (বেড়ালের গোঁফ, তা দেবার উদ্দেশ্য সবাই জানে) অনেকটা যাকে বলে, ইঁদুরের পেছন পেছন ঘোরা। 'কই কী হচ্ছে মশাই' এই চলল খালি, আর পার্টি বেগতিক দেখে, হাতে কিছু গুঁজে দেয়, যাতে কোন রিপোর্ট না হয়, ওদিকে একটা মিছিমিছি খেলনা সাজাবার চেষ্টা হতে থাকে, কিন্তু 'কই, কী' হচ্ছে মশাই' থামছে না, আবার কিছু গুঁজতে হয়, আর তাড়াতাড়ি, খেলনা কী ভাবে ভেঙে যায়, অর্থাৎ আপ্রাণ চেষ্টা করেও লোকটা যেন কিছুতেই তার কাজে কৃতকার্য হতে পারল না, বেচারী অবিশ্যি কিছু ভুল ত্রুটিও করে ফেলেছে, খানিকটা অনভিজ্ঞতার দরুন বেজার লস্ দিয়ে এখন একেবারে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, এমনিভাবে সমস্ত ব্যাপারটা, যাকে বলে উদ্ঘাটিত হয়। তেমন ফেরে পড়লে, মামলা মোকদ্দমা শাস্তি সবই হয়ে যেতে পারে, সবই নির্ভর করে, লোকটা নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারল কি না, (প্রমাণ একটা চাই, হুঁহুঁ বাবা, ছেলেখেলা নয়) না পারলে (মূর্খ ! যাও মরো গে !) আমরা তো ধোয়া তুলশীপাতাটি হয়ে আছি, ঠাকুরের পায়ে নয়, গাছে। বাঁচাবার চেষ্টা-চরিত্র যে করি না তা নয়। বেগতিক দেখলে দাও পুছিয়ে, তারপরে ভাজার মাছটি ধরে কেবল নাড়াচাড়া, ওলটাতেও পারি না মাইরি। আমরা কী করব, কী-ই বা করার আছে, যা করার তাই করি। অবিশ্যি অনেক একগুঁয়ে মালও দেখেছি। একটা কিছু সার্থক দাঁড় না করিয়ে ছাড়ে না, তাদের আবার আমি বুঝতে পারি না কী ধাতু দিয়ে গড়া, যদিও জানি এ ধরণের মাল আরো মারাত্মক, কারণ বুঝতে পেরেছে, একবার যদি কিছু একটা দাঁড় করাতে পারি, তাহলে, অনেক দূর যাওয়া যাবে, অনেক উঁচুতে উঠা যাবে, তারপর যত খুশি র‍্যালা কর, কেউ বলবার নেই। তখন সেও সেখানে রুবি দত্ত যাদের হাতে রাখতে চায়। তার মানে এই লোকটা জানে, ওপরে ওঠবার মইয়ের কোথায় কোথায় পা রাখতে হবে, কোথায় পা দিলে পড়ে যেতে হবে না, যাকে বলে, টাকা খালি খাবে না, টাকা তৈরীও করবে, এবং টাকা যে তৈরী করতে পারবে, তার কাছে সবাই টিট, জগৎ

বশ। এক মালকে জানি, তাকে আট লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, সে এখন পাঁচ কোটি টাকার সম্পত্তি তৈরী করেছে। একটা কারখানার জমির জন্যেই নাকি সে তিনটে লোককে খুন করিয়েছিল, (শালা পায়ে পড়তে ইচ্ছে করে, মাইরি!) নিজের এক সত্‌ভাইকে ভিখিরি করে দিয়েছিল, (অনেকটা আমার বাবার মত, জগদীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইয়েদের, মানে আমার কাকাদের পয়সা কিছু মেরেছিলেন, তবে ভিখিরী করতে পারেননি, উনি অবিশ্যি বলেন, সব বাজে কথা, পিতৃ সম্পত্তি সবাই সমান ভাগ করে নিয়েছি।) বোধহয় তার কিছু টাকা ছিল, এবং নিজের মেয়েকে পরের হাতে তুলে দিয়েছিল। পরের হাতে তুলে দেবার মানে অবিশ্যি আমি বুঝি না, কারুর না কারুর হাতে সে নিজেকে তুলে দিতই, এ ক্ষেত্রে হয়তো বাপের কথা অনুযায়ী অন্যান্যদের হাতে তুলে দিয়েছিল, তা সে বিয়ে করলেও তাই দিত, এখন লাভ হয়েছে এই, সে এখন যার হাতে খুশী নিজেকে তুলে দিতে পারে। দিয়েও থাকে। যেটা সে বিয়ে হলে পারত না, মনে মনেই রাখতে হত, এখন বরং তার আর সে সব ভয় নেই। সে সম্পত্তি ভোগ করছে, গাড়ি চেপে বন্ধুবান্ধবী নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, জানে বাপ তাকে কিছুই বলবে না, বলতে পারবে না। হয়তো পাঁচ কোটির আরো কোন রহস্য মেয়ের জানা আছে। বাপের হাত পা বাঁধা, একমাত্র খুন করে ফেলতে পারে। তারই বা দরকার কি, যা হচ্ছে হোক না, টাকা থাকলে আবার দুর্নাম কিসের। আগেকার লোকদের নাকি আবার টাকা পয়সা থাকলে, যেরকম মান-মর্যাদা হত, তাতে, তাদের বাড়ির মেয়েরা বাইরে কিছু করে বেড়ালে ইজ্জত যেত। যাই হোক, এ রকম লোকও দেখা গিয়েছে, যে সত্যি একটা কিছু দাঁড় করিয়েছে, দশ লক্ষকে পাঁচ কোটিতে তুলেছে।

এখন, এই যে হরলাল ভট্টাচার্য নামক লোকটি, (দুঁদে মাল) এ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে কয়েক লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই নিয়েছে, এখন যেটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, কিছুই করেনি আর এ বিষয়ে তদন্ত করবার জন্যে আমাকেই পাঠানো হয়েছিল। লোকটা তো কলকাতাতেই বসে আছে, 'কই কী হচ্ছে মশাই' বলে যতই খোঁচাচ্ছিলাম, ততই যেরকম তড়পাচ্ছিল, তাতে প্রায় বিশ্বাস করেই নিয়েছিলাম, বোধহয় আর একটা পাঁচ কোটির খেলা দেখাবে, কিন্তু (গাড়িটা অফিসপাড়ায় ঢুকল, মানুষের ভিড় বাড়ছে।) তার কোন উদ্যোগ

আয়োজন দেখছিলাম না। সবই প্রায় কাগজ পত্রেই চলছিল, যত রকমের ব্যয় ও লেনদেন, তার কোন, যাকে বলে প্রত্যক্ষ বা বাস্তব, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। একেবারে ওপরের কর্তাদের টনক না নড়লেও, বিভাগীয় কর্তাদের অর্থাৎ অফিসারদের এবং ডিরেক্টরদের টনক না নড়ে উপায় ছিল না, কেন না, পরে তারা বেকায়দায় পড়ে যাবে, 'তুমি তোমার কাজে গাফিলতি করেছ কেন? তুমি কেন নিয়ম অনুযায়ী, কতদূর কী হচ্ছে, রেগুলার ইনভেস্টিগেট করা, রিপোর্ট দেওয়া ইত্যাদি করনি' তাকে এই বলে দায়ী করা হবে, এবং তার মাথায় শাস্তি নেমে আসবে। অতএব, আমাদের চুপ করে বসে থাকার উপায় ছিল না, শুধু যে কাজের দায়িত্বেই, তা নয়, ওসব দায়িত্ব টায়িত্ব থোড়াই কেয়ার করি, যা দেখব বুঝব তাই রিপোর্ট করা এ্যাকশন নেওয়া চালিয়ে তো যাবই, আরো বসে থাকার উপায় ছিল না, লোকটা কোন রকমে উপুড়হস্তই করছিল না, অর্থাৎ মাল-কড়িও ছাড়ছিল না কিছু! ওর যা হবার, তা তো হবেই, আমরা ফাঁকে পড়ি কেন, এই হল আমাদের কথা। অতএব 'কী হচ্ছে মশাই' আর নয়। 'কঙ্কুর কী করছেন, একটু দেখান' এই নিয়মেই চলতে হচ্ছিল এবং দেখা যাচ্ছিল বেশ ভাঁটের সঙ্গে প্রায় হুটআউট করে দিচ্ছিল। আমার তো মনে হত, ও আমাকে প্রায় একটা কুকুরের বাচ্চার মত দেখত, কাগজপত্র দেখাত, যেন দয়া করে দেখাচ্ছে, এবং কতক্ষণে ওর ওখান থেকে চলে আসব, তাই ভাবত। শালুক চিনেছে...যাই হোক তারপরে হিসাবপত্রের ফিরিস্তি নিয়ে, কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে, একেবারে প্লটে, যাকে বলে অভিযান চালালাম, এবং সেখানে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, ওখানে অনেক লোকই একটা কারখানা হবার আশায় অনেকদিন ধরে হা পিত্যেশ করে রয়েছে, এমন কি অনেকে ওখানকার কারখানায় কাজ পাবে, এই সিদ্ধান্ত হওয়ায় অন্য জায়গায় তাদের কাজেই নেওয়া হয়নি, কারণ তারা যখনই বলেছে, তারা অমুক জায়গা থেকে এসেছে, তখনই তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, লোকাল ফ্যাক্টরীতেই (তা যবেই হোক, উল্লুক!) তাদের কাজ নিতে হবে। ওখানকার লোকেরাই আমাকে দেখাল, বিঘে তিনেকের মত জায়গা কেনা হয়েছে, যেখানে মিনিমাম আট বিঘের কথা, (টাকা পেলে তাই কিনবে কথা ছিল) কিন্তু করোগেটের টিন একটি টালির ছোট ঘর, হাজার পাঁচেক ইঁট এক জায়গায় থাক দেওয়া যাতে

PUTO PORITRA
WEL COME

অন্তত বোধহয় দুটো বর্ষাই গিয়েছে, এত শ্যাওলা পড়েছে, ব্যস, লোকটার নিজের টাকার হিসেব তো অনেক দূরের কথা, আমাদের কয়েক লক্ষ টাকার দশ হাজারের মালও সেখানে ছিল না। আরো জানা গিয়েছিল, ওখানে জমির মূল্য কম, সাত আটশো টাকা বিঘে, যেটা কম করে তিন চার হাজার টাকা করে দেখানো হয়েছে।

যাই হোক, আমি তো সমস্ত রিপোর্ট ঠিক করে, আমার চীফ্-এর পরামর্শে আর একবার লোকটার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, আর তা-ই বা কোথায়, নিশ্চয় সেটা কোন ফ্যামিলি কোয়ার্টার না, কতগুলো ঝিস্‌ঝিসে ঝুঁড়ি, এদিকে ওদিকে ঘুরছিল মাত্র ঘেঁষা বড় বাড়িটার, যেটাকে বাগান বাড়ি বললেই বোধহয় ঠিক হয়। (জানা গিয়েছে, ব্যাপারটা ঠিক তাই, মহাশয় একটি হারেম নিয়েই আছেন ওখানে, তাও,আবার কী সব আশ্রম-টাশ্রমের নাম দেওয়া আছে) কারণ ঝুঁড়িগুলোর ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, খাটের গন্ধ আর চলাচলির ছাপ ওদের গায়ে। যাই হোক, ওতে আমার পিতৃদেবের আপাততঃ কিছুই যায় আসে না, কিন্তু মহাশয়ের দেখা যখন পেলাম, এবং তদন্তের মোটামুটি ফলটা যখন (দুঃখের সঙ্গে, ইট ইজ রিগ্রেট টু.....) তুলে ধরলাম, তখন দেখি, আমাকে তাড়া করে আসে। সত্যি বলতে কি, লোকটাকে তখন আমার সাহসী, যাকে বলে বাহাদুরের বাচ্চা বলে মনে হচ্ছিল, ফিরে এসে তখনি আমার চীফকে প্রথম শ্রেণীর অফিসার একজন, তাঁকে সবই বললাম। তারপরে, সবাই অর্থাৎ যে সব অফিসারেরা এ কেস্‌টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা সবাই স্থির করলেন, ডিটেল রিপোর্ট'টা আমি সাবমিট করে দেব খোদ কর্তার কাছে, এবং লোকটার ব্যবহার ও অসততার (আমি লিখেছি, একটা রিয়্যাল সৎ ও নিষ্পাপ একজন অফিসার ওহো!) বিষয়ে সব জানিয়ে, তার শাস্তির জন্যেও মতামত জানাব। স্থির করা মাত্র আমি তাই করলাম, তদন্তকারী অফিসার হিসেবে, লোকটা যে টাকা নিয়ে প্রায় ছিনিমিনি খেলছে, (কেন রে খচর, আমাদের কিছু ছাড়লেই পারতিস) কারণ বছর খানেকের ওপর টাকা ব্যয়ের কোন হিসেবই দেখাতে পারছে না, এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, তাকে অকারণে নাজেহাল করা, সমস্ত বিষয়ে, যাকে বলে, নিখুঁত করে লিখে, বিরাট এক রিপোর্ট, সইসাবুদ করে, এবং রিপোর্ট'টা যে পেশ করেছি, সে জন্যে আর সুপিরিয়রদের

মতামত নিয়েছি, এটা জানবার জন্যে নিরমমত, তাদের সই করিয়ে, খোদ কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

পাঠিয়ে দিয়েছি, মানে মাসখানেক আগে দিয়েছিলাম, আজ দেখছি লোকটা হঠাৎ কোথায় কোথায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে, দেশে দেশে শিল্প গড়তে হবে, দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ (তার মানে, আরো কয়েক লক্ষ টাকা বোধহয় চায়) হতে হবে, ইত্যাদি। ইতিমধ্যে গাড়ীটা অফিস বিল্ডিং-এর সীমানার মধ্যে ঢুকল, আমি কাগজটা ভাঁজ করে চ্যাটার্জির হাতে তুলে দিলাম। গাড়ী দাঁড়াল নেমে, গিয়ে দু জনেই লিফ্‌ট-এ উঠলাম এবং লিফ্‌ট-এ চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম বুঝলেন ব্যাপারটা?'

'ধড়িবাজ ব্যাটা।'

চ্যাটার্জির চোখ সেই সামনের দিকে, যেন আমার ভারবউ, তাকালেই চিত্তির। লিফ্‌ট থামল। বেরিয়ে গিয়ে ডিপার্টমেন্টের করিডর দিয়ে দু'জনেই এগিয়ে চললাম, এবং অফিসের কেরানীকুল যে কেউ কেউ দেখছে সে বিষয়ে আমি সচেতন, 'শালা এল' ঘটাকে রূপ দেখাতে এল', 'মারব একদিন লেংগি শালাকে' এসব কথাবার্তা যাকে বলে মনোরোচক আলোচনা যে হচ্ছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই, এবং চ্যাটার্জির সম্পর্কে নিশ্চয়ই, 'শালা বুড়ো আজ একেবারে এলিয়ে পড়েছে রে' 'ছুটির রসোটে আসক্ত হয়ে গেছে এই রকম কথাবার্তা (হয়তো এ সবই, যাকে বলে অবসন্ন কর্মচারীদের বিক্ষোভের রকমফের) চলছে।

চ্যাটার্জি তার চেম্বারে ঢোকবার আগে, (সেই না তাকিয়েই) আবার বললেন, ধড়িবাজ তো বটেই কিন্তু মতলবটা.....।'

আমি বলে উঠলাম, 'রিপোর্টের ফলটা বোধ হয় ফলেছে, তাই একটা কোন ওয়ে আউট খুঁজছে।'

চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকালেন, আর লোকটার চোখ এত বিচ্ছিরি সাদা, ঠিক মনে হল যেন, যখন্তে সাদা কুষ্ঠির মত, যেদিকে তাকিয়ে থাকতে আমার গায়ের মধ্যে কী রকম করে, যদিচ তার মধ্যে কোন তীক্ষ্ণতা নেই, অথচ যেন কী একটা আছে, যে কারণে আমি চুপ করলাম। চ্যাটার্জি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন, একটা শব্দ করে গেলেন, 'হুম্'

'হুম! ইডিয়েট!' এই বলতে বলতে আমি আমার চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং সত্যি আমার আবার নীতার কথা মনে পড়ল, আর কনুয়ের কাছে, যাঁ কনুয়ের কাছে হাত চলে গেল, যেতেই আমি প্রায় যেন, নীতার নরম গলাটা অনুভব করলাম। চেম্বারে ঢুকতে যাবার আগেই, বেয়ারা আমাকে সেলাম করল, রোজই করে, আর রোজই একবার ঘাড়টা যেভাবে কোয়ার্টার ইঞ্চি না নাড়ালে নয়, তাই নাড়িয়ে চেম্বারে ঢুকলাম, টেবিলে ঢাকা দেওয়া জল আগেই খেলাম, খেয়েই লেভেটরিতে, প্রায় মিনিটখানেক, বেরিয়েই, আগে এক কাপ কফির অর্ডার করলাম, তারপরে—নাঃ ফোন বেজে উঠল, (শালা!) তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যালো—স্পীকিং ও গুডমর্নিং স্যার, (ব্রাডি চীফ!) ইয়েস স্যার, জাস্ট নাউ, (কি হল, ডাকে কেন?) ও, ইমিডিয়েটলি স্যার।'

কী হতে পারে? চীফ, মানে মিঃ বাগ্‌চি আমাদের সকলের মাথার ওপরে, অনেকটা যাকে বলে ক্যাচাখেকো দেবতা, অফিসে আসতে না আসতেই ডাকছে কেন? লালবাজারের কেউ এসে ওখানে বসে আছে নাকি, কিছু প্রমাণপত্র হাতে নাতে পেয়ে গিয়েছে নাকি, এখান থেকেই একেবারে শ্রীঘরে নিয়ে যাবে? চট করে লেভেটরিতে ঢুকে, আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নিলাম, ঠোঁট চেপে, ভুরু কুঁচকে দেখলাম, একবার চোখ মারলাম, তারপর চালাও পানসি, দেখা যাক কী হয়। বেরিয়েই চীফ-এর দরজা ঠেলে, তবু একবার বললাম, 'মে আই—।'

'ও ইয়েস, কাম কাম, সীট ডাউন প্লীজ।'

যাক লোকটা একলা, ঘরে আর কেউ নেই, এখন একমাত্র যদি ওঁকে লালবাজার থেকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে, সেটা আলাদা। কিন্তু চীফ যে এটা সেটা নিয়ে অকারণ দেরী করছেন, সেটা যেন আমার কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে, যার থেকে মনে হয়, যা বলতে চান, সেটা বলতে কোথাও আটকাচ্ছে, যার জন্যে মনে হচ্ছে গুরুতর কিছু। বলে ফেললেই তো হয় বাবা, অত ভানতারা কিসের, আমার তো সাফ জবাব আছেই।

'হুঁ, কথাটা হচ্ছে, হরলাল ভট্টাচার্যের কেস্‌টা একটু অসুবিধের ফেলেছে।'

ও এতক্ষণে বোঝা গেল, চ্যাটার্জি কেন বারেবারেই বলেছিলেন, 'কিছু বুঝলেন?' কিন্তু কি অসুবিধের ফেলেছে, সেটা না জানলে, কিছুই বলতে

পারছে না, কারণ আমাদের কি অসুবিধায় পড়তে হতে পারে, আমি এখনো ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। যতদূর মনে আছে, হরলাল ভট্টাচার্যের ব্যাপারটা ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারলে, আমার এফিসিয়েন্সির জন্যে, একটা কিছু জাম্প হতে পারে, অর্থাৎ চাকরীতে উন্নতি হতে পারে, এই রকম কথাবার্তা আমার সুপিরিয়াররা বলেছিলেন। কিন্তু চীফ-এর মুখটা তো দেখছি বাংলার পাঁচের মত দেখাচ্ছে, যেন মোটেই স্বস্তি নেই, সুখ নেই, খুব বেকায়দায় পড়ে গিয়েছেন। জানিনা শরীরের কোন অংশে ফোঁড়া হয়েছে কি না।

বললাম, 'অসুবিধে? মানে আমার দিক থেকে কোনরকম—?'

'উম্‌?'

চীফ যেন জিজ্ঞাসা করছেন, (আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবার কী আছে, লোকটা ন্যাকা নাকি?) এমনি একটা শব্দ করে বললেন, 'উম্‌ না—মানে, তোমার রিপোর্টটা, যেটা তুমি হরলাল ভট্টাচার্যের নামে করেছ, এ্যাজ এ্যান ইন্‌ভেস্টিগেটর, সেটা উইদড্‌ করতে হবে।'

'উইদড্‌?'

'হুঁ, ফাইলটার খোদ কর্তার সই হয়ে বেরিয়ে এসেছে, তুমি জান, যে জন্যে তিনি এখন হাত কামড়াচ্ছেন।'

'হাত কামড়াচ্ছেন?'

'হাঁ, কারণ এ দপ্তরে গতকালই ওটা প্রচার করা হয়ে গেছে, শুধু তাই নয়, দুর্নীতি বিরোধী সংঘের কাছে তার কপি চলে গেছে।'

'সে তো আমি জানি, মানে, আমরা সবাই জানি।'

'জানি, কিন্তু ভুল জানি।

'ভুল জানি?'

'হুঁ, ভুল, মানে ভুল, বুঝলে না, আমি তোমাকে ঠিক কী বলব—।'

লোকটা আমার কাছে প্রায় একটা খচ্চর হয়ে উঠেছে, সেটা তো বরাবরই, এখন অনেকটা অমায়িক খচ্চর হয়ে উঠেছে, যার কোন মতলব বোঝা কঠিন, অর্থাৎ নিশ্চয়ই বেকায়দার একটা কিছু ঘটেছে, যেটা ঠিক লোকটার, যাকে বলে এই অত্যন্ত শান্তভাব, নীচু হয়ে যাওয়া গলার স্বরের সঙ্গে মিলছে না। তার থেকে অনেক কঠিন, খারাপ ভয়ংকর কিছু একটা ঘটেছে, অথচ

সেটাকে চেষ্টা করা হচ্ছে, যেন তেমন কিছুই নয়, প্রমাণ করা। কেস্‌টা দপ্তরে প্রচার করা হয়েছে, সেটা সবাই জানে, দুর্নীতি বিরোধী সংঘের কাছে (কার দুর্নীতি কে সামলায়। ক্ষমতাবান হলে কোন নীতিই তাকে ছুঁতে পারে না। কেস্‌টা গিয়েছে, সেটাও সবাই জানে, কিন্তু খোদ কর্তা আঙুল কামড়াচ্ছেন, (সর্বনাশ আর দেখতে হবে না, একটা দারুন কিছু ঘটেছে নিশ্চয়।) এবং গোটা ব্যাপারটা ভুল, তার মানে কী? যেন ভাবটা হচ্ছে, হাত থেকে তীর, তীর আর এখন কোথায়, বুলেট ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সেটা ভুল হয়েছে।

চীফ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাত্রি দশটা নাগাদ কোথায় ছিলে?'

এই মেরেছে, আবার এ কথা জিজ্ঞেস করছে কেন? নিশ্চয়ই এ ভুলের সঙ্গে গতকাল রাত্রের কোন যোগাযোগ নেই। ফেরেববাজী হচ্ছে নাকি আমার সঙ্গে?

বললাম, 'একটু আড্ডা দিতে গেছলাম।'

'বাড়িতে তোমাকে কিছু কেউ বলেননি?'

বাড়িতে? লোকটা যেন সাবলাইম গঞ্চর হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে, কী বলতে চায়, আবার বাড়ির কথা কেন? নিশ্চয়ই কাল রাত্রের কথা বাড়ির কেউ জানে না, এবং এই মুহূর্তে বাড়ির সকলের মুখগুলো আমি একবার মনে করার চেষ্টা করলাম, খুঁজে দেখতে চাইলাম, মুখগুলোতে এমন কোন ভাব ছিল কি না, যেন সবাই একটা কিছু জানে আমার সম্পর্কে, একটা কিছু বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। কিন্তু না, সেরকম কিছু তো আমার মনে পড়ছে না।

বললাম, 'কই, না তো?'

'আমি তোমাকে বাড়িতে কাল রাত্রে ফোন করেছিলাম।'

'ও, তাই নাকি, একসট্রিমলি—।'

'কিন্তু না পাওয়াতে আজ সকালের অপেক্ষাতেই ছিলাম। আজ সকালে পেপার দেখেছ নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, হরলাল ভট্টাচার্যের ইণ্ডাস্ট্রির ওপরে লেকচার—।'

'হ্যাঁ, খুব জ্ঞানী লোক, বুঝলে, হি ইজ এ ট্যালেণ্টেড ম্যান, জীনিয়স, এ প্যাট্রিয়ট, এ সাফারার।'

চীফের বোধহয় গলাই ভিজে গেল না কি, কথা আটকে গেল, অথচ যাকে

আমি একটা নিকৃষ্ট শুয়োর বলেই জানি, মানে যাকে বলে পরিচয় পেয়েছি, এবং আমার সঙ্গে সকলেই এমন কি এই সাবলাইম গঞ্চর ব্যক্তিটিও একমত ছিল, সে হঠাৎ এসব কথা আমাকে বলছে কেন? নিশ্চয় আমার সঙ্গে ইরারকি করছে না যে, একটা চোরকে ট্যালেণ্টেড, একটা শয়তানকে জীনিয়স—অবিশ্যি আমিও একটি রামউল্লুক নিশ্চয়ই, তা নইলে চোরকে শয়তানকে, ট্যালেণ্টেড জীনিয়স বলা যাবে না, এসব ভাবছি কেন। কত রামগাড়লই ওসব, কী বলে, 'বিসেসনে ভূসিত' হচ্ছে, তা কি আর দেখতে পাচ্ছি না।

চীফ আবার মুখ খুলল, 'এখন কথা হচ্ছে, হরলাল বাবুর সম্পর্কে আমাদের রিপোর্টটা, মানে তোমার ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্টটা, যাকে বলে, ভুল হয়েছে হি ইজ এ গ্রেট ম্যান, (বাস্টার্ড আমার উক্তি।) তার সম্পর্কে আর একটু কীন,- মানে, কনসাস,—অর্থাৎ এলার্ট হওয়া উচিত ছিল, মানে আমাদের সকলেরই উচিত ছিল। প্রচার করা না হয়ে গেলে, ওটা তো তখনই চেপে দেওয়া যেত, কোন ঝামেলাই ছিল না, এখন, আর একটা রিপোর্ট লিখে, মানে ফারদার ইনভেস্টিগেশনে তুমি যেন আসল খবরটা জানলে, এভাবেই হরলালবাবুর উপর থেকে চার্জগুলো তুলে নিতে হবে, মানে উইদড্র যাকে বলে, আমার কথাটা।—'

টেলিফোনটা বেজে উঠল, চীফ ধরলেন, 'ইয়েস স্পীকিং, ইয়েস ইয়েস, দ্যাটস্‌ অল রাইট, হি উইল সী ইউ ইমিডিয়েট্‌লি।'

রিসিভারটা রেখে তিনি ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন, 'তোমার চেম্বারে কে একজন জরুরী কারণে দেখা করার জন্য বসে আছে। ওটা সেরেই, তুমি আবার আমার এখানে চলে এস, কী ভাবে উইদড্র করা যায় সেটা আলোচনা করা যাবে, আই লাইক টু হেল্‌প ইউ, মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে আমি কথা বলছি, মিঃ ঘোষকেও ডাকছি।'

আমি উঠলাম, এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম, সেটা আমার মাথায় এখনো পুরোপুরি ঢুকবে ঢুকবে করেও ঢুকতে চাইছে না, যদিচ, (আমি যেন নিজের সঙ্গে চালাকি করছি।) ব্যাপারটা তো জলের মতই পরিষ্কার বলে বোধ হচ্ছে। হরলাল সম্পর্কে যে রিপোর্টটা করা হয়েছে, অর্থাৎ যা আমি উগ্‌রে ফেলেছি, (বমি করার মত তিক্তভাবেই আমি সব উগ্‌রে দিয়েছি।) তা আবার আমাকে অন্তের মত চেটে চেটে গিলতে হবে। এবং—।

'একটা কথা—'

দরজার কাছ থেকে ফিরে তাকালাম। চীফ বললেন, কাল পরশুর মধ্যে কোন বিজনেস করনি তো?'

বিজনেস, অর্থাৎ ঘুষ খাওয়ার ওটাই আমাদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। করিনি বলেই যতদূর মনে হয়, অবিশ্যি কাল পরশুর সব কথা ভেবে এখন সেটা বের করতে গেলে আমার অনেক সময় লেগে যাবে। নীতার কথাটা এখনো আমার মনে আছে, মনে হয় ওটা ভুলতে দু-একদিন সময় লাগবে, বাদবাকী অনেক কথাই এখন আর মনে নেই।

বললাম, (যেন একটু লজ্জাই পেয়েছি, এমনিভাবে; এখন আমার নিজেকেই সাবলাইম বলে মনে হচ্ছে।) 'না তো।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে, ঘুরে এস।'

বেরিয়ে এলাম, কিন্তু আবার এ কথা জিজ্ঞেস করল কেন বুঝতে পারলাম না। এখন কি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে, অর্থাৎ ভাবিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না, কারণ বিজনেস, যদি কিছু হত, তাহলে চীফও নিশ্চয় জানতে পারত, তাকে ফাঁকি দিয়ে মালকড়ি গেলা অসম্ভব। অবিশ্যি কোন সময়েই যে, (আমার চেম্বারে ঢুকলাম, একটা লোক বসে আছে। হাত তুলে নমস্কার করল, আমিও জবাব দিলাম হাত তুলে।) তা গিলিনি, এমন বলা যাবে না, তবে খুবই সাবধানে, যা কখনই এখানে খবর আসবে না, যেহেতু জানি, তা হলে ঘরের শত্রুই বিভীষণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু শীত আর আমার লাগছে না, তাই কোটটা খুলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে টাই-টা একটু টেনে দিলাম, এবার অপেক্ষমান লোকটার দিকে ফিরে তাকালাম, যার মাথায় একটি বেশ বড় টাক, গোল মুখখানি বেশ ফুলো ফুলো, অনেকটা খোকা খোকা ভাব, কালো চোখ দুটি বেশ চকচকে, (পাকস্থলীটা বোধহয় তাজা আছে এখনো, কি খেয়ে!) যাকে বলে এক একটা গাল ফুলো গম্ভীর মুখে বাচ্চা যেমন থাকে, মুখে বিশেষ ভাব থেলে না, কিন্তু চকচকে চোখ দিয়ে সবই কৌতূহলীত হয়ে দ্যাখে, সেইরকম। নিরীহ গোবেচারা গোছেরই, গরম কাপড়ের সার্টটা গলা অবধি বন্ধ, কিন্তু টাই বাঁধেনি, কোট নেই, পেটের অনেকখানি উঁচুতে, বেল্ট দিয়ে ভুরি বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। আমি,

স্বভাবতই যা করে থাকি, ভুরু টান টান করলাম, মুখে একটি গম্ভীর অমায়িকতা টেনে আনলাম, টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল ধরে কাছে টেনে নিলাম, (খালি তো।) এবং তার ফিতে (লাল নয়) খুলতে খুলতে বললাম, 'বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।'

দুনিয়ার জন্য সবকিছু করবার জন্যেই যেন এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশ হয়ে বসে আছি, আর লোকটা নিশ্চয়ই কোনরকম কাজের জন্যেই এসেছে, যা এ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পড়ে।

লোকটা বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, কিন্তু আমার না এসে উপায় ছিল না।'

এ আবার অন্যরকম পাওনা ধরে দেখছি। আমি ব্যস্ত কি না, সেটা আমার কাছেই থাক, তোমার কি দরকার সেটা বলে এখন কাটো দিকিনি চাঁদ। কিন্তু লোকটার গলা অদ্ভুত মোটা, কার যেন ওথেলোর পার্ট এরকম গলায় শুনেছিলাম, মনে হচ্ছে। তবু বলতে হয়, 'তাই নাকি কি ব্যাপার বলুন।'

লোকটা সেইরকম, অনেকটা যেন নরকের সিপাইদের মতই, সেইরকম মোটা গলায় বলল, 'আমি আসছি, আপনার গিয়ে, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে, একটা ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব এসেছে আমার ওপর, তাই আসতে হল।

'ওরে শালা, এই কথাটাই প্রথম আমার মনে হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'সাবধান। এই বলে আমি নিজেকে হুঁশিয়ার করে দিলাম, আর তৎক্ষণাৎ মুখের ভাব, সেটা এখন আমার স্বাভাবিকভাবে রক্ষা করা উচিত, অর্থাৎ অফিসারদের মতই, নিতান্ত সামান্য একটু কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নয়, এমনিভাবে, যাকে বলে ঈষৎ ভুরু কুঁচকে তাকালাম। চীফ যে কেন কাল-পরশু কোন বিজনেস হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলেন, এখন বুঝতে পারলাম, যার মানে, আমার ঘরে যে ইনটেলিজেন্সের লোক বসে আছে, সেটা উনি টেলিফোনেই খবর পেয়েছিলেন। আমি লোকটার দিকে আবার ভাল করে তাকালাম, চেহারা দেখে কিছুই বোঝবার উপায় নেই, মালের আগমন কোথা থেকে।

অনেকটা অবাক হবার মতই জিজ্ঞেস করলাম। 'কী ব্যাপার বলুন তো, আমাদের অফিসের ব্যাপারে—।'

'না, না, লোকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, (আরে সে তো আমিও জানি-

তুমি আর কি বলবে।) আপনাদের অফিসের ব্যাপার কিছু নয়, আমি আপনাদের কাছেই এসেছি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে একটু সময় আমাকে দয়া করে দিতে হবে।'

দয়া করে? তুম্‌বো মুখখানি দেখে, এমনি কিছু বোঝা না গেলেও, মাস বেশ ফেরেববাজ আছে, বোঝা যাচ্ছে, বলছে দয়া করে। তুমি ঘুঘু ধরার জন্যে ফাঁদ পাততে এসেছ, তবুও মুখের বুলিটি ছাড়নি।

বললাম, 'কিন্তু সেটা না শুনলে তো কিছুই বলতে পারছি না, আমার আবার আজকেই একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে, সেটা ইমিডিয়েটলি সুপিরিয়রদের সঙ্গে বসে ফয়সালা করে ফেলতে হবে। (একটু হাসলাম) মানে আমিও একটা ইনভেস্টিগেশন নিয়েই গোলমালে পড়ে গেছি। তবু আপনার কথা আমি নিশ্চয়ই শুনব, আমাকেই যখন আপনার জিজ্ঞাসাবাদের দরকার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকেই মানে আপনার কাজের ক্ষতি করে...।'

লোকটা ওসব অনাবশ্যক কথাবার্তা বলে যেতে লাগল, আমি ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে। অর্থাৎ আমার দিকে কতখানি গড়িয়েছে, সেটা আমার জানা দরকার। আন্দাজী ঢিল মারতে এসেছে, নাকি ডেফিনিট কিছু পেয়েছে।

বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি বলুন, বিষয়টা কী শুনি।'

'বিষয়টা স্যার একটা খুন।'

'খুন? (সে তো জানিই, তবু আমাকেই তো সব থেকে বেশী অবাক হতে হবে।) কে, কোথায়?'

'সেন্ট্রাল ক্যালকাটা,—নং বাড়ির সাত নম্বর এ্যাপার্টমেন্টে—।'

লোকটাকে কথা শেষ করতে দিলাম না, (হওয়া উচিত আর কী) বলে উঠলাম, 'বলেন কী ওটা আপনি যা বলছেন, নীতার এ্যাপার্টমেন্ট।'

'নীতা রায়।'

হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না, সে আমার, কী বলব আই মীন—।'

প্রেমিকা, সেটাই বলা দরকার, কারণ (সে যদি মরেই থাকে আহা।) আমি তো তাকে খুন করতে পারি না।

লোকটা গম্ভীর হয়ে, কী জানি ব্যথিত হয়েই কিনা, মুখটা নামিয়ে রাখল একটু এবং সেভাবেই বলল, 'জানি ওর সঙ্গে আপনার খুবই সদ্ভাব ছিল, উনি কাল রাত্রে ওর ঘরে খুন হয়েছেন।'

'খুন? নীতা খুন?

আমি প্রায় চীৎকার করেই উঠলাম, (কী জানি লোকটা এর পরে বলবে কি না, আর সেটা আপনিই করেছেন।) ঠিক যেভাবে আচমকা ভয়ে দুঃখে অবাক হয়ে, যাকে বলে, আর্তনাদ করে উঠতে হয়, তাই করে উঠলাম, হাউ, হু—হু ডান ইট?'

ইনভেস্টিগেটর ওর ফুলো ফুলো মুখে একরকমের সমবেদনা বা সান্ত্বনার হাসি ফুটিয়ে তুলতে চাইল, বলল, 'সেটা জানবার জন্যেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, 'কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না মশাই।'

'যা জানেন, তা বললেই হবে, অর্থাৎ (লোকটা এখন ঠিক গিরগিটির মত আমার দিকে তাকিয়ে আছে।) মিস রায় সম্পর্কে যা জানেন, তা বললেই হবে, যাতে কিছুটা সাহায্য হয়।'

'নিশ্চয়, কী ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন, ওর সম্পর্কে, আমি যা যা জানি, সবই আমি বলব।'

'আচ্ছা, মিস, রায়ের সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছে, মনে করতে পারেন কি একটু?'

'তা হবে দিন দশ বারো, কিন্তু একটা কথা, কী ভাবে ও খুন হয়েছে?

'দম বন্ধ হয়ে, মানে, এখনো পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এসে পৌঁছায়নি, তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দম বন্ধ করেই মারা হয়েছে।'

আমি নিজেই একটা কষ্টের ভাব করে, যেন সেই বিভীষিকা দেখছি, এমনিভাবে চুপ করে (কথা বলতে পারছি না আহা।) রইলাম, যদিচ, আমার চোখের সামনে গত রাত্রের, ঠিক দম বন্ধ হওয়ার মুহূর্তটাই ভেসে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ আমার তলপেটের খামচানো জায়গাটা সুড়সুড়িয়ে উঠল। নিশ্চয়ই আমার ও জায়গাটা দেখতে চাইবে না সেখানে এখনো দাগ রয়েছে।

'আপনার সঙ্গে কি কাল ওঁর দেখা হয়েছিল?'

দেখেছ, জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিটা দেখেছ লোকটার, (খচচর !) যখন আমি বলছি, দশ বারো দিন আগে দেখা হয়েছিল, তখন আবার কাল দেখা হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করবার মানে কী? দেখে থাকলে বলে দাও না বাপু ব্লেড হাণ্ড হলে স্বীকার করে ফেলব, এ আর বেশী কথা কী।

বললাম, 'তাহলে তো আপনাকে বলতামই।'

লোকটা যেন বিব্রত হল, বলল, 'না, তবু একবার জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। আচ্ছা আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'আমার—?'

'হাঁ, মানে আপনার সঙ্গে তো ওঁর খুবই, যাকে বলে ইয়ে ছিল, (পীরিত ছিল, বল না বাবা!) আপনাকে হয়তো কখনো কিছু বলে থাকতে পারেন।'

'কী বলে থাকতে পারে?'

'এই ধরুন, বিশেষ লোক ওঁর প্রতি খারাপ ব্যবহার করে, খুনের ভয়-টয় দেখায়।'

'না, সেরকম কখনো কিছু বলেনি তো। আর আমি তো কাউকে খুন করবার মত ভাবতে পারছি না।'

'ওঁর কোন শত্রু ছিল বলে জানতেন?'

'না, অন্তত আমার কাউকে কখনো কিছু মনে হয়নি। জানি না, ভেতরে ভেতরে যদি কিছু থাকে।'

লোকটা চুপ করে, খানিকক্ষণ পা দোলাল, মোটা আঙুল দিয়ে টেবিল ঠুকতে লাগল, যদিও মুখ দেখে কিছুই বোঝাবার উপায় নাই, এর পরে কী জিজ্ঞেস করতে পারে। মুখ না তুলেই, যেন অনেকটা সঙ্কোচ করেই, লোকটা বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার কি মনে হয়, মিস্ রায় খুন হবার লাইফ লীড করতেন? মানে, আপনার সঙ্গে তো ওঁর খুবই ইয়ে ছিল, তবু মানে আপনার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলে, কিছু জানতেন?'

প্রতিদ্বন্দ্বী, নীতার পুরুষ বন্ধুরা কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল নাকি? আমরা কি কেউ কারুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীতা বলতে যা বোঝায়, তার কি কোন অস্তিত্ব আজকাল আছে? আমি তো জানি না। সবটাই নীতার ইচ্ছা, মনে ধরে গেলেই হল, যেমন আমি যখন কোন মেয়ের কাছে যাই, তখন কি আমি ভাবি সে নীতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী? সে নীতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হতে যাবে কেন, সে তখন শুধু আমারই ইচ্ছাকে মেটাবার জন্যে থাকে, নীতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বললাম, না, ঠিক সেরকম তো কাউকে মনে হয়নি।'

'সে রকম কিছু থাকাটা কি খুব অসম্ভব ছিল মনে হয়?'

'এর কোন জবাব ঠিক দিতে পারলাম না।'

'আচ্ছা, ওঁর ওখানে কাদের যাতায়াত ছিল, এরকম কিছু নাম-ধাম আপনি বলতে পারেন?'

'তা পারি।'

আমি যতগুলো নাম জানতাম, সবগুলোই বলে দিলাম, সবাই আগে জবাবদিহি করে মরুক তো। অনেকেই তো ওই ঘরে ওই ঘাটে রাসলীলা করে গিয়েছে, দেখা যাক না, তাদের মধ্যে কাউকে ফাঁসানো যায় কি না। লোকটা নামগুলো সব লিখে নিল, কিন্তু লোকটা আমার সম্পর্কে কতটা কী জেনেছে, কিছুই বোঝা গেল না, এবং আমিই জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম লোক কি না, আর তা যদি হয়, তাহলে, কিছু একটা জেনে শুনেই এসেছে কি না, কে জানে।

বললাম, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কী হয়েছে না হয়েছে, একটু জানতে পারি কী?'

'নিশ্চয়ই। কাল রাত বারোটার সময় পুলিশের কাছে টেলিফোনে খবর দেওয়া হয়, মিস রায় তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ, ঘরে বাতি জ্বলছে, কিন্তু হাজার ডাকাডাকিতে তিনি দরজা খুলছেন না। বাড়ির মালিক জানান, ব্যাপারটা তাঁর কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, অতএব (এসব তো আমার জানাই ছিল।) পুলিশকে না জানিয়ে তিনি পারছেন না। মেড সারভেন্ট বাইরে থেকে এসে অপেক্ষা করছিল, তাহাকে অবিশ্যি আমরা এ্যারেস্ট করেছি—।'

'চিত্রাকে?'

নামটা এবার আমার স্পষ্টই মনে পড়ে গেল। লোকটা বলল, 'হাঁ, কারণ মেয়েটার প্রকৃতি ভাল না, একবার একটা হোটেল থেকে প্রস্টিটিউশনের দায়ে ধরা পড়েছিল, যদিও রেহাই পেয়ে যায়, তবু সন্দেহজনক চরিত্র। আর ঘরের দরজাটা যেহেতু বাইরে থেকে টেনে দিলেই লক্ হয়ে যায়, সেইহেতু ওকে সন্দেহ না করার কোন কারণ নেই, অব্‌কোর্স ওর পক্ষে খুন করবার কোন মোটিভ আমরা পাইনি। বিকজ—ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি, যেটা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল, অবিশ্যি এটাও ওবাড়ির সবাই বলছে,

বিটা নাকি মিস রায়ের খুবই বিশ্বস্ত ছিল। ওর 'এনতেজারিতে' সব কিছুই থাকত, তবু ওকে এ্যারেস্ট না করে উপায় ছিল না, বিশেষ করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে তো, হঠাৎ ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে, সেজন্যেই ওকে আটকানো হয়েছে। যাই হোক, পুলিশ মোটামুটি খুন সম্বন্ধে প্রস্তুত হয়েই যায়, মেকানিককে দিয়ে দরজা টলিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, সী ইজ ডেড, সম্ভবত গলা টিপেই মারা হয়েছে, বিকেলেই সেটা নিশ্চিত হওয়া যাবে। আপনার খবরটা ক্লিয়ের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি...।'

কী বলতে চায় লোকটা, আমার কী খবর পেয়েছে? চিত্র। নিশ্চয় আমাকে কাল দেখতে পায়নি? তাও জানি না অবিশ্যি, বোধহয় আসার সময় রাস্তায় কোথায় ছিল কিনা। বললাম, 'কী খবর?'

'আপনার, মানে, আপনাদের, যারা আপনারা মিস রায়ে ওখানে যাওয়া-আসা করতেন। আপনি যাদের নাম বললেন, প্রায় সব নামই ক্লিয়ে পুলিশকে জানিয়েছে, তাতেই আপনার কাছে আসতে পারলাম।'

'আপনারা কাকে সন্দেহ করছেন, অর্থাৎ কাউকে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে কি না।'

'আমি একর্মস্থ, আপনাকে নিয়ে তিনজনের সঙ্গে দেখা করেছি, সন্দেহ কাউকেই কিছুই করিনি। তবে কী জানেন তো, আমাদের কাজটাই স্যার এমন, সবাইকেই সন্দেহ করতে হয় আমাদের, আবার কাউকেই ঠিক সন্দেহ করতে পারি না।'

'খুনীর কোন চিহ্নও কি পাওয়া যায়নি?'

'এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলতে পারলাম না, কিন্তু আপনি এই অল্প সময়েই মেলা সিগারেট খেলেন, চেন-স্মোকার বাকে বলে।'

লোকটা তুম্‌বো মুখে হাসল, যদিও হাসিটা ঠিক হাসি বলে মনে হয় না, মাংসের তাল একটু, যাকে বলে, বিস্ফারিত হল মাত্র এবং এই সিগারেট খাওয়ার দ্বারা কী বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পারলাম না। লোকটা কি ভাবছে, আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি বলে, এত ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছি? তা ছাড়া, গতকাল রাত্রে নীতার ঘরে যে সিগারেট আমি খেয়েছি, এ সে সিগারেট নয়, অতএব ব্র্যাণ্ড দেখে কিছু বোঝা যাবে না, সে গুড়ে বালি।

বললাম, 'তা যা শোনালেন, তাতে একটু বেশী সিগারেট খাব, এতে আর—।'

টেলিফোন বেজে উঠল, রিসিভার তুললাম, চীফের গলা শোনা গেল, 'লোকটা গেছে? এদিকে তো আর দেরী করা যায় না, ইমিডিয়েটলি, একটা পাল্‌টা রিপোর্ট তোমাকে তৈরী করে ফেলতে হবে।'

বললাম, 'হুঁ', আমার মনে হচ্ছে স্যার, উনি এবার উঠবেন, উঠলেই আমি যাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম এবং লোকটার মুখের দিকে তাকালাম, দেখলাম দুমব্‌রার পাছার মত একতাল মাংসের মধ্যে দুটো চোখ, কী বলব, আপাত-দৃষ্টিতে খুবই নিরীহ, সেই গাল ফুলো খোকনের মত, যার চোখের মণিগুলো অদ্ভুত চকচকে, যেদিকে তাকায়, যা দেখে, তার মধ্যেই যেন তলা অবধি ডুবে যায়, সবই দেখতে পায়, অথচ ঠিক শেয়ালের মত শেয়ানা ধূর্ত নয়, সাপ'—অর্থাৎ তীক্ষ্ণ নয় যে অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে দেখছে, তবু যেন সবই তার চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে। এখন এ লোকটাকে আমার ডিভাইন খচ্চর বলে মনে হচ্ছে, যাদের অনেকটা কী বলা যায়, যেন একজন পুণ্যবান ধর্মযাজক, ঈশ্বরের উপাসক, 'জয়গুরু বাবা, ওর্‌াকেই প্রাণটি সঁপে দিয়ে বসে আছি' এমনি একটা ভাব, কিন্তু একটি আধলা দর্শনী চোখে ফাঁক পড়ার উপায় নেই, একটিও ভবকা ছুঁড়ি শিষ্যার, যাকে বলে দেহখানি পবিত্রভাবে, নিষ্কামভাবে চেটে নেওয়া বাদ যাচ্ছে না, একটিও শাঁসালো মক্কেল নজর এড়িয়ে যেতে পারে না, এরকম লোকটাকে ডিভাইন খচ্চর বলা যায় বোধহয়। তাই এবার লোকটির প্রতি আমার ঘৃণা হতে লাগল, রাগ হতে লাগল।

লোকটা বলল, 'আপনার মূল্যবান সময় অনেক নষ্ট করে দিয়েছি, কিন্তু কী করব বলুন। কাজের দায়িত্ব, না এসে উপায় নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এর একটা কিনারা না করতে পারছি, মানে খুনীকে না বের করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত হয়তো আপনাকে আরো কয়েকবার বিরক্ত করতে হতে পারে। আর জানেন তো কাগজওয়ালারা কী রকম পেছনে লাগে। যতই দেরী হবে, ততই অযোগ্য বলে শহরে মাত করতে থাকবে, অথচ এমন নয় যে খুনী এসে আমাদের কাছে নিজেদের থেকে ধরা দেবে। তা হলে তো সব গোল মিটেই যেত। আচ্ছা, এখন উঠি—।'

কিন্তু ডিভাইনটি উঠল না, বরং ওই জবড়া খোকন নিরীহ চোখে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনি গতকাল রাত্রে কোথায় ছিলেন?'

আমি প্রায় একটা ফাইলের ফিতে খোলারই উদ্যোগ করেছিলাম, এবং সে মুহূর্তে বুঝলাম, আজকের মত নিরীহ ফাঁদ পাতনেওয়ালাটির আসল কথাই এবার বোধহয় শুরু হতে যাচ্ছে. তখন সোজা কথা বলতে আমার আর ইচ্ছা করল না, দেখতে ইচ্ছা করল, বিরক্তি দেখিয়ে লোকটাকে এখনকার মত সরানো যায় কিনা, কারণ নতুন রিপোর্ট তৈরী করার জন্যে কোন তাড়া আমি এখনো ঠিক বোধ করছি না, কিন্তু এই কী বলে, তদন্তকারীকে বলবার কথাগুলো একটু ভেবে দিতে চাই। কী বলছি না বলছি, সেগুলো এবং ভবিষ্যতে আর কী বলা যায়, তা ভাববার সময় না পেলে, মুখ খুলতে পারছি না। বললাম 'কলকাতায় আমাদের একটা বাড়ি আছে।'

লোকটা তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে, অনেকটা যেন ভুলই হয়েছে, এমনিভাবে হাসি হাসি ভাব করে, (জানি না ওটা হাসি কি না) বলল, 'কথাটা বোধহয় ঠিক জিজ্ঞেস করা হল না। আমি জানতে চাইছিলাম, কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে রাত্রি এগারোটা নাগাদ আপনি কোথায় ছিলেন?'

'রাত্রি এগারোটার সময় রাস্তায়, সন্ধ্যাবেলাও রাস্তায়।'

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন খোকন কিছুই বুঝতে পারল না, এবং বললও তাই, 'কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমার অনেক কাজ আছে। আপনার কথাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' (উল্লুক।)

খোকন তেমনি তাকিয়ে রইল, নিষ্পাপ ধর্মযাজকটি, ভগবানের কাছে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে বসে আছে যেন। বলল, 'ডাক্তারের অভিমত হচ্ছে, সন্ধ্যে থেকে রাত এগারটার মধ্যে মিস রায় বোধহয় খুন হয়েছেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, সে সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন।'

'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'যাতে জানতে পারি, আপনি ওসময়ে মিস রায়ের এ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন কি ছিলেন না।'

'সে কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি, নীতার সঙ্গে গতকাল আমার দেখাই হয়নি।'

বলেছিলেন বুঝি, আমার একেবারে মনেই ছিল না। কিন্তু কোথায় ছিলেন, তা বললেন না।'

'আপনি কোথায় ছিলেন?'

লোকটা চুপ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। দুম্‌বা। তারপরে খসখসে মোটা গলায় বলল, 'আমি? আমার সঙ্গে তো মিস রায়ের আলাপ ছিল না বা যাতায়াত ছিল না, তাই এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা ঠিক আসে না।'

'তবে কি আমার পরিচিত যে কোন লোক খুন হবে, আর তার খুন হবার সময় আমি কোথায় ছিলাম, তা আমাকে মনে রাখতে হবে?'

'আইন তাই বলে, রাখতে পারলেই ভাল. নইলে অসুবিধের পড়তে হয়, এই আর কি। আপনি যদি একটু মনে করতে পারতেন ভাল হত, বিশেষ করে, এ ব্যাপারে আপনি যখন সন্দেহের উর্ধে নন।'

'তার মানে, বলতে চান আমার দ্বারাও নীতা খুন হতে পারে?'

'পারে না কী?'

'আপনার সঙ্গে সত্যি আমার কথা বলার সময় নেই আর, আমিও একটা ইনভেস্টিগেশন নিয়ে ব্যস্ত।'

লোকটা এবার উঠে দাঁড়াল, এবং সেই গালফুলো মুখে, খোকন চোখে তাকিয়ে অভিনেতার মত মোটা গলায় বলল, 'তা হলে বললেন না কোথায় ছিলেন?'

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'শুনতেই যখন চান, তখন শুনেন, আমি যে কোথায় ছিলাম, তা আমার নিজেরই মনে নেই, বেজায় মাল টেনেছিলাম কি না।'

'মাল?'

'মাল জানেন না?'

'মদের কথা বলছেন?'

লোকটা সত্যি, ডিভাইন খচ্চর শুধু নয় কিছুটা সাবলাইম খচড়ামিও পাক করা আছে মনে হচ্ছে।

আবার বলল, 'মদ্যপান করেন নাকি?

মরে যাই, 'মদ্যপান করেন নাকি' তারপরে বলবে, 'ও' আপনি স্ত্রীলোকের

সংসর্গ'ও করেন নাকি' এবং তারপরে, আপনি বস্ত্র পরিধান, আহারাদিও করে থাকেন' ইত্যাদি বাদ যাবে না। বললাম, হ্যাঁ মশাই, মাল-টাল খেয়ে থাকি। তারপরে এও মনে করতে পারছি না কোন মেয়ে-টেয়ের ঘরে গেছলাম কি না হয়তো তাও গেছলাম।'

'গেছলেন কি না, তাও মনে করতে পারছেন না?'

'না, ঝোঁকের মাথায় ওসব আমার কিছু মনে থাকে না।'

'কোন মেয়ে কোথায় থাকে, কিছু মনে করতে পারেন?'

'না।'

'মিস রায় কি না, মনে করতে পারেন?'

'হ্যাঁ পারি, নীতা নয়। (শালক একটি, তোমার ফেরেববাজী বুঝি না, না?) ওকে আবার আমি ভালবাসি কি না, মানে, বাসতাম, তাই ওর কাছে গেলে সে কথা আমার মনে থাকে।' (মাইরি এ কথাটা মিথ্যে বলিনি, নীতার কাছে গেলে সত্যি মনে থাকে, ভালবাস্‌সা অবিশ্যি জানি না।)

আর যেসব মেয়ে-টেয়ের কাছে, মানে আপনি যেরকম বলছেন, গিয়ে-টিয়ে থাকেন, তাদের বুঝি ভালবাসেন না?'

'আপনি যত মেয়ের কাছে যান, সবাইকে কি ভালবাসেন?'

'আমি? আমি তো কোন মেয়ের কাছে—।'

'যান-টান না? তবে অনেকেই তো গিয়ে থাকে, বেশ্যাদের কাছে কিংবা হাফ গেরস্থ মেয়ে, কিংবা আরো কত রকম আছে, নিশ্চয় সেসব খবর আপনারা রাখেন, মাঠে ময়দানে শুঁড়িখানায়, পাশের বাড়িতে, পাড়ায়, সবই তো আর প্রেম (ভালবাস্‌সা) নয়, গা চুলকোনিই বেশী, (সবটাই যদিও) সেটাই বলছিলাম।'

টেলিফোন বেজে উঠল আবার, চীফের গলা, 'কী হল, লোকটা যায়নি এখনো?'

লোকটা যাতে চলে যায়, আমি সেভাবেই বললাম, 'উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবার যাবেন বোধ হয়।'

'এবার যেতে বল, পরে হবে, আর দেরী করা যায় না। চাটার্জি, ঘোষ সব আমার ঘরে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম, লোকটা তখন আমার চেয়ারটার চারদিকে সেই নিরীহ চোখে দেখছে।

বলল, 'আচ্ছা যাচ্ছি, তবু আপনি একটু মনে করবার চেষ্টা করবেন, সন্ধ্যে থেকে রাত্রি এগারটা অবধি কোথায় ছিলেন। দরকার হলে আবার আসব, নমস্কার।'

লোকটা বেরিয়ে গেল, আর আমার মনে হল যেন, কাল রাত্রের কথা সব ওর জানা। লোকটা যেন আমাকে অর্থাৎ আমার ভেতরটাকে পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছিল, স্বপ্নের মত, জলের তলায় একটা মরা মেয়েকে স্পষ্ট দেখার মত। আবার এরকমও মনে হচ্ছে লোকটা যেন এখান থেকে যায়নি, (খারাব দেখছি বোধ হয়।) আমার সামনেই রয়েছে, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু এসব ভাববার এখন আমার সময় নেই, আর একটা পাল্‌টা রিপোর্টের জন্য মাম্‌দোরা সব বসে আছে। আচ্ছা, ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে, একটু ভেবে নেওয়া যাক, (যেন ভেবেই কিছু করা যাবে। যা করবার ত করতেই তো হবে।) কারণ, সমস্ত বিষয়টা পূর্বাপর আমার নিজের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। এখন যা ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, তা হল হরলাল ভট্টাচার্য (হরিণঘাটার অস্ট্রেলিয়ান শুয়োরের চেয়েও দামী।) কোক লক্ষ টাকা, একটা ইণ্ডাস্ট্রি করবে বলে, যাকে বলে, আত্মসাৎ, তাই করেছে এবং তার সম্পর্কে ইনভেস্টিগেট করে, যা রিপোর্ট করা উচিত, একজন দায়িত্বশীল অফিসার হিসেবে, তাই করেছি, আর টাকাটার একটা উপযুক্ত হিসাব, কাজের মেয়াদ অনেকদিন শেষ হয়ে যাওয়ার দরুন, যে-কাজ কিছুই হয়নি, তার সমস্ত টাকাটা এক মাসের মধ্যে সুদসমেত ফিরিয়ে দেওয়া, না দিতে পারলে গুরুতর শাস্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে শোধ করার নির্দেশ, ইত্যাদি, এভাবেই আমি আমার রিপোর্ট ও মতামত জানিয়েছিলাম। আমার ওপরওয়ালারা সকলেই এটা সমর্থন করেছেন, এমন কি খোদ কর্তা পর্যন্ত সই করে ছেড়ে দিয়েছেন, যার পরে আর কোন কথাই থাকতে পারে না, যে কারণে দু' একদিন আগেই, এই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে এরকম সব দপ্তরেই প্রচার করা হয়ে গিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, হরলাল ভট্টাচার্য এমন ক্ষমতার অধিকারী, স্বয়ং খোদ কর্তার পর্যন্ত টনক নড়ে গিয়েছে, (তার মানেই কোনরকম ভয়-টয় আছে, কোনরকম ভাবে হরলালের কাছে টিকি বাঁধা আছে, নিজের ব্যক্তিগতভাবে বা দলের কোন সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, কেননা এরকম

বাঁধাবাঁধি না থাকলে, খোদ কর্তা ছেড়ে কথা কইতেন না, তিনিও হয়তো দাঁতে দাঁত চাপছেন, আর হরলালকে শুয়োরের বাচ্চা বলছেন, তবুও নিরুপায়, যে কারণে, হয়তো তার নির্দেশেই হরলালকে খবরের কাগজে ইণ্ডাস্ট্রির ওপরে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ানো হয়েছে, যত ত্রুটি শুধরে নেওয়া যেতে পারে।) তিনি এই মুহূর্তেই ভুল শোধরানোর মত পাল্টা রিপোর্ট সাবমিট করতে হুকুম দিয়েছেন। তার মানে, হরলাল টাকাটা মারুক, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু তার জন্যে তাকে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, সাত তাড়াতাড়ি তার নামে যে কলঙ্কজনক রিপোর্টটা বেরিয়ে গিয়েছে, সেটাকে এখনই তুলে নিতে হবে। সে জন্যে, বাগচি বলছেন, হরলাল ট্যালেন্ট, জীনিয়াস, প্যাট্রিয়ট, সাফারার, যাকে বলে পলেটিক্যাল সাফারার, তা-ই, অতএব, বাণ মারলে যেমন বাণ তুলেও নেওয়া যায়, সেইভাবেই, আমাকেই, (কেননা আমিই তো এখানে ইনভেস্টিগেটর ছিলাম। রিপোর্ট করেছি) আবার পাল্টা লিখতে হবে, (বাগচির কথা থেকে যা বুঝেছি) অত্যন্ত রিগ্রেটের সঙ্গে যে, আমার তদন্তের মূলেই এমন কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল যে, সমগ্র ব্যাপারটা অত্যন্ত ভুলভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে। হরলাল ভট্টাচার্য (চোট্টা) আসলে অনেক দূর, যাকে বলে 'অগ্রসর' তাই হয়েছেন, অর্থাৎ কেলেঙ্কারী ধামাচাপা দিতে হলে যা যা করা উচিত, তাই করতে হবে।

কিন্তু একটা বিষয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি, আমি আমার নিজেকে ঠিক চিনতে পারছি না। গতকাল রাত্রেও আমার ঠিক এইরকম হয়েছিল, অর্থাৎ আমি যে আমার সেই সুখের গর্তের মধ্যে, বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ছিলাম, এবং বেশ শক্তভাবেই, যাকে বলে দৃঢ় হয়েই ছিলাম, সেখানে যেন ঠিক সেই সুখ ও আরাম বোধ করছি না। কেন, তা জানি না, আর এই জন্যেই, জঘন্য ব্যাপার যেটা, আমার মনে হয়, আমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঠিক যেন চিনতে পারছি না। সব থেকে খারাপ যেটা, সেই কুৎসিৎ স্বাধীনতা যাকে বলে বীভৎস আর ভয়ংকর, তার যে কী গতিবিধি, আমি ঠিক ধরতে পারছি না। সে যেহেতু, আমারই 'ইচ্ছা' সেইহেতু অন্য কোন গর্তে গিয়ে সে বাস করতে পারে না, সে আমার গর্তে, আমার পরাধীনতার সুখের গর্তেই কোনরকমে থাকে, অনেকটা যাকে বলে খাঁচার বন্ধ বাঘের মত। কিন্তু বাঘের মত হলেও আমার পরাধীনতার

(ওগো আমার পরাধীনতা, তুমি কি সুসোন্দর।) এতই ক্ষমতা, এত দাপট যে, স্বাধীনতাকে ঠিক যেন ব্যাটারি চার্জ করে রেখে দিয়েছে, তার টুঁ-ফো-টি করার যো নেই। তবু সে যে কখন কোন্ দিকে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, পরাধীনতার দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজতে খুঁজতে কোন্ খানে যে দুম করে লাফিয়ে পড়বে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। গতকাল রাত থেকেই এটা আমার বেশী করে মনে হচ্ছে, কারণ সে যে সুখের গর্তের দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে খুঁজে বেড়ায় সব সময়ে, সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, এবং ফাঁক পেলেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেটাও জানা গিয়েছে। সেইজন্যেই কালরাত্রি থেকেই এখন এই মুহূর্তে আরো বেশী করে মনে হচ্ছে, আমি যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। অথচ আমি তো ইনটেলিজেন্সের লোকটাকে ঠিক মিথ্যে কথা গুছিয়ে বলতে পেরেছি, সেখানে তো (ঘুঘু) কোনরকম গোলমাল করিনি, বা আমার ওই নোংরা কুৎসিৎ স্বাধীনতা খাট করে লাফিয়ে উঠে বলেনি, 'হাঁ মশাই, নীতাকে আমিই খুন করেছি, কারণ, আমি আর, কী বলে, আসক্তি আর মিথ্যের সঙ্গে যেন ঠিক পেরে উঠছিলাম না।' হাঁ হাঁ, আপনি যা বলেছেন সে কথা এখন আমি বুঝতে পারছি, আপনি যা বলেছেন, নীতা যদি আমাকে না-ই চেয়েছিল এবং ছলনা করছিল, তখন ওকে না খুন করে, ওকে ছেড়ে গেলাম না কেন, (যেমন কিনা মহৎ নায়কেরা করে থাকে বা বলে থাকে, 'ওগো, তুমি যখন আমাকে ভালবাসতে পার নাই, তখন আর তোমার হৃদয়ের বোঝা চাইতে চাহি না', উঃ কে এই ন্যাকাদের বোঝাবে, 'ছাড়িয়ে তো যাইবে হে মহত। কিন্তুক্ কুথাক্ যাইবে হে, চলিয়া গেলেই কি তোমাদের ভালবাসা "স্বর্গীয়" হইয়া যায় গী?') কিন্তু ওকে ছেড়ে যাওয়াও যা, ওকে কী বলব, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াও তাই, মানে মেরে ফেলা। কী রকম? তা হলেই তো বিপদে ফেলবেন মশাই, অত কথা কি আমি বলতে পারি, মানে নিজেকে কি ঠিক অতটা আমি চিনি? এই ধরুন না কেন, নিজের শরীরের যে কোন অংশই তো ভালবাসি, খুবই ভালবাসি, তবু একেক সময় তাকেও কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। যে অংশটা না হলে চলে না, অথচ রাখলে কষ্ট, কারণ সে কোন কাজেই আসতে চায় না, সে থেকেও নেই, অথচ ইচ্ছে, সে থাকুক, যা কখনো সম্ভব নয়, এ অবস্থায় কেটে ফেলাই ভাল। তবু জানা গেল, সে নেই। হাঁ, আমি তখন, যাকে বলে

'অঙ্গহীন' তবু একটা সেই যে পচে ও.ার দ ন সব সময়ের যন্ত্রণা, অনেকটা সেপ্‌টিকের মত অবস্থা যাকে বলে, তার হাত থেকে বাঁচা যায়, একটা বেশ নীরোগ অবস্থা, তৃপ্তি, হ্যাঁ—আঃ আর ব্যথা নেই, এইরকম অবস্থা।

কই, আমি তো তুম্‌বোমুখো লোকটাকে সেসব কথা বলিনি, তখন তো ঠিক নিজেকে বাঁচিয়ে, আমার গর্ত থেকে দিব্যি সুতো ছেড়ে যাচ্ছিলাম, তবু এখন আমার এরকম মনে হচ্ছে কেন, যেন নিজেকে আমি চিনতে পারছি না। তলপেট টাটাচ্ছে, লেভেটরীতে যাই, গিয়ে পেট খালি করতে করতেই আয়নায় নিজেকে দেখলাম, আর চোখ টিপে বলে উঠলাম, 'এই দোহাই মাইরি, আমার সঙ্গে এরকম করিস না। এই দেখ, ঠিক ফুলকো রুটির গ্যাস বেরুচ্ছে, পেটটি খোঁচাতে আরম্ভ করেছে। ফোন বেজে উঠল আবার, বাজুকগে, তার আমার জবাব দিতে ভাল লাগছে না, 'বাজারে শালা বাজ' বলে আয়নায় তাকালাম আবার। ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল, আমি আমার প্রতিবিম্বের দিকেই তাকিয়ে রইলাম, এবং জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা তোর ঠিক কি হচ্ছে, আমাকে সত্যি করে বল তো।' কিছু না? তুই জানিস 'কচু' বলে একবার মুখ বেঁকিয়ে ভেংচে দিলাম। দিয়ে হাসতে যাব, তার আগেই, টেবিলের ওপর ঠক ঠক শব্দে পিছনে ফিরে তাকালাম, (লেভেটরির দরজাটা খোলাই ছিল।) দেখলাম বাগ্‌চি, চ্যাটার্জি, ঘোষ তিনজনেই আমার চেম্বারে টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে, তিনজনেই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তিনজনের চোখেই রাগের সঙ্গে খানিকটা অবাক হওয়াও রয়েছে। আমি পিছন ফিরে বোতাম বন্ধ করে, ফ্লাশ টেনে বেরিয়ে এলাম।

বাগ্‌চি মানে চীফ্‌ প্রথমে অনেকটা ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'এর মানেটা কী? বেয়ারা বললে, সেই লোকটা তো অনেকক্ষণ চ.লে গেছে, তুমি যোছিল না কেন?'

চ্যাটার্জি বললেন, 'ছেলেমানুষ আপনারা, একটা কাজের গুরুত্ব বোঝেন না।'

ঘোষ বললেন, 'সীট ডাউন, সীট ডাউন, এখানেই বসা যাক, এখানেই কথাবার্তা সেরে নেওয়া যাক, আর অন্য ঘরে গিয়ে দরকার নেই। বেয়ারাকে বলে দেওয়া যাক, এখন যেন কেউ এ ঘরে না আসে, আর কেউ খোঁজ করলে যেন বলে দে', আমারা চারজনেই এখন ব্যস্ত আছি।

বলে ঘোষ আমার দিকে তাকালেন, অবিশ্যি অনুমতির জন্যে নয়, উদ্দেশ্য

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে আমিই নির্দেশ দিই, যদিচ, তার কোন লক্ষণই আমার মধ্যে আমি দেখলাম না, কারণ এই লোক তিনটে, যাদের ধারণা তারা আমার সুপিরিয়র এবং বস্‌, তাদের এত যাকে বলে কাজের 'গুরুত্ব' এবং ব্যস্ততা (বড্ড যে কাজের আঁচ দেখছি দাদ্‌দা!) আমাকে কোন রকমেই নাড়া দিচ্ছে না, যে কারণে আমার ভাবভঙ্গি দেখে চীফ্‌-এর ভুরু দুটো কপালের মাঝখানে মুখোমুখি দুটো ইংরেজী অক্ষর জেড-এর মত হয়ে উঠল। চ্যাটার্জি এবার যেন একটু অবাক হলেন, আর সেই সঙ্গে চোয়াল শক্ত করা একটা, কী বলে, 'ক্রোধের অভিব্যক্তি' তাই ফুটে উঠল। একমাত্র ঘোষ তেমন অবাক হলেন না বা রাগ করলেন না, কারণ স্যার-এর আমার ধারণা, তিনি আমাকে একটু বোঝেন, কারণ উনি যে আবার মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে এক টেবিলে এক আধ পাত্তর খেয়ে থাকেন, (একে বলে লিবারাল্‌, কেননা বয়স্ক সুপিরিয়র তো!) যদিচ সে কথা চীফ বাগ্‌চী বা চ্যাটার্জি জানেন না, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে আমার একটু বেশী ভাব, সেটা তাঁরাও জানেন, উনিও সেটা প্রমাণ করলেন এই ভাবে, 'ও কিছু নয়, ছেলেটা একটু এইরকমই,' সে কারণে উনি নিজেই বেয়ারাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন ও বললেন, 'বসুন আপনারা' কাজটা আরম্ভ করা যাক, বসো হে, আর দেরী নয়।'

বলতে বলতে উনি একবার একচোখ ছোট করে আমাকে স্নেহ ও শাসনের ইশারা করলেন, এবং তার সঙ্গে একটি আশ্বাসের ঘাড় নাড়ানো, (বলদ কোথাকার! ভালবেসে—) যার মানে বোধহয় আজ আমার সঙ্গে এক আধ পাত্তর হবে। ওরা তিনজনেই বসলেন, আমিও বসলাম, আর বাগ্‌চি, যাকে বলে, খুব 'বিচক্ষণের' মতই অল্প সময়ের মধ্যে একটা চিন্তা করে নিয়ে আমার ব্যবহারের কারণ সন্ধান করার জন্যেই যেন জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনটেলিজেন্সের ওই অফিসারটা এসেছিল কেন তোমার কাছে?'

কথাটা যেহেতু চ্যাটার্জি বা ঘোষ কেউই জানতেন না, ওঁরা খুবই অবাক হলেন—শুধু অবাক নয়, একটু ভয় পাওয়াও আছে, কারণ প্রত্যেকেই পাকা পুকুর চোর এবং ঘুষখোর, সে কারণে চীফ তার ঘরে আমাকে আগেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, দু একদিনের মধ্যে কোন 'বিজনেস করছি কিনা।

আমি বললাম, 'একটা খুনের খোঁজ খবর করতে।'

'খুন ?'

তিনজনেরই যেন পিলে অবধি দাবড়ানি খেয়ে উঠল। বললাম। 'হুঁ', সেই-রকমই তো বলছিল।'

'কে কোথায় ?' তিনজনেই এমন ঝাঁপিয়ে এল আমার দিকে, যেন খুব মজা পেয়েছে, অথচ একটু ভয় ভয় ভাব, আসলে ভয় নয়, কারণ জানে তো, ওরা কাউকে খুন করেনি।

'নীতা, ওর এ্যাপার্টমেন্টে,' কথাটা এভাবে সোজা বলে দিলেই হয়, এবং তাই বলতে গিয়েই, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, কনুইটা গলার চেপে বসার সময় ও আমার দিকে কেমন করে তাকিয়েছিল, সেই মুখটা আমার মনে পড়ে গেল, যখন ওর প্রথমে দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল, নিশ্বাস নেবার জন্যে নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠেছিল, (ওদের তিনজনকে জবাব দিলাম, 'একটি মেয়ে, তার নিজের ঘরে'।) আর চোখের তারা, যে তারা দুটো তখন যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছিল, ভীষণ অবাক হওয়ার জন্যে, ভীষণ অবাক হলে আর ভয় পেলে যেরকম হয়, সেরকম ভাবে, ও যেন আমাকে বলছিল, 'একি আমাকে সত্যি মেরে ফেলেছ নাকি ?' এবং ওর চেপে রাখা দাঁতগুলো তখন ভয়ংকর বিশ্রী ভাবে বেরিয়ে পড়েছিল, আর তারপরে আস্তে আস্তে দাঁতে দাঁত ছেড়ে গিয়েছিল, যেন একটা অসহ্য কষ্ট, মুখটা হা হয়ে যাচ্ছিল... আচ্ছা, আমি কি সত্যি ওকে মেরে ফেলেছিলাম ? বাঃ, আচ্ছা, আমার কি কোন কষ্ট, অনেকদিনের কষ্ট, নাকি ওটা রাগ...।

'কে মেয়েটা ? তোমার চেনা নাকি ?'

কারণ আমি যেন সত্যি জানতেই পারলাম না, নীতাকে মেরে ফেলছি, কারণ আমার যেন কেমন তখন মনে হচ্ছিল, আমি যেন কাকে বলছিলাম, 'না না, আর আমাকে পেছু ডাকিস না' কিন্তু তা যে নীতাকে মেরে ফেলা, (হুঁ', আমার চেনা—মানে—বন্ধু—মানে—।' ওদের তিনজনকে জবাব দিলাম।) আমি কি তা সত্যি জানতাম ? এমন কি, ও যখন আমার তলপেটটা খামচে ধরেছিল, যেন আমাকে ও মেরে ফেলতে চেয়েছিল, এত জোরে ধরেছিল, তখন একটা ঘৃণা এবং রাগ, যেন যুদ্ধ চলছিল, কিন্তু আচ্ছা তলপেটটা খামচে ধরা আসলে ভীষণ কষ্টে একটা কিছু আঁকড়ে ধরার মত বোধহয়, কারণ ওর হাত দুটো

তখন আমার শরীরের তলায় এমনভাবেই ছিল যে, কনুইটা সরাবার জন্যে গলার কাছে হাত তুলে নিয়ে আসার উপায় ছিল না। কিন্তু কথাটা তা নয়—।'

'কে সে, নাম কী ?'

কথাটা হচ্ছে, যে নীতার কাছে যাবার জন্যে (নীতা রায় ওদের বললাম।) শুধু যাবার জন্যে এক পা তোলা কেন, ও মরে যাবার সময়েও ওর নিশ্বাসের গন্ধটা আমার মনে পড়ছে, আর ওর নিশ্বাসের গন্ধের জন্যে আমার বুক অবধি ফাটল ধরা মাঠের মত হা করে থাকত, সেই নীতাকে আমি মেরে এসেছি।

চীফ্ বাগ্‌চি বলে উঠলেন, 'ও' দেয়ার ইজ দি কজ্, মানে তুমি শক্‌ড। তা সে কথাটা বলবে তো।'

এই কথা আমার কানে এল, এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কারণ আমি যেন ঠিক অফিসে নেই বা কোথায় রয়েছি, কিছুই জানি না, অথচ সেই অচেনা জায়গা থেকে এখন অফিসেই আমার ঘরে ঢুকতে চাইছি, এবং সেই চেষ্টা ফলবতী হতে হতেই, ত্রিমূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, আর চীফ্-এর কথা এবার পরিষ্কারই শুনতে পেলাম, 'হাঁ, আমি তা ডিনাই করছি না, আঘাত পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কি আর করা যাবে, মানুষের জীবন...।'

যাক্, আমি যে এ অচ্ছেদ্য, অর্থাৎ ইগ্‌নোর করিনি, আসলে আমি যাকে, বলে, 'আঘাতে বিপর্যস্ত' এটা আবিষ্কার করতে পেরে, (ইউরেকা! ইউরেকা!) তিন মক্কই খুব খুশি, শুধু তাই নয়, সমবেদনার মুখগুলো সব ঝুলে পড়ছে পাঁচের মত, এমন কি, (আহা, মরে যাই।) আবার সান্ত্বনাও দিচ্ছে, 'মানুষের জীবন!'...আহা, যে জীবন নাকি একটি নিটোল ঘুমের স্বর্গ', উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, আস্তে আস্তে মৌজ করে চলা, লোককে উপদেশ দেওয়া, (আসলে দুনিয়া রসাতলে যাক তাতেও ক্ষতি নেই, নিজেদের সুখের জন্য সব চালিয়ে যাবে।) 'আশাবাদী হও, দুঃখ তো আছেই, তবু ঈশ্বরের দেওয়া দায়'—আর তেমনি সান্ত্বনা, (বড় ব্যথা।) 'মানুষের জীবন।'...

মানুষের জীবন, যাকে বলে হৃদয়ঙ্গম করেই, ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চীফ্ আবার বললেন, 'কিন্তু এই জরুরী কাজটা আগে সারতেই হবে।

কোন উপায় তো নেই। আমার মতে তুমি এইভাবে রিপোর্টটা কর, সমস্ত রিপোর্টটা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে, যে কারণে, হরলাল ভট্টাচার্য সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, একটু দুঃখ-টুঃখ প্রকাশ করে বলতে হবে, হরলাল ভট্টাচার্য একজন বিরাট কর্মী মানুষ, তাঁর কর্মের ক্ষেত্র এত বিভিন্ন দিকে দিকে বিস্তীর্ণ যে একটা বড় কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করে ওঠা সম্ভব নয় ওঁর পক্ষে, যে কারণে কিছু রং ইনফর্মেশনের জন্যে এরকম একটা ত্রুটিপূর্ণ রিপোর্ট তোমাকে দিতে হয়েছে। হোয়াট ডু য়ু থিঙ্ক?'

বাগচি ঘোষকে আর চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলেন। ঘোষ বললেন, 'হুঁ। এ ছাড়া ওটাকে আর কীভাবে উইন্ডআপ করা যেতে পারে।'

চ্যাটার্জি বললেন, শুধু এই নয়, সম্ভব হলে হরলালের একটা ডিটেল ওয়ার্কের ফিরিস্তিও দেওয়া যেতে পারে।'

আমি বললাম, 'মানে ইমাজিনারী।'

'সবটাই তো তাই। আর বুদ্ধিও তো শুনলাম রুবি দত্তই খোদ কর্তাকে দিয়েছে।'

যাক, 'জাহাবাজ মাগী' নামক স্ত্রীলোকটি তা হলে এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পড়বেই, খুবই স্বাভাবিক, কারণ খোদ কর্তা তার প্রেমিক, সে বিপদে পড়লে তাকে পরামর্শ সে দিয়েই থাকে। তাকে নিশ্চয়ই হরলাল ভট্টাচার্যই গিয়ে ধরেছিল, কিংবা সুজাসুজিই কোন ভয় দেখিয়েছিল, যাতে খোদ কর্তা হেঁদিয়ে পড়েছিলেন আর পড়বার তো জায়গা একমাত্র রুবিদত্তের কোলেই, তখন সে এসব পরামর্শ দিয়েছে।

বাগচি হঠাৎ যেন অনেকটা ফুঁসে ওঠার ভঙ্গিতে বললেন, 'বাট দ্যাট চাপ, দ্যাট গ্রেট রাগারার হরলাল, এখন এসব জীনিয়স সাফারার, যাই বল হোক না কেন, এই কয়েক লক্ষ টাকা ফুঁকলে কিসে, আমি তাই ভেবে পাই না।'

এবং এর হিসেবও কোনদিন পাওয়া যাবে না।'

চ্যাটার্জি বললেন, এবং তিনজনেরই যেন এইমাত্র পাকেটমার গিয়েছে, এই-রকম একটা ভাব করে, চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ, যার অর্থ হল, এতগুলো টাকা থেকে একটা ভাগও পাওয়া গেল না, তবু নিজেদের ভেবে মরতে হচ্ছে। ঠিক যেন তিনটি শোকমগ্ন মুখ যাদের কী বলে, শোকসন্তপ্ত

যদি বেঁচে থাকত।) আর কোন আশাই নেই। কিন্তু, আমি ঠিক কী বলতে চাইছি, বুঝতে পারছি না, এবং কিছুতেই নিজেকে চিনতে পারছি না, প্রায় যেন ভুলতেই বসলাম, আমার ঘরে আরো তিনটি লোক রয়েছেন, এবং তাঁরা সবাই একটা ক্রাইসিসের জন্য লড়ছেন।

বাগচি বলে উঠলেন, 'যাই হোক, মনের মধ্যে ভুলিয়ে নিয়ে, স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে একটা রিপোর্ট তৈরী করে ফেল, যাতে আজই সব ঠিক করে ফেলা যায়।'

আর আমি শুনলাম আমার গলা দিয়ে বেরুল, 'না, রিপোর্ট যা করার, তা করা হয়েছে, আর নতুন করে কিছু করার দরকার নেই।'

শোনা মাত্রই, আমার গত কাল রাত্রের কথা আবার মনে পড়ে গেল, যখন আমি নীতার গলায় কনুইটা চেপে ধরেছিলাম, অর্থাৎ সেই বীভৎস জানোয়ারটা, স্বাধীনতা যার নাম, সেই কুৎসিত নোংরাটা যেন কথা বলে উঠল।

ওরা তিনজনে প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে, আমি পারব না।'

আমার গলা দিয়ে বেরুল, যার কোন যুক্তি আমার জানা নেই, আর ঠিক মনে হল, আমার তলপেটে নীতা যেমন করে খামচে ধরেছিল, তেমনি করেই, ওদের তিনজনের, 'তার মানে' কথার বাধা স্বর আমার বুকের মধ্যে, হুঁ, তাই মনে হল, আমার বুকের মধ্যেই খামচে ধরল, আর তা ছাড়াতে গিয়ে, 'তার মানে, আমি পারব না', এই কথা যেন শেষবারের মত, যেমন নীতার গলায় কনুই চেপে বসেছিল' তেমনি বসল। তবু আমি যে আমার সুখের জীবিকাটিকে হত্যা মানে খুন করছি, এ কথাটা আমার মনে হল না, কারণ আমি ঠিক যেন জানতেই পারছি না আমি কি করছি, তবু এ কথা আমাদের মানতেই হবে, আমি যাকে বলে একটা শান্তি-প্রশান্তি বোধ করছি।

বাগচি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি এর পরিণাম জান?'

'জানি।' খুন যে করে ফেলেছি, তা ঠিক না জানলেও তার পরের অবস্থাটা এখন আমার হল, আমি দেখলাম, আমার এই সাজানো জীবিকার সুন্দর ঘরটা, টেবিল, ফাইল, আলমারী, সব মরে পড়ে রয়েছে, এরকম আবার হয় নাকি, তা জানি না, কিন্তু দেখছি হচ্ছে, তার আমি কী করব।

চ্যাটার্জি বললেন, 'সেটা আপনি হার্টমশাই করতে অভ্যস্ত, সকালবেলাই সেটা গিলে মরেছেন নাকি?'

বললাম, 'না'। (বুড়ো খচর, তোর মত মকরধ্বজ আর মোদক মারি না, তৃতীয় পক্ষের কাছে ছোকরা থাকবার জন্যে।)

ঘোষাল বলে উঠলেন, 'আচ্ছা তোমার এরকম ধারণা হয়নি তো যে, আমরা হরলালের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বসে আছি, কিন্তু তোমাকে দিয়েই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিচ্ছি?'

'না।'

'তবে?' বাগচি খেঁকিয়ে উঠলেন প্রায়, 'তুমি কোন সাহসে বলছ, তুমি পারবে না?'

তা আমি সত্যি জানি না, কোন সাহস থেকে বলছি, তবে এটা বুঝতে পারছি, কেউ যেন আমাকে আমার গর্তের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে, যার অর্থ, (উরে শালা।) আমার বাসাই ভেঙে যাচ্ছে, আমার, যাকে বলে আশ্রয়, সেখান থেকেই আমাকে সরে পড়তে হবে, আমি থাকব কোথায়, বসব কোথায়, দাঁড়াব কোথায়, তাই তো বুঝতে পারছি না। অর্থাৎ আমার গর্তের যে সব ভাইটাল টান, যেগুলো আমাকে ধরে রেখেছে, তারাই যদি সব বেরিয়ে পড়ে, তা হলে আমার আস্তানা কোথায়।

চ্যাটার্জি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব এখনো বুঝতে পারেননি, এখনো ছেলেমানুষী করেছেন, কিন্তু সব সময়ে কী আর তা করা চলে, এ ধরনের কথাবার্তা বলবেন না। যা বলা হচ্ছে, তা করে যান।'

ঘোষ বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে তো যথেষ্ট বিচক্ষণ বলেই জানি, অল্প বয়সে এতটা উন্নতি করেছ, তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কর্তারা সবাই তোমার কাজে খুশী, তোমার কাছ থেকে তো ঠিক এরকম, হঠাৎ একটা কথা [illegible] করা যায় না।'

বাগচি ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখছিলেন, যার অর্থ দাঁড়ায়, ওর এখনো দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যা বলেছি, কাজে আমি তা কখনই করব না। আর সেই ভেবেই বোধহয় বললেন, 'আজকালকার ছেলেদের মতিগতি সত্যি কিছু বোঝাবার উপায় নেই। দেশটা এদের জন্যে একেবারে গোল্লায় যেতে বসেছে, কী বলছে, কী করছে, একটা রেস্‌পেক্ট নেই, একটু বিনয় নেই, যাচ্ছেতাই। এইজন্যই। বুঝলে হে ছোকরা, এইযে তোমাদের আজকাল এইসব পোশাক-

আশাক নেত্য কেতা সব হয়েছে, অল, ইরেসপনসিবল বখাটে...যাই হোক, সময় অনেক চলে গেছে, আর দেরী করা যায় না।'

'হ্যাঁ' আমি মনে মনে বললাম, 'আমাদের জন্যে, এই ছোকরাদের জন্যে দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে, আর তোমরা এই ঘাগীরা, স্বর্গ রচনা করছ। দেশের লোকেরা তোমাদের চেনে না। যত দোষ ছোকরাদের পোশাকে-আশাকে, আর তোমাদের ভদ্র আর শালীন পোশাকের তলায় সব সাচ্চা, এই "ন্যায়ের সুন্দর" রাজত্বটি তোমরা চালাচ্ছ। আমরা কাদের ছেলে, আর তোমরা কাদের বাবা, তা তোমরা জান না। আমরা সব ভুঁইফোড়, মরে যাই।'

চ্যাটার্জি হেসে (ওঃ কী ভাগ্যি, শ্যালকটি হেসেছে, ঝকঝকে সাদা দাঁত, অনেক টাকা দাম, হাসি খাবার সময় খুলে যায় কি না কে জানে।) একটু চোখ নাচিয়ে, (এতদিনে শুনলাম, লোকটা বউয়ের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলে।) বললেন, 'তারপরে আপনি যা ভাবছেন, হরলাল ভট্টাচার্য সেটাও প্রমিস করেছে, দেবে, বেশ মোটাই দেবে, যার পরিমাণ, মফস্বলে কয়েক কাঠা জমি হয়ে যাবে, বুঝলেন?'

ঘোষ বললেন, 'ওকি তা করব নাকি? আখের গুছোবার বদলে সব অন্য জায়গায় গিয়ে খরচ করে বসে থাকবে।'

ঘোষ সব আর ছেলেমানুষের কথা বলেছেন, ওঁর ধারণা, ওঁকে আমি রেসপেক্ট করি, (পাছার লাথ) তাই ওসব (পাজাপ) কথা আমার সামনে বললেন না। আমি বললাম, 'আপনারাই কেউ উদ্বুদ্ধ করুন না।'

তিনজনেই রেগে, চোখ পাকিয়ে (খোকনকে শাসন হচ্ছে।) তাকালেন আমার দিকে, এবং বাগচি আবার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কেন করব, তোমার কেস, তুমি উদ্বুদ্ধ করবে।'

'আমার যা বলার, তা আমি বলে দিয়েছি আপনাদের।' আমি বেশ শান্ত-ভাবেই বললাম, কারণ আমি আমার কাজ অনেক আগেই শেষ করেছি, এখন অনেকটা সেই প্রশান্তির মধ্যেই ডুবে রয়েছি যাকে বলে, এবং সিগারেটের প্যাকেট বের করে, বাগচির সামনে চাকরি-জীবনে যা করিনি, তা করলাম, সিগারেট বের করে, ঠোঁটে গুঁজতে গুঁজতে বললাম, 'ইফ ইউ অল পারমিট মি প্লীজ'—তারপরে কাঠি জ্বালিয়ে ধরিয়ে নিলাম। নীতাকে মেরে ফেলার পর,

অনেকক্ষণ আমার এরকমই কেটেছিল, ঠিক যা করেছি, তা ভাবতে না পারার দরুণ অথচ একটা কী বলে প্রশান্ত আমেজে সিগারেট খেয়েছিলাম, তারপরে কী হবে না হবে, (যেমন সব চিহ্ন লোপাট ইত্যাদি) কিছুই মাথায় আসছিল না।

চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'কেন, কী হল হঠাৎ আপনার? চুরি জোচ্চোরি ফেরেববাজী আপনার কাছে নতুন নাকি? ঘুষ খাবার জন্যে অনেক ফাইলই তো ওলটপালট করে দিয়েছেন।'

আমি এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'আর ভাল লাগে না।'

বাগচি বোধহয় রাগের চোটে চেয়ারে বসে কাঁপছিলেন। ঘোষ বলে উঠলেন, 'কোন পলিটিক্স্, তোমার মাথা খারাপ তো?'

'আজ্ঞে না, এ মাথায় খচ্চরের দাঁত বসে না।'

বোঝা গেল, খচ্চর শব্দটি সবাইকেই বিশেষ আহত করল, যে কারণে তিনজনেই একটু অবাক হয়েই তাকালেন, ভাবলেন, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে কিনা, যদিচ তা ভাবলে আমার কিছুই করার নেই, কারণ আমি আমার ভিতরটা তো আর ওদের দেখাতে পারছি না যে, ঠিক সেখানে কী কী ঘটেছে, এবং আমার স্বাধীনতা নামক যে জঘন্য পদার্থটা আমার সুখের গর্তের সঙ্গে, ওদের সঙ্গে, দপ্তরের সঙ্গে, কে জানে গোটা দেশের সঙ্গেই কি না, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে বসল, সেটা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নাই সত্যি।

বাগচি উঠে দাঁড়ালেন, অনেকটা বীরপুরুষের মত, (বেশী ওরকম করা উচিত নয় মানু, প্রেসার ফট করে দেবে।) টেবিল হঠাৎ একটা চাঁটি মেরে বললেন, 'ইউ—ইউ ডোন্ট থিঙ্ক, দ্যাট—যে তুমি না করলে এটা পড়ে থাকবে। আমরা অনেক ভালভাবেই এটা ম্যানেজ করব। কিন্তু তুমি মনে রেখ, তোমাকে আমি স্পেয়ার করব না, কিছুতেই না, তোমাকে—তোমাকে—।'

বললাম, 'তাড়িয়ে ছাড়বেন।'

'ইউ উইল সী দ্যাট। আসুন আপনারা।' বাগচি গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাকী দুজন আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত হা করে তাকিয়ে রইলেন, যেন ব্যাপারটা এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। যদিচ, তাদের চোখেও খুন করারই একটা ইচ্ছা জেগে উঠেছে বলে আমার মনে হচ্ছে, 'ইচ্ছে' যাকে

বলে, অর্থাৎ স্বাধীনতা, তাকে ওরা আমার মত পান, অতএব ওই তাকিয়ে থাকাই সার। অবিশ্যি, এটা-ঠিকই, ওই 'ইচ্ছে' বা স্বাধীনতা ঠিক এরকম ক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে না, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম, পরাধীনতার সুখ যেখানে বেশ বিনা বাধাতেই গর্তের মধ্যে বাস করে, তখন সেই সুখকে বজায় রাখার জন্যে স্বাধীনতা কোন কাজই করে না, এমন কি তার যে কোন অস্তিত্ব আছে, তাও গর্তের কোথাও টের পাওয়া যায় না।

ওরা দুজনেও বেরিয়ে যাবার আগে, চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেসটার কাগজপত্র, ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট সব কোথায়?'

এখানেই আলমারীতে আছে, তবু আমি (ঘোড়া-গাধার বাচ্চাকে) বললাম, 'ওগুলো সবই বাড়িতে রয়েছে।'

'ওগুলো তো আপনাকে নিয়ে আসতে হবে।'

'দেখা যাবে।'

'তার মানে, আপনি ওগুলো আটকাতে চান?'

আটকেও যে আমি কিছু করতে পারি না, তা জানি, কারণ অফিসের খবরাখবর আইন অনুযায়ী বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, আর করলেও খবরের কাগজে, যাকে বলে 'কেলেঙ্কারী ফাঁস করা, সেটা আপাততঃ চ্যাটার্জি সন্দেহ করছেন, তাতেও কোন লাভ নেই, যেহেতু ওরকম অনেক কেলেঙ্কারি আজ অবধি ফাঁস হয়েছে, আরও হবে, তাও লোকেরা জানে, কিন্তু কারুরই কিছু যায় আসে না। যেমন আমার জন্যে সত্যি উইদড্ আটকে থাকবে না, অনেক ভালভাবেই হবে, বাগচি মিথ্যে বলেননি, তবু আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

দুজনেই বেরিয়ে গেলেন, এবং বাগচি যে এতক্ষণ আমার পিতৃদেবকে টেলিফোনে খবর দিয়েছেন, (দুজনে আবার স্যাঙাত কি না!) তাতে কোন সন্দেহ নেই, তাই এখন মোটামুটি ঠিক করে নেওয়া যায়, আমি কোন টেলিফোনই ধরব না, বেয়ারাই ধরবে, বলে দেবে 'সাব কামরে মে নহী হ্যায়।'

বেয়ারাকে ডেকে আমি সে কথা বলে দিলাম, আর দেখলাম, ওর চোখে যাকে বলে বিস্ময়, তাই রয়েছে, যদিচ সেটা প্রকাশ করবার সাহস নেই, তবে

কিছু একটা অনুমান করেছে, কারণ সব কথাই ও শুনেছে কিছু কিছু বুঝতেও পেরেছে নিশ্চয়।

আমি অন্যান্য কিছু কাগজপত্র নিয়ে কাজে মনোযোগ দিতে চাইলাম, কিন্তু দিতে পারলাম না, কারণ এটা সেই নীতার মৃত দেহে উত্তাপ খোঁজার মত চেষ্টা। এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই, চাকরটিকে আমি হত্যা করেছি, বাগচি আমাকে স্পেয়ার করবে না। আর বাগচি যা বলছেন, সেটা খোদ কর্তারই হুকুম এবং স্বয়ং খোদ কর্তার সঙ্গে লড়ে, এখানে চাকরি বাঁচিয়ে রাখা, আর চিতার আগুনের মধ্যে ঢুকে বেঁচে থাকবার চিন্তা একই, অতএব একে আমি মেরেই ফেলেছি বলতে হবে, এবং সত্যি বলতে কি, নীতাকে গত রাত্রে মেরে ফেলার আগে, মনে মনে যেমন অনেকবারই মেরে ফেলেছি, এই চাকরিটাকে, যাকে আমার ছেনাল বলে মনে হয়েছে, অর্থাৎ 'কর্মের সততা ও জনসেবা, ইত্যাদি সব বাতুল বলে আমার মনে হয়েছিল যখন, তখনই মনে মনে একেও অনেকবারই মেরে ফেলেছি, কিন্তু হাত তুলতে সাহস পাইনি, কারণ আমার গর্বের সুখের মধ্যে এ বেশ জমিয়েছিল, আমার পরাধীনতার, যাকে বলে, অতি অন্তরঙ্গ। মাসে চার পাঁচ দিন হলেও নীতার সংসর্গ যেমন সুখ দিত, (সুখ! আমি জানি না, আমি জা-নি-না, কিন্তু সেই যে কবে, তখন বাইশ বছর না তেইশ বছর ছিল বোধহয়, আমি নীতার পায়ের তলায় মুখ গুঁজে দিয়েছিলাম, আর নীতা হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল, না, না, তুমি সত্যি বলতে পারনা, আমাকে কখনো সত্যি বলতে দাওনি'—কেন এ কথা বলেছিল এখন আর আমার মনে নেই, তবে ও খুব কেঁদেছিল, তারপরে হঠাৎ আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে, ফুঁসে উঠে বলেছিল, 'তুমি একটা মিথ্যুক, বলতে পার না, আমি তোমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে চাই শুধু? আমিও তাই-তাই-তাই, লম্পট কোথাকার। বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে, এরকম বলেছিল, তবু কাঁদছিল, পায়ের ওপর পড়ে চুল টানছিল, তবু বলছিল, 'সুখখোর, সব সুখখোর'—কিন্তু এসব কথা এখন আমার মনে পড়ছে কেন, 'সুখখোর' কথাটার জন্যে? যেহেতু নীতার সংসর্গের সুখের কথা আমি চিন্তা করছিলাম—?) এও সেই রকমের, তবু যে নীতার ব্যাপারে একটা ঘৃণা ও অনাসক্তি ছিল, আশ্চর্য, চাকরিটার ব্যাপারেও তাই ছিল।

শীতের বেলা পাঁচটায় যখন বাইরে এলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমার চিন্তার ব্যাপারটা এতই শুষ্ক বোধ হচ্ছিল যে, অর্থাৎ কিছুই ভাবতে না পারার দরুণ আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শুঁড়িখানায় গিয়ে ঢুকে পড়লাম, এবং হুইস্কি চাইলাম। পাত্র যখন এল, তখন দেখলাম, আমার সামনের চেয়ারে একটা লোক এসে বসল, আর আমার দিকে তাকাতেই চিনলাম, মাল সেই তুম্‌বোমুখো ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইনভেস্টিগেটর। বলল, 'আপনাকে দেখলাম ঢুকছেন, তাই এলাম।'

'বেশ করেছেন, 'একটু চলবে?'

'না, না, বেশ আছি, ওসব পোষায় না মশায়। আপনাকে অনেকবার ফোন করেছিলাম অফিসে, কিন্তু বারে বারেই শুনলাম, সাব নহী হ্যায়।'

গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, বেয়ারাটাকে সেই রকমই বলে রেখেছিলাম। লোকে বড় জ্বালাতন করে।'

তুম্‌বো মুখ একটু বিস্ফোরিত হল, বলল, 'ঘরেই ছিলেন? আশ্চর্য, আপনি একজন ব্যস্ত অফিসার, জনসাধারণকে নিয়ে আপনাকে সব সময় চলতে হয়, আর এরকম ফোন রিসিভ না করে বসে থাকতে পারেন।'

'পারলাম তো দেখছি' (এখন কী বলবে বল তো চাঁদ, তারপরে কাটো। কোথায় একটু শান্তিতে বসতে এলাম, তা নয়, উনি এলেন উপদেশ দিতে।)

আবার সেই খোকন-চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, এবং প্রশ্ন 'আপনি মনে করতে পারলেন, কাল ও সময়ে কোথায় ছিলেন?'

আমি আবার নিজেকে দেখলাম, আমার সেই গর্তে প্রাণপণে ঢোকবার চেষ্টায় আছি, সেখান থেকেই বললাম, 'না। কে জানে, হয়তো এখানেই ছিলাম।'

'না, এখানে ছিলেন না, সেটা খবর পেয়েছি। প্রায় ছটা অবধি আপনি এবং আর একজন 'রঞ্জন' বার-এ ছিলেন।'

কথাটা মিথ্যে নয়, অনেক সংবাদই সংগ্রহ করেছে দেখছি। তবে আর আমার মুখ থেকে শোনবার কী দরকার বাবা, নিজেরাই খুঁজে পেতে বের করে নাও না। কষ্ট করবে না, খুনী ধরবে, মাইনেটি মারবে, খালি ওই চিন্তা করলে কি হয়? বললাম, 'তাই নাকি, তা হবে বোধহয়।'

লোকটা আবার বলল, 'কাল দশটার পর, কি তার কাছাকাছি সময়, 'মরিয়ানা' মিডনাইট বার-এ আপনি গিয়েছিলেন।'

বাঃ শুঁড়িখানার খবর তো লোকটা একেবারে যাকে বলে যথার্থ পেয়েছে, টু দি পাই। বললাম, 'তা হতে পারে। এই তো করি মশাই।'

'কিন্তু সত্যি, আপনার মত একজন দায়িত্বশীল অফিসার, ইয়ং ম্যান, রেস্‌পেকটেবল বাড়ির ছেলে যদি সন্ধেবেলার থেকেই এ বার ও বার করে ঘরে বেড়ান, সেটা ভাল দেখায় না।'

'কাদের পক্ষে সেটা ভাল দেখায় বলতে পারেন?'

'যাদেরই হোক, আপনার নয়। বেশ তো বড় বড় হোটেল, যেখানে সাধারণের বিশেষ যাতায়াত নেই, কিংবা নিজেদের কোন আড্ডায়—'

'আপনি কলকাতার টপ গ্রেডের লোকদের কথা বলছেন তো? আমার চেয়ে বেশী দায়িত্বশীল, ভোররাত্রে যাদের চাংদোলা করে, হোটেল থেকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু আমি অতটা বড় নই। আপনি যাদের কথা বলছেন, আমি তাদের মত রইস নই যে প্যারিসে বা ন্যু-ইয়র্কে ফুর্তি করতে যাব, সত্যি বলতে কি, পেটে মাল পড়লে এখনও নিজের মা বোনকে চিনতে পারি, মাইরি! রোজ রাত্রে মদ মেয়েমানুষের পেছনে টাকা খরচ করার একটা সীমা আছে আমার, সেটা নিশ্চয়ই বোঝেন। যা করি সবই তো মশাই ঘুষের টাকায়।

'ঘুষ? আপনি ঘুষও খান নাকি?'

'আপনি খান না?'

আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ। আমি কোন অফিসারের মুখে এরকম কথাবার্তা শুনিনি।'

'তা হবে! এখন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।'

'শান্তি কি আপনার আছে?'

'আপনার থেকে বেশী আছে?

'যাই হোক, কাল, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত রাত্রে কোথায় ছিলেন, একটু মনে করুন।'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, মনে করতে পারছি না।'

'তার মানে, আপনার এ্যালিবাই আপনি প্রমাণ করতে পারছেন না।'

'না, ও সম্পর্কে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।'

'আপনি জানেন, আপনাকে এ্যারেস্ট করা যায়?'

'করুন, তাতে যদি খুনের কিনারা হয়, নিশ্চয় করবেন।'

'কিন্তু আপনি একজন অফিসার—।'

'আইনের চোখে কি তার কোন মাপ আছে?'

লোকটা চুপ করে রইল। আমি আবার বললাম, ক্ষেত্র বিশেষ অনেক কিছুই হয়, কী বলেন। আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা বলতে পারেন, আমি আপনি, আমরা কেন জেলের বাইরে?'

'তার মানে?'

'তার মানে' আমরা সকলেই বেশ বদমাইস নয় কি? আপনি নিশ্চয়ই এ কথা বলবেন না, ওপরওয়ালার হুকুম মেনেই চলতে হবে, আপনার চাকরিটা তো যাকে বলে, সমাজের অপরাধীদের ধরা, কিন্তু সত্যি কি আপনি তা ধরেছেন? সে স্বাধীনতা কি আপনাকে দেওয়া হয়েছে? আপনি কি জোর করে বলতে পারেন, আপনি কোন অপরাধ করেননি, যেমন ধরুন আমি ঘুষ খাই, তেমনি কি বলতে পারেন, আপনি সংবিধান আইন সব নিজিতে মেনে চলছেন? আমাদের সব কিছু দেখে কি তাই মনে হয়? এই দেশটাকে দেখে, আর এই দেশের মানুষের অবস্থা দেখে? তা যদি না হয়, তা হলে আপনার আমার মত, আমাদের থেকেও বড় বড় মানুষে কি জেলখানা ভরে যাওয়া উচিত নয়?

লোকটার লাল টকটকে জিভ এই প্রথম দেখলাম, ঠোঁট চাটল, (পাকস্থলীটা সত্যি ভাল।) বলল, 'আপনার নেশা বোধহয় জমে উঠছে।'

'না উঠলেও উঠবে এবার।'

'তবে এখন চলি, মনে করবার চেষ্টা করবেন।'

'হ্যাঁ, আসুন।'

শালুক চিনেছে...। বেশ কয়েক পেগ খাবার পর আমার বেরুতে ইচ্ছে করল, কিন্তু কোথায় যাব, তা বুঝতে পারছি না। এবং আশ্চর্য, একজন চেনাশোনা বন্ধুকেও আজ পেলাম না এখানে, সেটা অসম্ভব ব্যাপার প্রায়। এখানে কেউ না কেউ আসেই, এবং এর সঙ্গে রোজ গাঁজাই, যে, গাঁজানি তারপরে রোজই অর্হীন মনে হয়, তবু সন্ধ্যের পরে পাখীগুলো কানা হয়ে যায় বলে যেমন আস্তানায় ঢুকে পড়তেই হয়, অনেকটা সেইভাবেই কানার মতই চলে আসি, (দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য, আহা কী রোশনাই, ফুলঝুরি একেবারে!) মদ খাই আর কী বলি, তা নিজেও জানি না, কেবল এইটুকু মনে থাকে, মাঝে মাঝে নীতার কথা মনে হয়, অথচ নীতার কাছে যাওয়া চলবে না, ওর দেখা পাওয়া যাবে না, এইসব ভাবতে ভাবতে, অনেকটা কী বলব, বজ্জাত গাড়ির এঞ্জিনের মত, ভেতরটা গোঁ গোঁ করতে থাকে গোঁ ওঁ ওঁ ওঁ...গোঁ ওঁ ওঁ ওঁ...অথচ চলে না, তারপরে গদাম্ করে এক লাথ, (কে যে মারে, টের পাই না।) এবং লাথ খেয়েই লক্কর গাড়ির মত ছুটতে থাকি। কোথায় আর, কোন সঙ্গিনীর বা গাড়িতে নিজের বিছানায়। কিন্তু আজ কেউ আসেনি কেন, নীতার মরার সংবাদে নাকি? কেননা, যারা আসে, তারা অনেকেই নীতারও পরিচিত, এবং আজ তারা কেন আসেনি, শোকে না ভয়ে, তা আমি বুঝতে পারছি না। এ সময়েই চোখে পড়ল, একটা মেয়েকে, দোতালার দিকে চলে যাচ্ছে, আমার দিকে চোখ পড়তেই হাত নাড়ল, আমি ওকে ডাকলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ওপরে ওর কোন পুরুষ আছে নাকি, এবং না বলাতে আমার সঙ্গে ওকে আসতে বললাম। জানতে চাইল, কোথায় যেতে চাই, ওর বাড়িতে, না কোন হোটেলে, কোথায়। আমি জানালাম, ট্যাক্সি করে একটু ফাঁকায় বেড়াতে, কারণ শহরের, বিশেষ এই শীতের সন্ধ্যার ধোঁয়াটে দমবন্ধ শহরে থাকতে ইচ্ছা করছে না। মেয়েটা রাজী হওয়াতে বেরিয়ে পড়া গেল, কারণ ওর একটা লোক পাকড়ানো নিয়ে কথা, সেটা যখন পাওয়া গেল, একটু বেড়াতে যেতে আপত্তি কি। ট্যাক্সিতে উঠে, মেয়েটার গায়ে টায়ে হাত দিলাম, জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম, কিন্তু মাথার পেছনটা এমন বিশ্রী ব্যথা করছে ঠিক যেন কিছু ভাল

লাগছে না। গায়ে টায়ে হাত দিলে যেরকম হওয়া উচিত, সেরকম কিছু বোধ হচ্ছে না কেন, কে জানে, মাথার পিছন দিকের ব্যথাটা কিসের, প্রেসার হয়েছে, না নার্ভের গোলমাল, অথচ এখন বেশ রম্‌রমে ঘোরের মধ্যেই থাকার কথা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, এতদিনের মেজাজী ঘোরটা ছিঁড়ে গেল কী করে, মানে কী যেন একটা ছিঁড়েছে মনে হচ্ছে, কী আমি তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু না, চব্বিশ ঘণ্টাই কি না কে জানে, (এখন আর ঘড়ি দেখতে ইচ্ছা করছে না।) গতকাল এ সময়ে আমি তো একটা ট্যাক্সিতে ছিলাম, নীতার গায়ের সঙ্গে... এ কথা মনে হতেই, আমি মেয়েটাকে আর একবার টের পাবার চেষ্টা করলাম, যে কারণে ও আমাকে হাত বেড় দিয়ে ধরতে চাইল, কিন্তু কিছুই যেন টের পেলাম না। এটা কী ধরনের ব্যাপার আমি জানি না, আমি কী টের পেতে চাইলাম, তা বুঝতে পারছি না, কেবল মেয়েটা উঃ আঃ করে উঠল, বলল, 'আমার লাগছে।'

'লাগছে?'

'হ্যাঁ, আপনি ভীষণ জোরে চিমটি কাটছেন।'

'ওঃ সরি—'

'কী হয়েছে আপনার, শরীর খারাপ নাকি?'

'হুম্—কী জানি।'

'বেশী খেয়েছেন?'

'না তো? আচ্ছা, তোমার নাম কী?'

মেয়েটা হাসল, বলল, 'যতবারই আপনার সঙ্গে মীট করেছি, ততবারই নাম জিজ্ঞেস করেন, মনে থাকে না?'

'না।'

'সাবিত্রী।'

'স্‌সাবিত্তিরী! আচ্ছা, তুমি হুলাহুপ্ কর না কেন?'

'উঃ আপনি আবার লাগিয়ে দিচ্ছেন আমাকে। কিন্তু হুলাহুপ্ করব কেন?'

'বড্ড চর্বি জমে গেছে। আচ্ছা, তুমি পুরো না হাফগেরস্ত?'

'পুরোই বলতে পারেন।'

'বিয়ে-টিয়ে হয়েছিল ?'

'তা একটা হয়েছিল।'

'সেই সত্যবানটি কোথায়, মরে গেছে ?'

'এ সব কথা তো আপনি কোনদিন জিজ্ঞেস করেন না।'

'আজ করছি, মানে করতে ইচ্ছে করছে।'

'পালিয়ে গেছে।'

'মরে যাওয়াই বলে ওকে, অ্যাঁ ? আচ্ছা, আজ পর্যন্ত কতগুলো লোক তোমার কাছে গেছে ?'

মেয়েটা আবার হাসল, বলল, 'তা কি মনে আছে নাকি ?'

'কাউন্টলেস, না ? আচ্ছা, তাদের তুমি কী ভাব ?'

'কী আবার ?'

'শুয়োরের বাচ্চা না ?'

'ছি, ছি, কিন্তু—'

'খদ্দের লক্ষ্মী, অ্যাঁ ?'

'তা, হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন, আমার লাগছে, আজ আপনার কী হয়েছে ? আপনি এরকম করছেন কেন ?'

'কী রকম বল তো ?'

'আপনি সেটের পাশে জামাটাই বোধহয় ছিঁড়ে ফেললেন।'

'ওঃ সরি...। চল তোমার ঘরেই যাই।'

'তাই চলুন।'

গাড়ি ঘোরাতে বললাম, তারপরে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা সীতা—'

মেয়েটা বলে উঠল, 'সীতা নয়, সাবিত্রী।'

'একই তো। তোমাকে আমি একটা হলাহল-এর রিঙ কিনে দেব। আচ্ছা...কী একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভাবলাম, মনে করতে পারছি না।'

'আপনি আজ অন্যরকম হয়ে গেছেন, আপনার সেই বদ মেজাজ।'

কথাটা হারিয়ে গেল, আর শুনতে পেলাম না, তার বদলে, আমার নিজের

গলাতেই আমি একটা গান শুনতে পেলাম, না, গাইতে গাইতে নয়, কখনো কোথায় যেন গেয়েছিলাম, সেইটাই শুনতে পেলাম, 'আই লকড্ মাই হার্ট' এ্যাণ্ড থ্রু 'ভার দি কী।'...তার মানে, হৃদয় বন্ধ করে চাবি ফেলে দিয়েছি ? তার মানে কী, পেরাংে কুলুপ এঁটে, কাটিট হাপিস, যাঃ বাবা, তাও কি হয় নাকি ? গায়ক আর কথা খুঁজে পেল না ? ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে মেয়েটার ডেরায় গেলাম, যা হওয়া উচিত, তাই হল, তারপর বাড়ি ফিরে এলাম। সেই বিদিশার প্রেমিক আর বিদিশা ইত্যাদি, সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কেবল ওপরে উঠতেই মা ভয় পাওয়া গলায় বলল, অফিসের ঘটনা নাকি সবই পিতৃদেবের কানে এসেছে, নীতার খুনের খবরও, যে কারণে পুলিশ আমার পিছনে ঘুরেছে, সব খবরই এসে পৌঁছেছে। পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মা বলল, কিন্তু আমি জানালাম, এখন ঘুম ছাড়া আর কিছুই পারব না, যদিচ আজও ঠিক গতকালের মতই গা ঘুলোতে লাগল, মনে হচ্ছে, লিভারটা কলাপোড়া খেয়ে গিয়েছে।

পরদিন আমি যখন অফিসে গেলাম, মনে হল অফিসের সবাই আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে দেখছে। অদ্ভুত মানে, অনেকটা যাকে বলে বিদ্বেষহীন, প্রশংসাসূচক চোখে তাকিয়ে দেখল, যা থেকে অনুমান হয়, গতকালের অফিসের ঘটনাটা প্রকাশ পেয়েছে, এবং অধস্তন কর্মচারীরা তাতে খুব খুশি হয়েছে, বোধহয় তাদের 'লড়াই'-এর সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দেখে নিয়েছে, যদিচ জানি, প্রতিটি লোকই ফেরেববাজ, ফাঁকিবাজ, যে যার নিজের তালে আছে। সবাই চায়, তার সঙ্গে কোথাও মিললেই সে তোমাকে খাতির করবে। অথচ অপরাধ করলে লাভবান হবে, এটা যদি তুমি সুযোগ দিতে পার, সবাই নেবে, আমাকে মারলে যদি সকলের এক বছরের মাইনে ইনক্রিমেন্ট দেয় তাহলে এখনি মেরে ফেলবে, কারণ গরীব আবার ভদ্রলোক, আমার ধারণা তারা সব থেকে মারাত্মক। আমার ঘরে ঢুকেই দেখলাম, টেবিলের উপর একটা কাগজ, তাতে লেখা, 'হে সাহসী বীর, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' দেখেই বেয়ারাটাকে চীৎকার করে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কে রেখে গেছে এখানে।'

বেয়ারা ভয়ে জড়সড় হয়ে বলল, 'নেই দেখা সাব্।'

'কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে, ওয়েস্ট পেপারের ঝুরিতে না ফেলে, দরজার বাইরে ফেলে দিলাম। যেন ওদের অভিনন্দনের জন্যেই আমি কিছু করেছি। কিন্তু আমি ভাবি, এসব খবর ওদের কাছে যায় কী করে, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা তো সিক্রেটের পর্দার পড়ে। এমন কোন খবর দেখি না, যা বাইরে বেরোয় না, অথচ সবাই নাকি সিক্রেট।

কিন্তু কাজ করবার আমি কিছু খুঁজেই পাচ্ছি না, অবিশ্যি একদিক থেকে ভালই হয়েছে, গতকাল থেকে সেই যে শিরায় শিরায় ঝনঝনানি, সেটা খুবই বেড়েছে, তার সঙ্গে পেট খামচানো, আর বারে বারে পায়খানা যাওয়াও চেপে ধরেছে। একবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলাম, সেই তুম্‌বোমুখো আবার এসেছে, হাতে একটা খবরের কাগজ। আমাকে দেখাল, যাতে নীতার খাটের ওপর পড়ে থাকা ছবি ও সংবাদ বেরিয়েছে।

জিজ্ঞেস করল, 'দেখেছেন নাকি?'

'না।'

'সে কি, সকালের খবরের কাগজে—।'

'দেখি না।'

কিন্তু এখন আমি নীতার ছবিটা দেখতে লাগলাম, যার নীচে লেখা রয়েছে, 'এই যুবতীকে তার এ্যাপার্টমেন্টে খাটের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মরনা তদন্তে জানা গিয়েছে, তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে। অপরাধী এখনো ধরা পড়েনি, পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে।' জানি তুম্‌বোমুখো আমার দিকে সেই খোকনের মত অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, যাকে বলে আমার মুখের কোন 'ভাবান্তর' হয় কিনা তাই দেখবার জন্যে। কিন্তু কেন, আমি কি উল্লুক নাকি যে ভাবভঙ্গিতে ওকে কিছু বুঝতে দেব। তবু এ কথা ঠিক, আমি ছবিটার দিকে দেখতে দেখতে যেন নীতার গা ছুঁয়ে ফেললাম, এবং ওরকম ছুঁয়ে, জড়িয়ে ধরার মত অবস্থা হতেই, হাতটা কেমন নড়ে উঠল, আর তৎক্ষণাৎ কাগজটা তুম্‌বোমুখোর হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

'কিছু বুঝতে পারলেন?' তুম্‌বোমুখো জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'মরে গেছে বলেই তো কাগজে লিখেছে।'

লোকটা আমার দিকে চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপরে আবার সেই একই কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল, আমি খিস্তির মাত্রা একটু চড়ালাম, এবং শেষ পর্যন্ত বিদায় নেবার আগে জানিয়ে গেল, কাল রাত্রে যে মেয়েটা আমার সঙ্গে ছিল, তাকেও ওরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, অর্থাৎ আমার ওপর ওরা সব সময়েই নজর রেখেছে, এবং ধরেই নিয়েছে, ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার আগে থেকেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। মেয়েটা কী বলেছে না বলেছে, আমি তা জিজ্ঞাসা করিনি, তুম্‌বোমুখো বলেওনি, আর মেয়েটা নিশ্চয় আমাকে মনে মনে গালাগাল দিয়েছে।

যেহেতু কোন কাজই করা যাচ্ছে না, সেই হেতু আমি টেলিফোনে বাগচিকে বলে, (বলার কোন মানে নেই, বাগ্‌চিও শুনল মাত্র, কোন জবাব না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। গোঁসা হয়েছে!) লাঞ্চ-এর সময়ে বেরিয়ে গেলাম আর প্রতি মুহূর্তেই একটা আশঙ্কা হতে লাগল, অফিসের লোকগুলো আমাকে না কিছু বলে বসে, যাকে বলে, বিগলিত হয়ে, বীরত্বের ঠেলায়। ট্যাক্সি পাওয়া দুঃসাধ্য দেখছি, তাই হাঁটতে হাঁটতেই চলেছিলাম, এমন সময়ে একটা গাড়ি, নীল রংএর গাড়ি আমার পাশে দাঁড়াল, দেখে মনে হল, চালকই মালিক, আমার অচেনা, অথচ হেসে বলল, 'স্যার আমি আপনার কাছেই গেছলাম, আপনার দপ্তরে, শুনলাম এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন, বলুন কোথায় যাবেন, পৌঁছে দিয়ে আসি।'

লোকটা নিজের নামটা বলল, কিন্তু আমার কাছে কী দরকার বুঝলাম না এবং আমি কোথায় যেতে চাই, তাও ঠিক জানি না। লোকটা নাকি আমাকে খুবই জরুরী দরকার, কে জানে ইনটেলিজেন্সেরই লোক কি না। যখন জানলাম আপাতত আমার কোন গন্তব্য নেই, তখন সে বলল, তা হলে চলুন কোন একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে কথাটা বলে নিই।'

গাড়িতে তুলে নিয়ে লোকটা উত্তর দিকে চলল, আর প্রতি পদে পদে আমার প্রশংসা করতে লাগল, অর্থাৎ আমি যে হরলালের ব্যাপারে খোদ কর্তার সঙ্গে ওর ভাষায় 'পবিত্র সংগ্রামে' (উল্লুক!) নেমে পড়েছি, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তারপরে দেখলাম, লোকটা দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির, যেটা মন্দ লাগল না, কারণ কলকাতার বাইরে বলেই একটু ভাল লাগল, সদ্যিচ দোকান-

পাট, ভিড় এবং মা কালীর দর্শনের জন্যে সবাই নানাভাবে ছুটছে, যা দেখলেই মনে হয়, যেন কী পাপ করে সবাই ছুটেছে, অনেকটা গায়ে ঘায়ের জ্বালার মত, 'ওমা জুড়িয়ে দাও মা' (মায়ের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বদমাইসি করবে, আর সন্দেশ বাতাসা এনে দিয়ে যাবে, আর কালী মূর্তি তোমার ঘায়ের মলম হয়ে যাবে।) এই ভাব নিয়ে, তাড়া খেয়ে চলেছে। আমি জানি না, লোকদের কি লজ্জা করে না, যখন তারা এভাবে ছোটে, আর ভাবে (যা তার কখনোই বিশ্বাস করে না।) মাকে ডাকলে, নির্ঘাত ফল ফলবে, কারণ এ সবই হচ্ছে আসলে সব কিছু পাবার একটা, কী বলব, অবসেশন। সবরকম আকাঙ্ক্ষারই একটা অবসেশন। কিন্তু যে লোকটার গাড়িতে এলাম, সে লোকটার মধ্যে মূর্তি দর্শনের কোন ব্যস্ততা দেখলাম না, কারণ আমাকে নিয়ে সে এত ব্যস্ত (কে লোকটা? আমাদের দপ্তর থেকে মালকড়ি হাতাবার তদ্বির করার জন্যে এরকম করছে নাকি, তাহলে তো মাল মিছেই পেট্রল পুড়িয়ে—কিন্তু তা তো নয়, ও তো অন্যরকম কথা বলছিল।) মা কালীর থেকে আমাকে খুশী করতেই যেন যাকে বলে ব্যাকুল। লোকটা বলল, 'চলুন স্যার, গঙ্গার ধারে কোন গাছতলায় বসা যাক, আপনার আপত্তি নেই তো?'

আমি বললাম, 'আপার কী কথা, কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনাকে আমি চিনিই না।'

'তা না চিনুন, বললেই চিনতে পারবেন, চলুন বসি গে।'

ঠিক হুকুম নয়, তবু যেন প্রায় ঠেলেই নিয়ে গেল আমাকে গঙ্গার ধারে, যেখানে শান্তি মোটেই নেই, কারণ কিছু চুঁড়ি আর ছোঁড়া নিজেদের মধ্যে হ্যাল্লা করছে, যদিও কেউ যে কারুর পরিচিত নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে, 'মা কালীর থানে' প্রথম শীতের রোদে, সকলেই সকলের শরীর দেখে, একটু গরম হতে এসেছে। কেউ কেউ আবার হনুমানের পিছনেও লেগেছিল, পিছনে লাগা মানে, খাওয়ানে। ওটাই পুণ্যের অংশ কিনা, কে জানে, এবং যে ভাবে ছোলা বাদাম নিয়ে খাওয়াবার জন্যে ডাকাডাকি করছে, মনে হচ্ছে, মা কালীর পুজো দেওয়ার থেকে, এটা আরো বেশী মজার। আর খাওয়াচ্ছেও তো ছোঁড়াচুঁড়িরাই, যাদের এখন দেখলেই বোঝা যায়, ওদের নিজেদের খাই খাই-এর চোখাচোখি হনুমানের

চেয়ে বেশী। জনোশোনা জোড়ার ভিড়ও মন্দ নয়, পীরিত পুণ্যি সব একসঙ্গে, আহা মা গো, তোমার সন্তানদের এমন জায়গা আর মিলবে না। আমি আমার সঙ্গের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কোন ইউরিনাল আছে কি না। লোকটা নিশ্চয়ই মুশকিলে পড়ে গেল, যেহেতু ইউরিনাল কোথায় জানে না, তবু 'আমি দেখছি' বলে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল, এবং খোঁজ পেয়ে আমাকে নিয়ে এল। এতটা খাতির, এ অবস্থায় আমাকে কেন করছে বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা নিশ্চয়, এই গাড়লের মত লোকটা (সে রকমই লাগছে আমার) একটা ভুল করেছে। যাই হোক, গঙ্গার ধারে, একটু ফাঁকায় এক জায়গায় বসে লোকটা আমাকে সিগারেট দিল, গঙ্গার সৌন্দর্য (ইল্লুক) বর্ণনা করল, আবার এও বলল, গঙ্গায় চড়া পড়ে যাচ্ছে, আজকাল ইলিশ আসছে না, (সালা) ইত্যাদির পর, লোকটা যা বলল, তাতে ওকে যে কোন শ্রেণীর খচ্চরে ফেলা যায়, তা পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। লোকটা প্রস্তাব করল, ওর একটা কী নাকি পত্রিকা আছে, তাতে খোদকতা এবং হরলাল ভট্টাচার্যের সমস্ত কেলেঙ্কারীটা আমি যদি দলিল দস্তাবেজ সহ, ওকে ছাপতে দিই, তাহলে আমার ফটো ছাপিয়ে রাতারাতি আমাকে 'হিরো' করে দেবে, একটা বিগ এ্যামাউন্টও দেবে, উদ্দেশ্য, স্টাফ দিয়ে বের করবে যে, গরম তেলেভাজার মত হাজার হাজার কপি (ভবানীপুরে সেই তেলেভাজার মত বোধ হয়) বিক্রী হয়ে যাবে, অর্থাৎ কিছু টাকা করে নেবে, যদিচ সেটা আর উচ্চারণ করল না।

আমি বললাম, 'আপনি, একটা রামখচ্চর লোক।'

'কী বললেন?'

'রামখচ্চর। আপনার হাজার হাজার কপি বিক্রীর জন্য ওসব আমি করিনি। এখন কেটে পড়ুন, তার আগে এখানে পাইখানা কোথায় আছে, বলতে পারেন?'

লোকটার মুখটা দৈত্যের মত ভয়ংকর হয়ে উঠলেও, হাসতে লাগল এবং বোঝাবার চেষ্টা করল তবু। বলল, 'তা দেখিয়ে দিচ্ছি স্যার, (আবার স্যার!) কিন্তু—আমি জানি, আপনি খুব আপরাইট এ্যাণ্ড ফরওয়ার্ড, আর আপনার মেজাজও ভাল নেই, কিন্তু একটু ভেবে দেখুন। এতে আপনার দিক থেকে—।'

'আমার দিক থেকে হালুয়া।'

'হালুয়া ?'

'হুঁ। এখন কাটুন। পাইখানাটা—?'

তারপরে হতাশ হয়েও (আশ্চর্য !) লোকটা আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল ওর গাড়ীতে, এবং আমি যাব না শুনে পাইখানা কোথায় বলে দিয়ে চলে গেল, যাবার আগে আর একবার আমাকে ভাবতে বলে গেল।

কখন যে বেলা পড়ে এল, আমি টেরই পাইনি, এবং একটা পাখী, সেটা আমার কানের পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রায় পাখা ছুঁইয়ে চমকে দিয়ে গেল। এমন চমকানি, আমার বুকটা পর্যন্ত ধকধকিয়ে উঠেছে, আর তাতেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখলাম, নদীটা নীল, যেন হালকা করে নীল রং গুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওপরের দিকে জলটা লাল দেখাচ্ছে। সূর্যটা খুব বড় আর লাল হয়ে, ওপারের গাছের ডগায় যেন (আমার মনে হচ্ছে) ঘুরছে। বাতাসটা এবার একটু বেশ জোরেই দিচ্ছে। আর বাতাসটা যেন সবকিছুই শুষছে, কেন না, আমার গাটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সবগাছের পাতাগুলোই তো প্রায় হলদে হয়ে গিয়েছে, কারণ বাতাস শুষছে, তাইতেই ঝরে ঝরে পড়ছে। মাটিতে তো ঝরছেই, উড়ছেই, আমার গায়েও দেখছি, কতগুলো পাতা এসে পড়েছে, টেরি উলের ঠাস বুনোটের কালো রং-এর ওপরে, ওই পাতাগুলো যেন মাটিতে যেমন পড়ে, তেমনি এসে পড়েছে, বেশ স্বাধীনভাবেই। আমি তাই আশেপাশের গাছ গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সব গাছের পাতাগুলোই বাতাসে কাঁপছে, ওপারের লালচে রোদে চিকচিক করছে, অথচ, দেখছি, তার মধ্যেই এক একটা পাতা খসে পড়ছে, যে কারণে গাছগুলোকে যাকে বলে 'শীর্ণ' দেখাচ্ছে, এর পরে একেবারেই ন্যাড়া হয়ে যাবে। এমন যেন, যাকে বলে 'বিষণ্ণ' অথচ সেই 'ইতি' এর মতই একটা নিষ্পাপ ভাবের 'শীর্ণতা' যা নাকি আবার ঠিকই ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ভরে উঠবে। সূর্যটা একেবারেই ডুবে গেল, তবু জলে এখনো লালের আভা, অনেকটা আগুন থেকে তোলা, জুড়িয়ে আসা ইস্পাতের মত নদীটাকে দেখাচ্ছে, যার ওপার ঘেঁষে একটাই মাত্র নৌকা চলেছে কলকাতার দিকে, তাতে আবার পাল তোলা। ঠিক এ সময়েই নদীর ওপর ব্রীজে দম্‌দম্‌ শব্দ শুনে, তাকিয়ে দেখলাম, একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে, ব্রীজের লোহার জালের ভিতর দিয়ে একটা

জানালা দরজা ছাড়া গাড়ি, নিশ্চয়ই মাল গাড়ি, অনেকটা যেন দাপিয়ে আর রেগে চলে এল, যা দেখে আমারও গায়ের মধ্যে জ্বলে গেল, আমি না বলে পারলাম না, 'শুয়োর!' আর তখনই যেন আমার খেয়াল হল, এখানে মন্দিরে ছুটে আসা মেয়ে পুরুষেরা সব আমার চারপাশে ভিড় করে (ধর্মের সুখে) বাদামভাজা চিবিয়ে চেঁচামেচি করছে। তখন কলকাতার কথা আমার মনে পড়ে গেল, আর মনে পড়তেই মদের তৃষ্ণা বোধ করলাম, (যেন কলকাতা একটা শুঁড়িখানা !) তাই উঠে পড়লাম গঙ্গার ধার থেকে। এতক্ষণ যে কী ভেবেছি, কিছুই জানি না, তবে এটা ঠিক, আমি একটা কথা অনেকবার ভাববার চেষ্টা করলাম, নীতা নেই, ও মরে গিয়েছে, অথচ আশ্চর্য, নিজেকে কিছুতেই এ কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। এও আবার সেই মামদোবাজীর মতই একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে। যাকে নিজের হাতেই মেরে ফেলেছি, তার সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারছি না, সে নেই, এবং আর কখনোই তাকে দেখতে পাব না, ছুঁতে পাওয়া তো অনেক দূরের কথা, এটাকে একটা ভাবনা বলে, মনে করতেই পারছি না, কারণ এ অর্থহীন কথা ভেবে কোন লাভ নেই, তবু (মাইরি) আমার ভিতরটা যেন একটা জেদবশতই মানতে রাজী নয় যে, নীতাকে (সে যাই হোক) আর কখনই (যেভাবেই হোক) পাব না।

আসতে গিয়ে, অনেক লোককে, মন্দিরের দিকে যেতে দেখে, আর কাঁসরের ঘণ্টা শুনে, একবার গেলাম, চত্বর পেরিয়ে। মন্দিরের কাছে যেতেই পোকার মত মানুষের ভীড় দেখে গায়ের মধ্যে কী রকম করে উঠল, তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে একটা দরজা দিয়ে হঠাৎ পুকুরটা চোখে পড়তে (ওখানেই ইউরিনাল) এগিয়ে গেলাম, কিন্তু একটা ছোঁড়া আর একটা ছুঁড়ি ছিটকে সরে গেল, যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেল ভয় পেয়ে। দেখে মা কালীর দয়ার আহা বেচারীরা !) আবার ফিরে চলে এলাম। চত্বর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে, দরজার সামনে, আলোর একটা চেনা মুখ দেখতে পেলাম যেন। দেখবার জন্যে, ভাল করে চোখ তুলতেই চিনতে পারলাম, সেই তুম্‌বোমুখো লোকটা, ডিভাইন ঋচরটি। আলালে দেখছি। কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু লোকটা কাছে এসে বলল, 'কালী দর্শন করতে গেছলেন ?'

'না।'

'আমি আবার প্রায়ই একটু দর্শন করতে আসি।'

কোন জবাব দিলাম না, দেবার দরকার নেই, জানি মিথ্যে কথা বলছে, আসলে পিছনে পিছনে ঘুরছে। ঘুরুক, কিছু বলবার নেই। পাশে চলতে চলতে বলল, খুনের এখনো কোন কিনারা করতে পারেনি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট গলা টিপে হত্যা, বাপ মাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, আজই তারা ডেড বডি পেয়ে যাবে রাত্রে, আরো দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, যদিও কিছুই লাভ হয়নি, ইত্যাদি এবং তারপরে, আপনি কি মনে করতে পারলেন, কোথায় ছিলেন?'

'নাঃ।'

'আচ্ছা, চলি।'

চলবে যে কোথায়, তা জানি, তবে আমার চোখের সামনে আর না এলেই হয়, মাথার উকুন! একটা বাস ধরে কলকাতায় এলাম, বারে গেলাম, দু-একজন বন্ধু-বান্ধব পাওয়া গেল, যারা নীতার মার্ডার নিয়ে নানান কথা বলল, ঝোঁকের মাথায় অনেকে সন্দেহ করে নাম পর্যন্ত বলতে লাগল, কে মারতে পারে। কিন্তু আমার কথা কেউ বলল না। তারপরে কোন মেয়ের কাছে যাব কি না, এটা ভাবতে ভাবতে অনেক আগেই বাড়ি এসে পড়লাম, এবং সেখানে মায়ের কাছে শুনলাম, দপ্তরের খোদ কর্তা আমাকে ডিস্‌মিস্‌ করবেনই যদিচ পানিশমেন্ট দেবেন না। এমন কিছু ফাইলপত্র নাকি পাওয়া গিয়েছে, যার থেকে দেখা যাচ্ছে, আমি অনেক অনাচার করেছি, পাপ যাকে বলে, (বাগচি-চ্যাটার্জি-ঘোষ থাকতে আমাকে অপরাধে জড়ানো এমন কঠিন, বিদিশাও পারে।) সুতরাং খেল খতম, যদিচ এখনো পিতৃদেব আমাকে এমন পন্থা বলে দিতে পারেন, যাতে এখনো উপায় হতে পারে। মা বলল, গোঁয়াতুমি না করে কর্তাদের কথা মতই চলতে এবং 'আমার রুবিদিত্ত' (রুবি দত্ত) নাকি ফোন করেছিল, দেখা করতে বলেছে। কিন্তু আমি এখন গর্তের বাইরে এসে পড়েছি। এখন আর আমার বুঝতে একটুও ভুল হচ্ছে না, যে মুহূর্তে নীতাকে মেরে ফেলেছি, ('না মারেনি' ইয়ারকি!), সেই মুহূর্ত থেকেই বাইরে ছিটকে পড়েছি। ভেতরে ঢোকার পথ

বন্ধ, আর জবন্ত স্বাধীনতার আশ্রয়টা বোধহয় এই রকমই, কোথাও ঠেস দিয়ে গুটিশুটি হয়ে থাকবার জায়গা নেই, অর্থাৎ যাকে বলে, সুখ নেই।

কিন্তু আমি জামা প্যান্ট খোলবার আগেই কলিংবেলটা বাইরে থেকে বেজে উঠলো, এবং কেউ যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ছুটে এল। আমি দেখতে পেলাম না, কারণ আমার দরজাটা ভেজানো, আমি সবে মাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোটটা খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু খুললাম না, ভাবলাম হয়তো তুমুলযুদ্ধোই এসেছে পরোয়ানা নিয়ে, অতএব কোট খুলেই বা কী হবে? কিন্তু ছুটে যাওয়া পায়ের শব্দ আমার দরজার সামনে এল না চলে গেল বাড়ির কর্তার ঘরের দিকে। যদিচ, তাতে নিশ্চিত হবার কিছু নেই হয়তো ভয়ংকর সংবাদটা বিদিশা আগে ওর বাবাকেই দিতে চায়, ভয়ংকর অর্থাৎ আমার জেলে যাওয়া, (কী ঘেন্না, হারামজাদাটা খুনী!) অথচ জেল-টেল ব্যাপারটা তেমন কিছু মনেই হচ্ছে না আমার। তারপরেই আবার পায়ের শব্দ বেজে উঠল, এবার আমার ঘরের কাছেই, এবং দরজাটা খুলে গেল। বিদিশা (বেচারী। বাড়ির আবহাওয়া দেখে ওর বাঁধা প্রেমিকটিকে বোধহয় আজ বিদায় দিতে হয়েছে।) আমার দিকে তাকাল, ওর চোখে মুখে একটা যেন উত্তেজনার ছাপ। ও কিছু বলবার আগেই আমি সিঁড়ির মুখে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, আপনি এসেছেন, আমাদের কী ভাগ্যি, আসুন আসুন।'

বিদিশা আস্তে উচ্চারণ করল, 'রুবি দত্ত।'

আঃ সেই জাঁহাবাজ মেয়েমানুষটি আবার, এবং আহা কি ভাগ্যি আমার মায়ের পিতৃদেবও নিশ্চয় তাঁর ঘরে মনে মনে উলসে উঠেছেন, আর বিদিশার এত উত্তেজনা ছুটোছুটি, কেন না, নোটোরিয়াস হাবুল দত্তের স্ত্রী, খোদকর্তার উপপত্নী, (কেনরে উল্লুক, প্রেমিক বলতে পারিস না?) স্বয়ং কলকাতেশ্বরী পিছন দরজার অনেক কুলপকাট তার আঁচলে বাঁধা, কেন কি না, কলকাতার অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই যে তাঁর আঁচলে বাঁধা, (কিন্তু বেশ্যা টেশ্যা বলো না বাবা, শী ইজ কালচার্ড, এ জেম্‌!) সেই রুবি দত্ত এসেছেন। আমি কলকাতা গলানো সেই, যাকে বলে 'কণ্ঠস্বর' তাই শুনতে পেলাম, 'না না! এ আবার ভাগ্যি কী, একটু এলাম দুষ্টুটার (আই আই!) সঙ্গে দেখা করতে, কোথায় ও?'

তারপরে একটু চুপচাপ, বোধহয় মাতৃদেবী চুপিচুপি কিছু বলছেন, অর্থাৎ বোঝাচ্ছেন, এবং কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঠাটেশ্বরী দেখা দিল দরজায়। একটু গম্ভীর, একটু মনোকষ্ট, (তা তো হবেই) এমনি মুখের ভাব, যদিচ প্রসাধনে পোষাকে, অন্যান্য দিনের থেকেও যেন বেশী ঝিলিক হানছে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অনুমতি না নিয়েই সে ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে, আবার আমার দিকে ফিরে তাকাল। একে বলে দাঁড়ানো, কোথায় সে বাঁক মেরেছে, কোথায় একটু বেশী পা সরেছে, র‍্যালাউলী ছুঁড়িরা এসে দেখে যাক। তারপরে এক পা এক পা করে, চোখের থেকে চোখ না নামিয়ে, (সে কোহন!) আমার সামনে এসে দাঁড়াল, নাকের পাশ একটু কোঁচকালো, বোধহয় মদের গন্ধে। আহা কবি দত্ত, মদের গন্ধ সইতে পারে না, কিন্তু আঃ শরীরখানি কী মৌজি কারদার দেখানো যায়। কেন এখনি ডুবে যায় না। খাঁটি উর্বসী (উর্বশী)। সামনে এসেও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর, কেবল মুখ ফুটে বেরুল, 'উঃ, দেখালে বটে!'

আমার মুখটা যে তখন কেমন দেখাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না, তবে মুখের চামড়া-টামড়া নড়ছে না, তা বুঝতে পারছি, এমন কি চোখের তারাও অনড়, মরে গেলাম নাকি। কবি দত্ত-এর মিঠে গন্ধ মুখ থেকে (গায়ের না মুখের জানি না) আবার বেরুল, 'কর্তা তো (খোদকর্তা) অবাক যে, তাঁর অফিস সত্যি এরকম ডিস্‌ওবিডিয়েন্ট অফিসার থাকতে পারে। আমাকে বলতে গিয়ে গলার স্বর পর্যন্ত ভেঙে গেল, (ও মা কোথায় যাব!) কিন্তু আমি বললাম, "ও রকম ছেলেই নয়, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে।" অবিশ্যি, আমি আন্দাজ করেছি, নীতার ব্যাপারটাই কোনরকম গোলমাল পাকিয়েছে, হঠাৎ ওরকম একটা সংবাদ...।'

কবি দত্ত-এর চোখে জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ 'ঠিক বলছি কি না?' এমনি একটা ভাব, এবং সেই সঙ্গে ঠিক বলেছে কি না, সেটাও আমার মুখ দেখে যাচাই করে নিতে চাইছে, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি, এ মুখ মরা।

আবার কাঁচা মাংসের মত রং করা ঠোঁট নড়ল, বলল, না হয় আমি ধরেই নিলাম, তুমি নিজের হাতেই কাজটা করেছ, কেন না আমি জানি জেলাসি

মানুষকে সামটাইমস্‌ হেলপ্‌লেস করে ফেলে। তা সেজন্যেও তোমার ভাববার কিছু ছিল না, তুমি জান, দেয়ার আর সেভিয়াস'। কিন্তু খোদকর্তার সঙ্গে—না না এ কখনো ভাবাই যায় না। শুনলাম, হরলালের এভিডেন্স-এর কাগজপত্র-গুলো পর্যন্ত বাড়িতে এনে রেখেছ। ছিঃ, এ কি ছেলেমানুষি!'

কিন্তু, একি, আমি কি সত্যি মরে গিয়েছি নাকি, কেন না, কবি দত্ত-এর শরীরের সব থেকে এগিয়ে আসা, একেবারে যাকে বলে 'সূচাগ্র' বিন্দুটিই তো আমার শরীরে লাগছে তবু একবার চামড়া কাঁপল না। গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

কবি দত্ত তার হাতের ব্যাগের বন্ধ মুখ খুলল, এক রাশ টাইপ করা কাগজ বের করল, বলল, 'উইদড্রল রিপোর্টটা আমি নিয়ে এসেছি, নাও, সই করে দাও।'

আচ্ছা সেই একটা গানের কলি কেন এই মুহূর্তেই আমার মনে পড়ল, আমি জানি না, 'কে আবার বাজায় বাঁসসী, এ ভাঙা...।' অথচ আমি বলে উঠলাম, আচ্ছা কবিদি, আজ আপনি সেই বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, দেড়শো টাকা দামের (পাউণ্ডের হিসেব জানি না।) অডিকলনটা মেখে আসেন নি, না?'

একটু অবাক হলেও কলকাতেশ্বরী হাসল, বলল, ,ওটার গন্ধ বুঝি তোমার খুব ভালো লাগে?'

'দারুন।'

'বেশ তো তোমাকে আমি ওই স্টাফের একটা প্রেজেন্ট করব। এখন নাও, একটা তাড়াতাড়ি সই করে দাও তো।'

'আপনার পেটে বোধহয় এ বেলা মাল পড়েনি, না?'

এতটা ফাজলামি করার অধিকার কখনো না পেলেও, কবি দত্ত এটাকে তাই মনে করল, বলল, 'ফাজলামি করো না, সে সব হবে এখন, আগে সই করে দাও।

না, আমি এদের কাউকেই কিছু বোঝাতে পারব না, এমন কি নীতার খুন থেকে রেহাই পাবার জন্যেও নয়। অথচ কবি দত্ত ধরেই নিয়েছে, আমি তার হাত ধরে গর্তের মধ্যে ঢুকে যাব। তাই আমাকে এবার পরিষ্কার করেই বলতে হল, 'চলুন, আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।'

তৎক্ষণাৎ কবি দত্ত-এর চাবিওয়ালী চোখ দুটি স্পার্ক দিল, আর গলার স্বরেও যাকে বলে 'বিদ্যুত্তরঙ্গ।' বলল, 'তুমি সই করবে না তা হলে?'
'আমি মিথ্যে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি।'

'তার মানে—।'

আহা খোদকর্তা যার কোলে মাথা লুটিয়ে পড়ে, সে কী রকম অসহায় হয়ে পড়েছে। আবার বলে উঠল, 'আমার একটা অহংকার ছিল—।'

কথা শেষ করতে পারল না, কারণ, 'বিদ্যুত্তরঙ্গ' চোখ ও গলা থেকে হারিয়ে গেল এবং শকড্, আহত হওয়া বাঘে বলে, সেইরকম অবস্থা হল, এবং আমি দেখলাম, কাঁচা মাংসের রং ঠোঁট দুটি আমার চিবুকের কাছে, (ওহো—প্রেম, প্রেমময়ী!) 'মৃণালভুজ' আমার কাঁধে, খোদকর্তার সুখ, আমার বুকে। শুনলাম, 'প্লীজ, এরকম ছেলেমানুষী করো না, আমার মান রাখ।'

'মাইরি বলছি কবিদি, আমাকে এখুনি বাথরুমে যেতে হবে।'

'তার মানে?'

কবি দত্ত এবার অনেকখানি সরে গেল, এবং এবার তার সারা শরীরেই 'বিদ্যুত্তরঙ্গ।' বলল, 'বড্ড বেড়ে উঠেছ, না?'

'হুঁ, ধরে রাখতে পারছি না?'

'বেশ, বাড়িতে যেসব কাগজপত্র রেখেছ, সেগুলো দিয়ে দাও।'

'সে সব আজ আবার নিয়ে বেরিয়েছিলাম, কোথায় রেখেছি, কিছুই মনে করতে পারছি না।'

ততক্ষণে কবি দত্ত, যাকে বলে তীরের মত দরজার কাছে সরে গিয়েছে, এবং সেখান থেকেই কাঁচা খেয়ে ফেলার মত গলা শোনা গেল, 'তবে প্রস্তুত থেকো।'

দরাম্ করে দরজাটা বন্ধ হল, পায়ের শব্দ সিঁড়ির দিকে চলে গেল, সেই সঙ্গে আরো পায়ের শব্দ, নিশ্চয়ই মায়ের পায়ের শব্দ, এবং মায়ের গলায় একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল, তারপরে নিঝুম। রাস্তায় গাড়ী স্টার্টের শব্দ হল, শুনতে শুনতে আমি আয়নার দিকে ফিরে তাকালাম, এবং নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে, আমি যেন আমার মধ্যেই ডুবে গেলাম, আর একটি বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ভিতর থেকে যাতে একটা নিবিড় প্রশান্তি বোধ করলাম। তারপর আঙুল নেড়ে, নিজের ছায়াটাকেই ডাকলাম।

সাতদিন পরেই চাকরিটা গেল, অর্থাৎ প্রথমে সাস্পেনশন, উপযুক্ত কৈফিয়তের অভাবে, পরে খতম, যা নিয়ম মত করতে হয়। পিতৃদেব জানিয়েছেন, অনুগ্রহ করে তাঁর 'গৃহ' ত্যাগ করলে সুখী হবেন, কারণ একটা মাতাল (এতদিন বলতে সাহস করেননি, ভাবতেন, ওরকম একটু আধটু হয়ে থাকে।) হাতী পোষা সম্ভব নয়। তা আমি জানি, সেইজন্যেই কলকাতার বাইরে, কোথাও একটা পেট চালানো গোছের চাকরির সন্ধান করছি, তা ছাড়া চিকিৎসারও দরকার, পেটটা বোধহয় পচে যাচ্ছে। এ অবস্থায়, একদিন এক পুরনো বন্ধু এল, রাজনীতি করে। সে তো পরিষ্কারই বলল, (মদ খাওয়া ভল্লুক বানচোত, ক্ষেপেই আছে।) আমার মধ্যে যে একটা 'সংগ্রামী মানুষ আছে, তা নাকি ও চিরকালই (মাইরি!) জানত, এমন কি ওর পার্টির নেতারা পর্যন্ত জানে, যে পার্টির সঙ্গে আমার বিশ বছরের তাজা রক্তের (এখন কি বাসি?) যোগাযোগ হয়েছিল, যাদের আদর্শ নিয়ম নীতি, সবকিছুকেই খাঁটি হিন্দুর বেদের মতই, যাকে বলে, 'অভ্রান্ত' বলে জেনেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম, সেই পার্টির নেতাদের নির্দেশেই ও এসেছে, ওদের পার্টির দরজা আমার জন্যে খোলা। এখন সসম্মানে ঢুকে, আমি 'লড়াইয়ে' ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। তা ছাড়া, আমার পরিচয়টাও দেখতে হবে, লোকে যখন শুনবে, আমি কী ভাবে চাকরি ছেড়েছি, একেবারে মার মার কাট কাট, জনসাধারণ আমাকে লুফে নেবে, (ফিল্ম্ এস্টারের মতন?) নেতা হবার যোগ্যতা ও সাহস আমার আছে। সবাই গোপালঠাকুর চিনে বসে আছে, যেন আমি জানি না, আমার চাকরির চক্রের মত, পার্টিরও চক্র আছে, এবং চাকরির চক্রে যেমন ঘুষ খাওয়া অপরাধ নয়, তেমনি পার্টি-চক্রের মধ্যেও কোন পাপই পাপ নয়, যদি পার্টির প্রয়োজন হয়, (যেমন ভোটের চুরি, ঘরের বউকে বেশ্যা, বেশ্যাকে ঘরের বউ সাজিয়ে সবাই কাজ সারে, কিংবা যাকে কুকুরের মত ঘৃণা করি, হয়তো ও বেলাই ঠেঙিয়ে মারব, অথচ

এ বেলা তার গালে চুমো খেয়ে কথা বলছি, পলেটিক্স, যে!) তারপরে ধাক্কা মেরে একদিন গেটের বাইরে। তোমার পরিচয় 'মানুষ' নয়, 'পার্টিম্যান', তখন যদি তোমার মনে হয়, পার্টির নেতা ভুল করছে বা অন্যায় করছে, বা ধর তোমার প্রেমিকাকেই লুটছে, কিংবা একটা আন্দোলনই বানচাল হয়ে যেতে পারে, তবু খবরদার, একটি কথা নয়, যন্ত্রের মত, এগিয়ে চল, পোষা কুকুরের মত 'লয়াল' হও, কারণ কি না, যত পাপই করি, আখেরে, ভালর জন্যেই তো! স্বাধীনতাকে ভয় পায় না, এমন পার্টি আমি কোথাও দেখিনি, আর আমি যে গর্তের বাইরে এটা বন্ধুকে বোঝানো, যাকে বলে, একেবারেই দুঃসাধ্য কারণ আমার চেনা জগত স্বাধীনতা ওর কাছে হয়তো কোন অর্থই বহন করবে না। অতএব, কাটো, নড়ুই যা হচ্ছেন তা দ্যাশের লোকে দেখছেন।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে যে কথাটা আমাকে ভাবিয়েছিল, (মাস খানেক তো হল।) আমি দেখছি, সেটা আমাকে ছাড়ছে না, এবং চিন্তা এই জেদ, (মামদোবাজী।) সত্যি বলতে কি, এক এক সময় যেন, আমাকে, কী বলব, ক্লান্ত করে ফেলছে, মানে চিন্তাটা যেন আমাকে ধরে ধরে মারছে, আর বলছে, এটা অসম্ভব যে নীতাকে আর আমি কখনো দেখতে পাব না, বুকের কাছে নিয়ে (মাইরি, ভাবলেই গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠছে, এটা কিন্তু সত্যি, ওকে পেলে আমার কাউকেই বুকের কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করত না।) মুখখানা যাকে বলে, খুব কাছে নিয়ে, আদর করতে পারব না। আজ এখন মফস্বল থেকে ফিরছি, একটা ফ্যাক্টরীতে সুপারভাইজারের ইন্টারভিউ দিয়ে, চাকরিটা হয়ে যেতেও পারে, তবে কে জানে, ঘুষ-টুষ দিতে হবে কি না, তা হলেই তো গেল। কিন্তু এ চিন্তার থেকেও, নীতার চিন্তাই বেশী হচ্ছে আমার। সেই তুমুলোমুখো ইনভেস্টিগেটর কাকেদিন হল ছেড়ে গিয়েছে আমাকে, তাতে যেন নীতার চিন্তাটা করবার বেশী সুযোগ পাচ্ছি। এখন তো, সত্যি বলতে কি, আমার দিব্যি গালার কিছু নেই, হাসি পেয়ে যাচ্ছে ওই ভেবে, (উল্লুক) নীতার কথা ভেবে আমি কখন হয়তো কেঁদেই ফেলব। এক এক সময়, খালি এই কথাই মনে হতে থাকে, যা হয়তো কখনোই সম্ভব ছিল না, (শিয়ালদহ থেকে নেমে, বাসে উঠলাম। আমি আবার এখন বাড়িতে থাকি না, অন্য জায়গায় একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি, চাঁদনি চকের

কাছে।) আচ্ছা, যদি এরকম হত, আমি আর নীতা, এমন ভাবে মিশে যেতে পারতাম, যে, কখনোই ছাড়াছাড়ি হবে না, মানে, তার থেকে এ কথা বলছি না, ওই যে কী বলে, সেকস, এ্যাটাচমেন্ট না কি এ্যাডজাস্টমেন্ট, কী সব বলে, যেন একেবারে যেখানেই থাকি, এ্যাটাচমেন্টের টানে দুজনে পাগলের মত ছুটে কাছে এলাম, লোকে দেখে বলল, 'ওফ, শালা ভালবাসসা,' কারণ তারা তো আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, আমি সেরকম ছাড়াছাড়ি না হওয়ার কথা বলছি না। আমি বলছি, (মাইরি বলতে সাহস পাচ্ছি না।) আমি বলছি কি, যদি এইরকম হত যে, দুজনে কখনও কারুর কাছে মিথ্যে বলব না, না না, সবাই যেমন বলে আমি ঠিক সেরকম বলতে চাইছি না বোধহয়, (মাথাটা ঘুরছে, আমি আজকাল সব কথা যেন ভাল করে ভাবতেই পারি না।) আমি বলছি, দু'জনে দুজনের কাছে মিথ্যে বলব না মানে কি—যার অর্থ হল, কোন সুখ, কোন দুঃখ, অর্থাৎ হাঁ—যদি, যাকে বলে 'কামনা বাসনা' ইত্যাদিও, যা মনের মধ্যে জাগে, আবার ডুবে যায়, যা কখনোই বাইরে প্রকাশ পায় না কারুর সাধ্য নেই, ভেতরটাকে দেখতে পায়, আর সেখানটাই যদি দুজনের কাছে খুলে দিতে পারতাম, আর ওফ, ভীষণ খারাপ, খারাপ ব্যাপার দুজনেই দুজনের মধ্যে দেখতে পেতাম, তবু না, পেছু হটা নয়, কারণ মিথ্যেটা তো ওকে বা আমাকে একলা কষ্ট দিচ্ছিল না, দুজনকে, তাই ভয় পাবার কী আছে, তবু যাকে বলে সত্য, বউ নয়, বেশ্যা নয়, প্রেমিকা নয়, কী বলে, তা আমি জানি না, কারণ এই তিন প্রকারের দ্বারা, আমি যে কথা বলছি, তা সম্ভব নয়, উপায় নেই তাদের, তারা সকলকেই, যাকে বলে খুব অসহায়, অতএব; ওসব নয়, যদি, ভয়হীন, লজ্জাহীন-ঘৃণাহীন (দুজনের মাঝখানেই মাত্র যে লজ্জা ঘৃণা ভয় আছে।) সত্য দুজনে, দুজনের কাছে প্রকাশ করতে পারতাম, অর্থাৎ ওই সেই স্বাধীনতা, যার ভয়ে মরি, সেই স্বাধীনতার স্বাদের জন্যেই, দুজনে দুজনের কাছে ছুটে আসতে পারতাম, অর্থাৎ সত্যের জন্যই একমাত্র পাগল হয়ে উঠতাম আমরা, হাঁ যে সত্য, যদি বল দুজনের জিভের লালার স্বাদ গ্রহণও আছে কি না, তবে নিশ্চয়ই আছে, সে তো থাকবেই, কারণ জীবন্ত আছেই, তা নয়, আমি কি বলছি, বোধহয় পাগলামির কথাই বলছি, সেকস, এ্যাটাচমেন্টের

যেমন পারলাম, তেমনি সত্যের কোন এ্যাটাচ্‌মেন্ট যদি থাকত, তা হলে—আচ্ছা, তার চেয়ে আমি যদি ঘটনা দিয়েই বোঝাই—কিন্তু একি, আমি যে সিঁড়ি উঠে এলাম, এটা কোথাকার, কোন বাড়ির সিঁড়ি?

কী আশ্চর্য, আমি দেখছি, আমি নীতার এ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছি, সামনেই নীতার ঘর, বন্ধ রয়েছে। এর মানে কী, মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি, বুঝতে পারছি না। ওই সেই, ওই যে বললাম, আমার ভেতরে সেই চিন্তার জেদ, কারণ, আমার ভেতরের তো ধারণা, নিজের গলাতেই নাকি আমি বনুই বসিয়েছি, (কী যে বলে!) অতএব ভেতরটাই ঠেলতে ঠেলতে এখানে নিয়ে এসেছে।

পিছনে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালাম, না, চিত্রা নয়, সেই তুম্‌বোমুখো ইনভেস্টিগেটর। সিঁড়িতে একটা খুব বড় ছায়া ফেলে, থপথপিয়ে উঠে আসছে। কে জানে কোত্থেকে এল, পেছনে পেছনেই ঘুরছিল বোধহয়, এসে আমার সামনে দাঁড়াল! আর সেই খোকনের মত নিরীহ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। না, ঠিক নিরীহ বলা যাবে না বোধহয়। অনেকটা খোকনের চোখে কৌতূহল মেটাবার যেমন ঝিলিক ফুটে ওঠে, সেইরকম। তারপরে পকেটে হাত দিয়ে, একটা চাবি বের করে, সেই মোটা খস্‌কা খস্‌কা গলায় বলল, 'ঘরটা খুলে দেব?'

আমি বললাম, 'দিন।'

লোকটা ঘর খুলে, যেন আমাকে আপ্যায়ন করছে, এমনি ভাবে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দিল, কারণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেই, নীতার শোবার ঘরে ঢুকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। যেন আমাকে অভ্যর্থনা করছে। আমি লোকটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নীতার শোবার ঘরে ঢুকলাম, ঢুকে খাটের কাছে গেলাম, সেখান থেকে আয়নার দিকে তাকালাম। মুখ ফিরিয়ে, ঘরের চারদিকেই একবার দেখলাম, লোকটার সঙ্গে আবার আমার চোখাচোখি হল, এখন যেন লোকটা ভূত দেখছে। কেন, আমি কি ভূত হয়ে গিয়েছি, আমার কি ছায়া পড়ছে না? এই তো বেশ, বড় ছায়া পড়েছে, কিন্তু আমার যেন মনে হল, আমি পাশের ঘরে না গিয়ে পারব না, যে

ঘরের দরজাটা বন্ধ রয়েছে, কেন না, নীতা কি ওখানে আছে, এ কথা আমার মনে হল, অথচ আমি তো জানি, তবু ওই যে কী একটা জেদ, নীতা আছে। তাই আমি পাশের ঘরের দরজার কাছে গেলাম, আর তুম্‌বোমুখো নিজে এগিয়ে এসে, ভেজানো দরজাটা খুলে দিল, যেন কোন মাননীয় ভিজিটরকে বিশেষ কিছু দেখাচ্ছে। আমি ঘরটার মধ্যে ঢুকলাম, আর সত্যি বলতে কি, আমি নীতারই গন্ধ পেলাম যেন, এবং নীতা কি জামাকাপড় বদলাচ্ছে, কেন না—কিন্তু না, ঘরটা কী রকম ভীষণ অন্ধকার, আমি বেরিয়ে এলাম। এসেই বাথরুমের দরজাটার দিকে আমার চোখ পড়ল, আমি খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু না থাক্‌, বরং কাঠের পার্টিশনের ওপারে যাই, এবং তাই গেলাম, আর রেফ্রিজারেটর চুপচাপ রয়েছে দেখলাম, সেই একটা গিট্টি গিট্টি চাপা শব্দ নেই, যেন মরে রয়েছে, তবু হাতলটা ধরে আমি খুলে ফেললাম, কিছু নেই, শুধু কয়েক বোতল জল। সেই সেদিনের জল নাকি, না কি পরে আবার কেউ বোতলে জল পুরে রেখে দিয়েছে, কে জানে। রেফ্রিজারেটর বন্ধ করে, ফিরতেই দেখলাম, তুম্‌বোমুখো আমার পেছনেই, কিন্তু আমি বেসিনটার ওপরে ঝুঁকে পড়লাম, যদিচ, সেই আমার জলে ডুবিয়ে দিয়ে যাওয়া প্লেটগুলো এখন আর নেই, (সেই নীতা শেষ খেয়েছিল, রাত্রে খেতে যাবার কথা ছিল।) কে নিয়েছে কে জানে ত কেন যে কলের মুখটা খুলে দিলাম, জানি না, কল্‌কল্‌ করে জল পড়তে লাগল। আমি ঘরের দিকে ফিরে দাঁড়ালাম, আর আমার চোখের সামনে একটা জলপ্রপাত ভাসতে লাগল, বোধহয় উষ্ণ-প্রপাতই হবে, সেই গাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কল্‌কল্‌ করে নামছে, আর রোদের ঝিলিকে যেন...।

'মোটিভটা কী, এই মার্ডারের...।'

এই শেষ না হওয়া কথাটা, খস্‌কা খস্‌কা চাপা গলায়, জিজ্ঞাসার মত আমি শুনতে পেলাম। মোটিভ! মার্ডার! কিন্তু মোটিভ, আমি কী বলব, কিসের মোটিভ, আর মার্ডার, মার্ডারের কিছুই কি আমি জানি? আমি আবার নীতার খাটের দিকে গেলাম। কিন্তু এই শীতের সন্ধ্যারাত্রির ধোঁয়া যেমন বিশ্রী দম আটকে ধরে, আমার সেইরকমই লাগল। আমি লোকটার দিকে আবার দেখলাম, তাকিয়ে আছে থাকুক, আমি পিছন ফিরে, নীতা শেষ যেখানে উপুর হয়েছিল, সেখানে গেলাম, সেখানটা ছুঁতে ইচ্ছে করল, জানি, এখন কিছুই আর নেই,

তবু মানুষের একটা কী রকম আছে, সে না থাকা জিনিসকেও পেতে চায়, নীতা তো থাকেই, (যদিও চাদরটা টান টান করা এখন আর ভীষণ শাদা, কোন দাগ নেই, যেন শ্ন্যতার মত হা হা করছে।) ছিল।

পিছনে শব্দ পেয়ে দেখলাম, লোকটা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, কী যেন বলল, কিন্তু আমার কানে গেল না। সেদিন নীতা কী রকম নেচেছিল, তখন বোঝাই যায়নি পরে ওরকম রাগ করতে পারে। আমি হাতটা নামিয়ে, খাটের কাছে নীচু হলাম। আবার আমার কানে উষ্ণ প্রপাতের শব্দটা বাজল, রোদ ঝলকানো নীল জলের ঢল আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। আর তখনই, নীতার সেই একটা গান, যেটা ওর খুব প্রিয় ছিল, বাংলা করলে, যার মানে, 'ক্যাকটাসের বুকে ইতিমধ্যেই রোদ পড়েছে।' আমার মনে পড়ল, যেন শুনতে পেলাম, ও গুনগুন করছে।

সমাপ্ত

ASAD
SRIPUR
JESSORE

M/s. Jhenidah Traders
KALI BARI ROAD
KHULNA

M/s. Jhenidah Traders.
KALI BARI ROAD
KHULNA.